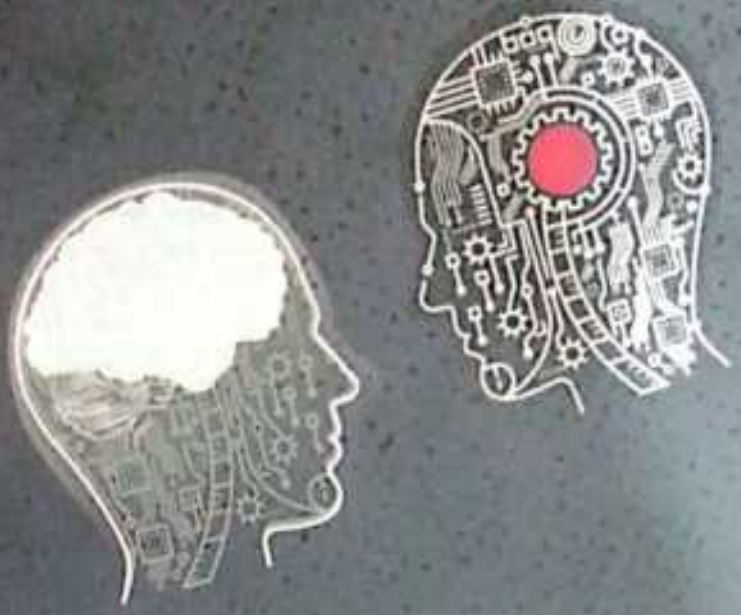

বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানবাদ

সত্যের মানদণ্ডে বিজ্ঞানের নাস্তিক্যবাদী দর্শন

ড. সামি আমেরি হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ । আরিফুল ইসলাম তপু

সত্যের মানদণ্ডে বিজ্ঞানের নাস্তিক্যবাদী দর্শন

বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানবাদ

লেখক : ড. সামি আমেরি হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদক : আরিফুল ইসলাম তপু

রিজদাহ
পাবলিকেশন

ইদারাতুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া বাংলাদেশের একটি প্রকাশনা

অভিমত

বিজ্ঞান মূলত মানবীয় গবেষণা ও আবিষ্কারের স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া, যেখানে সঠিক-বেঠিক কিংবা ভুল-শুদ্ধ উভয়টিরই অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদ একটি মতাদর্শ, একটি ইজম ও একটি আইডিওলোজি। যা মূলত চিন্তাগত ও আচরণগতভাবে একটি ধর্মের স্থান দাবি করে এবং আধুনিক সময়ে মানুষকে কুফরের দিকে পরিচালিত করছে। বিজ্ঞানবাদকে বলা যায়, সাইন্টিফেটিক জাহিলিয়্যাহ বা টেকনো জাহিলিয়্যাহ।

বিজ্ঞানের চোখ ধাঁধানো আবিষ্কার ও সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থার আধিপত্যের ফলে আজ মুসলিম সমাজের অধিকাংশ সদস্যই ঈমান বিধ্বংসী এই মতবাদ ও আধুনিক এই জাহিলিয়াত দ্বারা চরমভাবে আক্রান্ত কিংবা প্রভাবিত। যা অজান্তেই তাদের চিন্তাকাঠামোকে বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করছে। তাই বর্তমান সময়ে ঈমানবিধ্বংসী এই মতবাদ সম্পর্কে জানা ও বোঝা প্রতিটি মানুষের জন্যই আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানবাদ' বইটি হতে পারে আপনার সঠিক ও যথাযথ অবলম্বন।

মূল বইটি লিখেছেন আরবের খ্যাতিমান মুফাক্কির ড. সামি আমেরি হাফিজাহুল্লাহ। বইটিকে আধুনিক সময়ে ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন সংশ্লিষ্ট অগ্রগামী বইসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়।

বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানবাদ বইটি আমাদের পশ্চিমা মতবাদ সিরিজের দ্বিতীয় রচনা। গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজের আওতায় আমরা আরও প্রায়

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। অসংখ্য দরুদ ও সালাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবার পরিজনের ওপর।

মানুষ শৈশবকাল থেকে 'বিজ্ঞান' শব্দটির সাথে পরিচিত। বিজ্ঞানের মানে হচ্ছে, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ অধ্যয়ন ও বিচার বিশ্লেষণ করা। স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিজ্ঞান কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই অনেক অজানা জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা বিস্ময়কর উদ্ভাবনের ফলে এ যুগকে বিজ্ঞানের যুগ নামেও অভিহিত করা হয়। মানুষের জীবনের কষ্ট দূরীভূত করা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের মনে একটি বিশেষ আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক।

ইসলাম ধর্মও বিজ্ঞান চর্চায় মানুষদের উৎসাহিত করে। ঐশী নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিমগণ বিজ্ঞান চর্চায় অভিনিবেশ করেন ও বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আল খাওয়ারিজমি, জাবির ইবনে হাইয়ান, ইবনে সিনা, আলবেরুনির মতো মুসলিম বিজ্ঞানীগণ নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কালের পরিক্রমায় এ বিজ্ঞানের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান শব্দের সাথে মিল রেখে এ মতবাদের প্রধান ব্যক্তিগণ নিজেদেরকে বিজ্ঞানবাদী বলে পরিচয় দেয়।

বিজ্ঞানবাদ শব্দটি শ্রবণে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কিছু মনে হলেও বাস্তবে তা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। এটিকে নিরেট বিজ্ঞানের মতো ল্যাবে বা মাইক্রোস্কোপে

পরীক্ষা করা সম্ভব নয়; বরং তা একটি বিশ্বাস। অথচ বৈজ্ঞানিক বিষয় ল্যাবে এক্সপেরিমেন্টের উপযুক্ত। অতএব বিজ্ঞানবাদ কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয় নয়। এ মতবাদ অনুসারে মহাবিশ্বের সকল ঘটনা ও বাস্তবতা বিজ্ঞানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিজ্ঞান সকল কিছুর ওপর কর্তৃত্ববান। কট্টর বিজ্ঞানবাদীদের মতে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে বিজ্ঞান। যেসব বিষয় বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরীক্ষা বা যাচাই করা সম্ভব নয়, সেসবের অস্তিত্বকে বিজ্ঞানবাদীরা অস্বীকার করে। এ ধারা থেকেই মূলত বিজ্ঞানের নামে নাস্তিক্যবাদী মতবাদের সূচনা হয়।

বিজ্ঞানবাদীরা মানুষের সামনে বিজ্ঞান ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে সাংঘর্ষিক হিসেবে উপস্থাপন করে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিজ্ঞান বিশ্বাস করবে, তাকে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী হতে হবে। এভাবেই তারা সরলমনা মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে।

বিজ্ঞানের নামে মানুষকে নাস্তিকতার দিকে আহবান করার যে প্রবণতা, কীভাবে এসবের উৎপত্তি হয়েছে? কীভাবে তারা বিজ্ঞানবাদের কুযুক্তিগুলো আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে? কোন পর্যায়ে এসে বিজ্ঞানের নামে এই প্রবঞ্চকরা মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে চলে? লেখক ড. সামি আমেরি এই গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছেন। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবাদের সংজ্ঞা ও মৌলিক পার্থক্যগুলো উপস্থাপন করে তিনি দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানবাদ একটি স্ববিরোধী মতবাদ। এ মতবাদ মূলত কোনো একটি বৈজ্ঞানিক থিওরিকে প্রশ্নের উর্ধ্বে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। একটি ধর্মের সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে সহজেই উপলব্ধ হয় যে, বিজ্ঞানবাদ বিজ্ঞানের নামে একটি নতুন ধর্মবিশ্বাস। এ ধর্মের উপাস্য হলো ভৌতবিজ্ঞান।

বইটির অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে লেখকের অভিনব বর্ণনাশৈলী। লেখক এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি যেমন দিয়েছেন, তেমন অনেক বিজ্ঞানীর বক্তব্যও উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানবাদ একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ।

বইটির বিষয়বস্তু বর্তমান সময়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক আরব যুবকদেরকে এই নাস্তিক্যবাদী মতবাদ থেকে সচেতন করার জন্য লিখলেও আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তা মোটেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। বিশেষত পশ্চিমা মতবাদগুলো যখন প্রলয়ংকারী ঝড়ের মতো আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, তখন সাধারণ মানুষদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা অতীব জরুরি। নয়তো শাব্দিক প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে তারাও বিজ্ঞানের নামে নাস্তিকতার দিকে এগিয়ে চলবে।

এ বইটি বিজ্ঞান অধ্যয়নকারীদের বিজ্ঞানবাদের ধোঁকা থেকে সচেতন করবে বলে আশা করি।

এটি একটি অনুবাদগ্রন্থ ও মানবীয় প্রচেষ্টা। তাই এতে তথ্য, তত্ত্ব কিংবা ভাষাগত ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। পাঠকের নিকট বিনীত নিবেদন, বইটিতে এ ধরনের কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন। পরবর্তী সময়ে তা শুধরে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

আরিফুল ইসলাম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সূচিপত্র

পূর্বকথা ১৭

প্রত্যেক যুগের রয়েছে নিজস্ব উপাস্য ২১

সৌন্দর্যের অন্তরালে যা অজানা-ই থেকে যায় ২৬

কয়েকটি চ্যালেঞ্জিং বিজ্ঞানবাদী প্রশ্ন ২৮

বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানবাদ ৩১

বিজ্ঞানবাদের সংজ্ঞা ৩২

বিজ্ঞানবাদের এ সকল সংজ্ঞা থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় ৩৭

বিজ্ঞানবাদের ইতিহাস ৪১

যৌক্তিক দৃষ্টবাদ তিনটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ৪৭

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞান ও বিশ্ব ৫৩

বিজ্ঞান, সেকুলারিজম ও বিজ্ঞানবাদ ৬০

বিজ্ঞানবাদ একটি ধর্মীয় মতাদর্শ ৬৫

নিষ্কলুষতার পথে বিজ্ঞান ৬৬

বিজ্ঞানবাদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ৭০

একটি সামগ্রিক পরিপূর্ণ বর্ণনা ৭১

উপাস্য ৭৩

মানুষের প্রকৃত অবস্থা ৭৫

ধর্মীয় অনুভূতি ৭৫

বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন নবি ৭৬

নির্যাতিত বিজ্ঞানীরা শহিদ ৭৭

অলৌকিক ঘটনা ৭৭
পরিত্রাণের বিশ্বাস ৭৮
আইন ও ক্ষমতা ৭৮
থিওডেসা ৭৯
একটি নৈতিক ব্যবস্থা ৭৯

বিজ্ঞানবাদ ও পরীক্ষার আধিপত্যবাদ ৮০
জ্ঞানের উৎস নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা ৮১
জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদ কি বিজ্ঞানের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রমাণের সামর্থ্য রাখে? ৮৪
বিজ্ঞানবাদ ও যুক্তি ৮৮
বিজ্ঞানবাদ ও দর্শনের মৃত্যুর ঘোষণা ৯২
দর্শন কী? কীভাবে তা বিজ্ঞানের বিকাশের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে? ৯৪
বিজ্ঞানবাদ ও তথ্যমূলক জ্ঞান ১০০
বিজ্ঞান ও ওহির বৈপরীত্য ১০২

বিজ্ঞানবাদ কি সত্যিকার অর্থেই বিজ্ঞানসম্মত? ১০৬
বিজ্ঞানবাদ ও বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ১০৭
বিজ্ঞান ও তার অবৈজ্ঞানিক অনুমান ১১৩

বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে বিভ্রান্তি ১১৯
উদ্দেশ্য ও প্রভাবক থেকে মুক্তি ১২০
পক্ষপাত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার চিত্র ১৩৪
বিষয় নির্বাচন করা ১৩৪
পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা ১৩৫
পরীক্ষা ১৩৭
হাইপোথিসিস প্রস্তুতকরণ ১৩৭
আবিষ্কার ১৩৯
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রায়োগিক উপযোগিতা প্রদান ১৪০

বিজ্ঞানের প্রান্তসীমা ১৪২
বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতা ১৪৪
বিজ্ঞান ও এই প্রশ্ন : সূচনা কোথায়? গন্তব্য কোথায়? ১৪৮

বিজ্ঞান ও সংবেদনশীল সত্তার জগৎ ১৫২
নৈতিকতা ও নন্দনতত্ত্বের জটিলতা ১৫৭
বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা ও বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়বাদের মাঝে পার্থক্য ১৬৩

বিজ্ঞানবাদের আত্মহনন ১৬৮
নিজ মানদণ্ডে বিজ্ঞানবাদের স্বরূপ ১৬৯
বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যুক্তিসমূহ ধারাবাহিকভাবে হওয়ার অসম্ভাব্যতা ১৭২
বিজ্ঞানবাদ ও বিবেকবোধের বিনাশ ১৭৫

তিক্ত ফসল ১৮০
বিচ্ছিন্ন মানব ১৮১
বিজ্ঞানের লাগাম ও তা বিকৃতকরণ ১৮৫

একটি ভ্রান্ত ধারণা : মহামহিম আল্লাহ না-কি বিজ্ঞান? ১৯০
বিভ্রান্তিকর দ্বৈততা ১৯১
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকেই বিজ্ঞানে বিশ্বাস ১৯৯

বিজ্ঞান কি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারের সক্ষমতা রাখে? ২১০
এটি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্নই নয়! ২১২
আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ কী, যা বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিতে সম্ভব? ২১৮
প্রকৃতিই কি চূড়ান্ত কারণ? ২২২
বিজ্ঞানের বিপ্লব মানে ঈমানের বিজয় ২২৪
তবে কেন বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিজ্ঞানী নাস্তিক হয়? ২৩২

সারকথা ২৩৭

বইয়ে ব্যবহৃত কিছু শব্দের পরিচয় ২৪০

পূর্বকথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। দরুদ ও সালাম সেই নবির ওপর, যার পর আর কোনো নবি নেই।

প্রায় দু-বছর আগের কথা। আমার ব্যক্তিগত ফেসবুক পেইজে অন্য একটি ফেসবুক পেইজের বিষয়ে আমি একটি পোস্ট লিখেছিলাম। সেই পেইজে মূলত বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন আবিষ্কার, বিশেষত জীববিজ্ঞান নিয়ে অধিক আলোচনা হতো। পেইজটির ফলোয়ার ছিল কয়েক লাখ আরব যুবক। পেইজের এডমিন প্যানেলের সকলেই ছিল বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, বিজ্ঞানবাদী। সে কারণে আমি বলেছিলাম, পেইজটি নাস্তিকতা প্রচার-প্রসারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত। সুতরাং যে সকল মুসলিম যুবক সেটি ফলো করছে, তার পোস্ট প্রচার করছে, তারা মূলত সরল মনে, অজ্ঞাতসারে এই ইলেকট্রনিক ইন্টারফেইসের পক্ষে কাজ করছে, যা হয়তো স্পষ্ট ভাষায় সরাসরি নাস্তিকতার ঘোষণা নয়; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তাদের এ কাজ নাস্তিকতা ছড়িয়ে দিতে বড় অবদান রাখছে। কার্যত পেইজটি আরও জোরালোভাবে নাস্তিকদের 'বিজ্ঞানে বিশ্বাস' স্লোগানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিল।

আমার এ মন্তব্য শুনে কয়েকজন ব্যক্তি আমার কথা অপছন্দ করে এবং এটিকে বিবেচনাহীন মন্তব্য হিসেবে গণ্য করে। কারণ তারা মনে করত, যেহেতু আমরা সকলেই বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি এবং তা বাস্তবতার অনুকূলে হলে সত্য হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে 'বিজ্ঞানে বিশ্বাস'-কে কেন নাস্তিকতার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে!

অল্প কিছুদিন পরেই পেইজটি দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজেদের নাস্তিক্যবাদী চেহারাটি প্রকাশ করে। নিঃসংকোচে নাস্তিকতার প্রধান বিবৃতিসমূহের প্রতি নিজেদের অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। পেইজটি তার পরিচয়ে আরেকটু কথা যোগ করে বলে, 'এই পেইজটি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে, কেননা বিজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞানসম্মত পন্থা, যা নিজের সত্যতা প্রমাণিত করেছে।' অথচ এটি তো সুস্পষ্ট নাস্তিক্যবাদ এবং ঐশী প্রত্যাদেশের সত্যতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা তাদের মতে ঐশী প্রত্যাদেশ জ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক পন্থা নয়! যেহেতু সত্য অনুধাবন করার জন্য তা ইন্দ্রিয় কিংবা এক্সপেরিমেন্টের ওপর নির্ভরশীল নয়।

বিজ্ঞ পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি থেকে মতাদর্শগত কোনো বয়ান বা ভাষ্য দীর্ঘদিন গোপন থাকতে পারে না। তাদের কাছে একসময় তা প্রকাশ পেয়েই যায়। আর বিতর্কিত বিষয়গুলো নিজের পক্ষপাতদুষ্ট রহস্য একসময় না একসময় উন্মোচন করেই দেয়। কারণ, সে তখন আর নিজেকে ধোঁকা দিতে সক্ষম থাকে না। তা ছাড়া নাস্তিক্যবাদী বক্তব্য নিজ সমর্থনে উগ্র। যেকোনো ব্যক্তি নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে সামান্য অধ্যয়ন করলেই এ বিষয়টি বুঝতে পারবে। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিজ্ঞানবাদ তথাকথিত নিরপেক্ষতার বেশ ধারণ করে রাখে।

আমি আশা করব বিজ্ঞানবাদের সাথে আমার এই দ্বৈরথ যেন পাঠকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি না করে যে, আমি প্রকৃতিবিজ্ঞানের (natural science) বিরোধী। বিজ্ঞানের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি বিজ্ঞানের আবিষ্কার, উদ্ভাবন কিংবা উন্মোচনের বিমুখী হওয়ার আহ্বান করছি না। আমি কখনো গাড়ি কিংবা বিমানে ভ্রমণ পরিত্যাগ করে উট গাধার যুগে ফিরে যেতে উৎসাহিত করি না। আর বর্তমানে তো কম্পিউটার ব্যবহার করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। অথবা মোবাইল, যার দ্বারা আমি দূরের কাউকে ফোন করতে পারি অথবা নিখোঁজ কারও খোঁজ নিতে পারি। আমি প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিরোধী নই। বিজ্ঞানের মাধ্যমে যেসব উপকারী বস্তু আমাদের জীবনযাত্রা সহজ করেছে, তা আমার জন্যও সুখকর। এতৎসত্ত্বেও আমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত নই।

নাস্তিকদের প্রচার-প্রচারণার জিগির ও তার ছদ্মবেশ যে নাস্তিক্য মতাদর্শী বক্তব্য গোপন রাখে, তা আমার সম্মুখে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না। আজকের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যখন চিন্তাচেতনা ও মতাদর্শগুলো পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত, তখন 'বিজ্ঞানে বিশ্বাস' (believe in science) ভাষ্যটি ঐশী প্রত্যাদেশের

বার্তাবিমুখতার ইঙ্গিত প্রদান করে, এবং ধর্মকে অন্ধকার ও যাযাবর যুগের নিদর্শনসমূহের একটি হিসেবে গণ্য করে। কেননা তাদের ভাষ্যমতে তা হচ্ছে কল্পকথা ও ভ্রমের উৎস। যেহেতু তার ভিত্তি কোনো মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ কিংবা কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের ওপরে নয়।

অতএব সেই পেইজের ব্যাপারে আমার অসমর্থন তাড়াহুড়াপ্রসূত অথবা অতি সংবেদনশীলতা থেকে ছিল না। তা ছিল সেই স্লোগানকে প্রসঙ্গের সাথে সম্পৃক্তকরণ ও সঠিক জ্ঞানের সাথে তা উপলব্ধি করার ফল। মানব-চাহিদা অনুযায়ী বস্তু আবিষ্কার কিংবা রহস্য উন্মোচনকারীদের প্রতি বিদ্বেষী উগ্র ব্যক্তির দ্বারা আপনার সম্মুখে থাকা এই বইটি রচিত হয়নি; বরং এই বইটি হচ্ছে নাস্তিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত জটিল একটি চ্যালেঞ্জের জবাব, যার দ্বারা তারা ঈমান নষ্ট করতে চায়। তারা গবেষণাগারের আবিষ্কার ও এক্সপেরিমেন্টকে এতটাই মূল্যায়ন করে, যেন বিজ্ঞান বিবেক-বুদ্ধির সত্যতা ও ধর্মীয় বক্তব্যের উর্ধ্বে অবস্থান করে।

বিজ্ঞানবাদের এই ধারা এবং তা থেকে অন্য যেসব মতাদর্শগত ধারা উদ্ভূত হয় এসব ক্ষেত্রে কলম ধরতে যে বিষয়টি আমাকে বেশ অনুপ্রাণিত করেছে তা হচ্ছে, ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমন প্রচুর ইসলামি লেখা থাকা সত্ত্বেও গত দুই শতাব্দীতে ও বর্তমান সময়ে এই প্রসঙ্গে আলোচনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিশেষত পুরোদস্তুর দার্শনিক মতবাদের মতো বিজ্ঞানবাদের বিষয়ে তার সমর্থকদের বক্তব্যের পরিধি থেকেই তা পরিপূর্ণভাবে খণ্ডন করা সম্ভব।[১]

মুহাম্মাদ আবদুহু একটি বই লিখেছেন 'বিজ্ঞান ও সভ্যতার মাঝে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম (الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية)'; ফরিদ ওয়াজদি লিখেছেন

---

১. আরব প্রকাশনীগুলোতে গত কয়েক বছরে খুব অল্প সংখ্যক বই প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞানবাদকে একটি দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদ আমিন খলিলের 'বিজ্ঞান খোদা নয়' (العلم ليس إلها)। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পশ্চিমা বইও অনূদিত হয়েছে। তার মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডেভিড বার্লিনস্কির বই The Devil's Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions. কিন্তু ইসলামি প্রকাশনীগুলোর বিজ্ঞানবাদের বিশ্বাস নিয়ে গভীর পর্যালোচনার চাহিদা বাকিই রয়ে যায়। কেননা তা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত।

'বিজ্ঞানের যুগে ইসলাম' (الإسلام في عصر العلم) ; আল-গামরাভি বইটি প্রকাশ করেছেন। আদ দাওয়ালিভি প্রকাশ করেছেন 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি' (موقف الإسلام من العلم)। আমাদের ইসলামি প্রকাশনীগুলোতে এ বইগুলোই ঈমান ও বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতায় অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই বইগুলোতে বিজ্ঞানবাদের বিশ্বাসকে পর্যালোচনা করা হয়নি; বরং প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাথে ইসলামের যে বিরোধের দাবি করা হয় তা খণ্ডন এবং কুরআন পৃথিবীতে ভ্রমণ ও পরীক্ষামূলক গবেষণায় যে উৎসাহ প্রদান করে তা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ এ দুটির মাঝে বাস্তবিক সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে।

অপরদিকে পশ্চিমা প্রকাশনীগুলোতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সেখানে ধর্ম ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গে এত অধিক বই, প্রবন্ধ ও সাময়িকী রয়েছে, যা গণনা করাও দুষ্কর। কেননা বর্তমানে এই প্রসঙ্গটিই ব্যাপক আলোচিত। প্রতিদিনই প্রেস ও মঞ্চ থেকে এ প্রসঙ্গে নিত্যনতুন আলোচনা উঠে আসছে। কেননা তা খ্রিষ্টবাদের সাথে নাস্তিক্য মতবাদের সংঘর্ষের কেন্দ্রভূমি।

এতৎসত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্ব সাম্প্রতিক কয়েক দশক ব্যতীত ব্যাপক লেখালেখির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হতে পারেনি। এ সময় সুজান হ্যাক[২], টম সরেল[৩] ও রিচার্ড ওলসেনের[৪] রচনাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন : ভিটগেন্সটাইন[৫], সি এস লুইস[৬], ভন হায়েকের[৭] লেখায় বিজ্ঞানবাদের দার্শনিক অবস্থানকে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এবং আরও কিছু বই প্রকাশিত হয়েছিল,

---

২. Susan Haack, Scientism and Discontents, Rounded Globe, 2017

৩. Tom Sorell, Scientism: Philosophy and the Infatuation with Science, London: Routledge, 2017

৪. Richard G Olson, Science and scientism in Nineteenth-century Europe, University of Illinois Press, 2018

৫. Jonathan Beal and Ian Kidd, eds. Wittgenstein and Scientism, New York: Routledge, 2017

৬. John G. West, The Magician's Twin: C.S. Lewis on science, scientism, and society. Seattle: Discovery Institute Press, 2012

৭. Karl Milford, 'A note on Hayek's analysis of scientism, Hayek: economist and social philosopher: a critical retrospect, ed. Stephen F. Frowen, Palgrave Macmillan, 2014

যেখানে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবাদ উভয়ের ব্যাপারে প্রবন্ধ ছিল। তার মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেসের 'বিজ্ঞান কি অসীম? বিজ্ঞানবাদের চ্যালেঞ্জ' বইটি।[৮]

খ্রিষ্টবাদের সমর্থকরাও এই বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী ছিলেন। তখন জে. পি. মোরল্যান্ড[৯], জন লেনাক্স[১০], ইয়ান হাচিনসন[১১] এই বিষয়ে বই লিখলেন। কিন্তু বিষয়টি আরও গভীর ও পর্যাপ্ত গবেষণার দাবি রাখে। কারণ, কিছু অধ্যায় তো পূর্ণতার সাথে আলোচিত হচ্ছিল আর কিছু অধ্যায় আধুরাই রয়ে যাচ্ছিল। সেজন্য তখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় খুব অল্প পরিমাণে আলোচিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ দার্শনিক সুজান হ্যাক[১২]–এই ক্ষেত্রে যার বিশেষ ব্যুৎপত্তি রয়েছে–তার লেখার দিকে কেউ যদি লক্ষ করে, তাহলে সে দেখতে পাবে, বিজ্ঞানবাদের ক্ষেত্রে তার আলোচনা অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নয়, বরং নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সীমাবদ্ধ।

প্রত্যেক যুগের রয়েছে নিজস্ব উপাস্য

প্রত্যেক যুগের নিজস্ব উপাস্য রয়েছে। জনসাধারণ থেকে নিয়ে বিশেষ ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশ মানুষ সেই উপাস্যের পানেই ছুটে চলে। এমনকি যে সময় লোকেরা প্রধান ও পরম পূজনীয় মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলার আন্দোলন করে, তখনো নিজ যুগের উপাস্যের প্রতিই মানুষ অনুগত থাকে। কেননা বাস্তবতা হচ্ছে তাদের এসব আন্দোলন শুধু এক মূর্তির স্থলে অন্য মূর্তি প্রতিস্থাপন বৈ কিছুই নয়। যুগের

---

৮. Maarten Boudry and Massimo Pigliucci, eds., Science Unlimited? The Challenges of Scientism, Chicago: University of Chicago Press 2018

৯. James Porter Moreland, Scientism and Secularism: Learning to respond to a dangerous ideology, Wheaton, Illinois: Crossway, 2018

১০. John C. Lennox, Can Science Explain Everything?, VA: The Good Book Company, 2019

১১. Ian Hutchinson, Monopolizing knowledge. A scientist refutes religion-denying, reason-destroying scientism, Belmont, Mass: Fias Publishing, 2011

১২. Susan Haack (1945) : একজন ব্রিটিশ দার্শনিক। জ্ঞানতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর।

পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন যুগের নিজস্ব পরিচয় ও সম্মান-মর্যাদা পরিলক্ষিত হয়। এই লোকদের অন্তর মূর্তিপূজায় আচ্ছন্ন এই বাস্তবতা যখন তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, বিতর্ক করে এবং দাবি করে যে, পার্থিব সকল দাসত্ব থেকে তারা মুক্ত-স্বাধীন। অথচ ঠিকই ভিন্ন নামে তাদের পায়ে দাসত্বের বেড়ি পরানো আছে।

'বিজ্ঞানে বিশ্বাস' স্লোগানটি যুগের উপাস্যদের মাঝে অন্যতম উপাস্য। এই স্লোগান দিয়েই বিজ্ঞানের উপাস্যটি অন্যান্য উপাস্যের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে। এখন এই উপাস্যটি সর্বোচ্চ ও সর্বময় ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠায় অন্য কিছু তার নাগাল পায় না। এটিও এক প্রকার উগ্রবাদ ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা। এজন্যই মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট ট্রাসিন্সকি মাস দুয়েক আগে 'আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী নই' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, "কিছু মানুষ 'আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি' বাক্যটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Scientific method) যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সক্ষমতায় আস্থা রাখার ক্ষেত্রে একটি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করতে পারে।[১৩] অথবা হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে পারে যে, মহাবিশ্ব প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিচালিত হয়, যা পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির দ্বারাই আবিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষ এটাকে যে অর্থে ব্যবহার করে–বিশেষত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে–তা অনেক বেশিই বিপরীত। এটা তারা তাদের জ্ঞান বহির্ভূত কোনো বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দেওয়ার অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করছে। যা তারা বুঝতেও পারে না। 'আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি' কথাটির দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের প্রভাব ব্যবহার করে কোনো বিশেষ বৈজ্ঞানিক দাবিকে কর্তৃত্ব প্রদান করা ও সকল প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন থেকে সেটিকে মুক্ত রাখা।"[১৪]

---

১৩. এখানে বলে রাখা ভালো যে, যদিও আগে 'আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি' কথাটার প্রচলন ছিল; কিন্তু এখন বয়ানকে পুনঃনির্মাণ করে বলা হয়, 'বিশ্বাস কোনো ব্যাপার না, বিজ্ঞান যা বলবে তা আমি গ্রহণ করব'।

১৪. Why I Don't Believe in Science? Science isn't about "belief." It's about facts, evidence, theories, experiments. -Robert Tracinski Mar 26, 2019

যারা 'আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী' বুলিটি আওড়ায়, তারা মূলত বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। আমাদের এই যুগটিও অন্যান্য যুগের মতোই। আকর্ষণীয় স্লোগানগুলো এ যুগকেও করায়ত্তে নিয়েছে। প্রতিটি দল আকর্ষণীয় এই স্লোগানগুলো গ্রহণ করে নিয়েছে। প্রতিটি দলই নিজ দলের মর্যাদা বাড়াতে কখনো কখনো ন্যায়ভাবে এই স্লোগানগুলো ব্যবহার করে, আবার কখনো কখনো নিজ দলের হীনতা দূর করতে তারা মতবাদ, মূল্যবোধ ও আচরণগত বাণীগুলোকে অলংকৃত করে উপস্থাপন করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই স্লোগানগুলো এমন লোকদের ধোঁকা দেয়, যারা বিবেচনা ব্যতীত বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতবাদের মিছিলে অন্ধভাবে হাঁটে। তারা বক্তৃতার মাধুর্য ও পোশাকের চাকচিক্যে বিভ্রান্ত হয়।

অতীতে একদল লোক গ্রীক দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যুক্তিবাদের (Rationalism)[১৫] স্লোগান তুলে এটিকে ভ্রান্তির উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল। এই যুক্তিবাদের দ্বারাই তারা বিরোধীদের সমালোচনা করত ও তাদেরকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নিকৃষ্ট মানুষ বলে অপবাদ দিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এনলাইটেনমেন্টের[১৬] যুগের পরবর্তী সময়ে ইউরোপে 'মুক্তচিন্তার' বিপ্লবের সময় তারা এই যুক্তিবাদের স্লোগান উত্থাপন করেছিল। চার্চের একচ্ছত্র আধিপত্য কিংবা ঐশী বাণীর পরিবর্তে এই বিশ্ব ও মহাবিশ্ব নিয়ে জ্ঞান অন্বেষণের পথে এটিই ছিল একমাত্র পথপ্রদর্শক। এই স্লোগানটি উত্থাপন করেছিল বিশেষত ভলতেয়ার[১৭] ও টমাস পেইনের[১৮] মতো আস্তিক দার্শনিকরা।

---

১৫. 'যুক্তিবাদ' ছিল গ্রিক দর্শনের অন্যতম ভিত্তি, সক্রেটিসকে এর ক্রেডিট দেওয়া হয়, যদিও আরও দার্শনিকের ভূমিকা রয়েছে।

১৬. এনলাইটেনমেন্ট যুগে যুক্তি বা মুক্তচিন্তা বলতে বিজ্ঞানকে ইঙ্গিত করা হতো। এর কারণ মূলত 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লব' এর যুগ, যা ১৫০০-১৭০০ এর মধ্যে হয়েছিল। এবং এই বিপ্লবই 'এনলাইটেনমেন্ট' যুগের রাস্তা খুলে দেয়।

১৭. ভলতেয়ার (Voltarie) (১৬৯৪-১৭৭৮) : তার আসল নাম ফ্রঁসোয়া মারি আরুয়ে। তিনি একজন ফরাসি লেখক। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। তিনি তার বৈপ্লবিক মনোভাব ও ব্যাঙ্গাত্মক লেখালেখির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

১৮. টমাস পেইন (Thomas Paine) (১৭৩৬-১৭৭৩) : দার্শনিক ও ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতিদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন।

কোনো সন্দেহ নেই যে যুক্তিবিদ্যা খুবই প্রামাণিক,[১৯] কিন্তু যুক্তিবিদ্যার বাস্তবতা, তার পর্যবেক্ষণের সর্বশেষ সীমা, সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাপ্তি—এ বিষয়গুলো জানলে এই বিদ্যাকে সমস্ত ভুলের ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া অথবা জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ হিসেবে দাবি করা যায় না। যুক্তিবাদের স্লোগান তোলা ভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া ও সকল ত্রুটি থেকে নির্দোষতা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়।

যুক্তিবাদের আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবে বিজ্ঞানবাদের সেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, যা প্রকৃতিবিজ্ঞানের মূর্তিকে উঁচু স্থানে সমাসীন করে। তখন এটা ছাড়া আর কোনো উপাস্য ছিল না। অতঃপর নাস্তিক বিজ্ঞানবাদীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এলিট শ্রেণি ও সামাজিক ডারউইনবাদের সমর্থকদের দ্বারা উপস্থাপিত 'বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকতায়' অপরদিকে 'মানবতাবাদী নাস্তিকতায়' বিভক্ত হয়ে পড়ে, যা এই বিজ্ঞানবাদীদের থেকেও অধিক বিস্তৃত ও গুরুতর ছিল। তখন বৈজ্ঞানিক বিবৃতিগুলো এতটাই মূর্ত হয়ে উঠল যে, উপলব্ধি কিংবা অনুধাবনের ক্ষেত্রে তার কোনো নিয়ন্ত্রণরেখা ছিল না। কর্ম ও উপার্জনের জগতেও তাদের কোনো সীমানা ছিল না।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রকৃতিবিজ্ঞান নব্য নাস্তিক্যবাদ[২০] নামে পরিচিত সেই শক্তিতে ভর করে দৃঢ়ভাবে নিজেকে জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এটি জ্ঞানার্জনের অন্য উৎসগুলো বিচার করার মাপকাঠি হয়ে ওঠে। এ সময় বিজ্ঞানকে মহান ও কীর্তিমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যাতে অজ্ঞতার রোগ নিরাময় হয় ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হতে পারে।

মানব-ইতিহাসে বিজ্ঞান বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় বিষয়। এর দ্বারা জীবনে সমৃদ্ধি এসেছে, ক্ষুধা নিবারিত হয়েছে ও স্বপ্ন বাস্তবতার রূপ লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি সুসংগঠিত নাস্তিকতাবাদী

---

১৯. গ্রিক দার্শনিকদের সময়ে যুক্তি বহির্ভূত কোনো তথ্য থাকলে, সেটাকে সত্য বলে গণ্য করা হতো না। এনলাইটেনমেন্ট-এর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ধারণা করা হয়, বিজ্ঞান-বহির্ভূত তথ্যের অস্তিত্ব থাকলে সেটাও সত্য হিসেবে গণ্য হবে না।

২০. 'নব্য নাস্তিক্যবাদ' গত দুই দশকে প্রকাশিত নাস্তিকতায় আহ্বানকারীদের এক নতুন আন্দোলন। তারা বিজ্ঞানের অনুমান ও আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে ধর্মকে মিথ্যা প্রমাণিত করার চেষ্টায় লিপ্ত। ধর্মের সমালোচনা ও তাকে নির্মূল করার প্রচেষ্টাই তাদের মূল লক্ষ্য।

আন্দোলন প্রকাশ পেলে তা আরও ব্যাপ্তি লাভ করে। তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ও শিরোনামে যুক্তিবাদের সাথে এই বিজ্ঞানের স্লোগান ছিল—বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরবিরোধী। বিজ্ঞানকে মেনে নিলে ধর্ম ত্যাগ করা অপরিহার্য।

বিজ্ঞানবাদের সর্বশেষ পর্যায়টি আরও স্বতন্ত্রভাবে নিজের অবস্থান তুলে ধরে, যখন প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা দার্শনিক বিতর্কে লিপ্ত হতে শুরু করে (যদিও দার্শনিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ দর্শন অধ্যয়নেও সাধারণভাবেই তাদের দুর্বলতা ছিল।) অতঃপর জীববিজ্ঞানী ডকিন্স[২১], স্নায়ুবিজ্ঞানী স্যাম হ্যারিস[২২] ও পদার্থবিদ লরেন্স ক্রস[২৩] এর লেখাগুলো বেশ প্রসিদ্ধি পেতে থাকে। আর এই লেখকরা জনসাধারণ ও এলিট শ্রেণির লোকদের সামনে কথা বলার বড় একটি প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যায়।[২৪]

নব্য নাস্তিকতাবাদের প্রবক্তাদের বক্তৃতায় অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের স্বর্গের বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞানবাদ নতুন একটি স্বর্গ উপস্থাপন করে। কেননা বিজ্ঞান হচ্ছে সার্বিকভাবে মানববিকাশের শক্তি। তার পবিত্র গ্রন্থে আমাদের সকল প্রশ্ন অথবা অধিকাংশের উত্তর রয়েছে।[২৫] বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান যেসব উত্তর দিতে সক্ষম নয় তা বিজ্ঞানের ভেতরেই নিহিত রয়েছে, যা আগামীতে প্রকাশিত হবে। এদের

---

২১. রিচার্ড ডকিন্স (Richard Dawkins) (১৯৪১-) ব্রিটিশ লেখক। নব্য নাস্তিক্যবাদের প্রথম সারির লোক। আস্তিকতার বিরোধিতা ও সেকুলার ডারউইনিজমের পক্ষে তার বইগুলো পশ্চিমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তার উল্লেখযোগ্য একটি বই হচ্ছে 'দ্য গড ডিলিউশন'।

২২. স্যাম হ্যারিস (Sam Harris) (১৯৬৭-) মার্কিন লেখক। নব্য নাস্তিক্যবাদের প্রথম সারির লোক। তার প্রধান আগ্রহ ছিল ধর্মীয় রীতিনীতি, নীতিশাস্ত্র ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সাথে স্নায়ুবিজ্ঞানের (Neuroscience) সম্পর্ক নিয়ে।

২৩. লরেন্স ক্রস (Lawrence Krauss) (১৯৫৪-) তিনি একজন মার্কিন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ও ভৌতবিশ্বতাত্ত্বিক (cosmologist)। নব্য নাস্তিক্যবাদের পক্ষে তিনি অনেক বিতর্ক ও টকশোতে আলোচনা করেন।

২৪. প্ল্যাটফর্ম পাওয়ার কারণ হচ্ছে, বিজ্ঞান এমন বাস্তব জগৎ নিয়ে কাজ করে, যা দেখা যায়, ছোঁয়া যায় ও চোখের সামনে সফল হতে দেখা যাওয়াতে মানুষের মনে একপেক্ষিতা (biasness) কাজ করে। যার কারণে মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

২৫. পবিত্র গ্রন্থ বলতে, অন্যান্য ধর্মের মতো এখানে কোনো 'ঐশী গ্রন্থ' না থাকলেও যেসব বিজ্ঞানী অনেক বিখ্যাত, সাধারণ মানুষরা তাদের বইকে এক প্রকার মানদণ্ড হিসেবে ধরে নেয়, ঠিক যেমন অন্যান্য ধর্মের মানুষরাও নিজ ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে একই আচরণ করে থাকে। অপরদিকে যারা বিজ্ঞানী তারাও বলবে, 'বিজ্ঞানীরাও ভুল করতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান নয়'।

কাছে বিজ্ঞান হচ্ছে সকল রহস্য ও রহস্যের গূঢ় তত্ত্বের বিষয়ে অবগত। তার কল্যাণের প্রতিশ্রুতি চিরন্তন। এটি জ্ঞানার্জনের একটি নিরপেক্ষ, কার্যকর ও বিশ্বস্ত কল্যাণকামী মাধ্যম।

আমরা যদিও বিজ্ঞান শিক্ষার অবদানকে অস্বীকার করি না, যুগের বিভিন্ন আবিষ্কারে আমরাও খুশি হই, তথাপি দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানবাদ নিজেকে শুধুমাত্র কিছু বিষয়ের আবিষ্কারক কিংবা উন্মোচনের ধারক মনে করে এমন নয়, বরং সে নিজেকে তারচেয়ে ভিন্ন ও বড় কিছু মনে করে। বিজ্ঞানবাদ সমগ্র মহাবিশ্বের ব্যাপারে এমন একটি পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করছে, যা প্রামাণিকভাবে বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; বরং বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে পরীক্ষামূলক প্রমাণের থেকে সম্পর্কহীন দর্শন সংশ্লিষ্ট মতবাদগুলো প্রচারের জন্য। অতএব বিজ্ঞানবাদের সাথে আমাদের এই মতবিরোধ শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের উৎস ও আদর্শ প্রচারের বাণীকে কেন্দ্র করে; বিজ্ঞানের অবদান কিংবা রোগের বিপক্ষে লড়াই, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অথবা পোশাকের উষ্ণতা খোঁজার কৃতিত্বের বিপক্ষে নয়।

অতএব পাঠকের সম্মুখে এই বইটি বিজ্ঞানবাদের বাস্তব অবস্থা ব্যাখ্যা করে তার সূচনা ও মূলনীতিগুলো বর্ণনা করবে। তার অসঙ্গতি ও ভুলগুলো তুলে ধরে যুক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞানবাদকে যাচাই করে দেখাবে।

সৌন্দর্যের অন্তরালে যা অজানা-ই থেকে যায়

কয়েক মাস আগের কথা। আমেরিকা প্রবাসী এক মুসলিম ব্যক্তি সমস্যায় পড়ে আমাকে ফোন করলেন। তার মেয়ে বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। উভয়ের সম্পর্ক যেন ব্যভিচারে পরিণত না হয়, তার সমাধান খুঁজতে গিয়ে মেয়েটির মা ছেলেটিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করল। মা যখন এই ধর্মহীন ছেলেটির সামনে ইসলামের আলোচনা তুলে ধরল, ছেলেটি তখন দ্বিধাহীনভাবে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই মায়ের কথা প্রতিবাদ করে বলে উঠল—আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। সে খুব স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করল যে, সে প্রাথমিক জীবন থেকেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, কারণ ধর্ম একটি অবৈজ্ঞানিক বিষয়। আমি মায়ের থেকে এই ঘটনা শুনে তাকে বললাম, আপনার কথা এই যুবক

আগ্রহী হয়ে শুনবে এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কেননা সে না বুঝেই কিছু বুলি মুখস্থ করে নিয়েছে। এই আমেরিকান ছেলে তো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া নয়। সে মাদকাসক্ত ও কর্ম-জীবনে ব্যর্থ। সে এখনো পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। আমেরিকায় বাস করেও তার জীবনের সবকিছুই ব্যর্থ। কিন্তু সে না বুঝে শুধু বিজ্ঞানবাদের এই আকর্ষণীয় স্লোগান মুখস্থ করেছে যে, 'বিজ্ঞান ছাড়া কিছু বিশ্বাস করা যাবে না'।

বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও তার ভূমিকা, আনুষাঙ্গিক বিষয়াবলির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই এই স্লোগানটি বিশিষ্ট নাস্তিকেরা পশ্চিমা বিশ্ব ও আরব বিশ্বে বারবার প্রচার করে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই স্লোগান নিয়ে বেশি উচ্চবাচ্য করে প্রধানত যারা যৌক্তিক বিজ্ঞান পড়েনি। কেননা ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, জ্ঞানীয় জটিলতার সৃষ্টি করে। তা ছাড়া এটি বিবেকনিষ্ঠ জ্ঞানের পন্থাও নয়। যে দার্শনিক বিবৃতিগুলো কেবলমাত্র তার বাহ্যিক শিরোনামেই আশ্বস্ত এবং কোনো ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণে অক্ষম, সে দার্শনিক বিবৃতিগুলো কেবলমাত্র তার বাহ্যিক আবরণেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, 'শুধু বিজ্ঞানই গ্রহণযোগ্য' স্লোগানের প্রধানতম বিরোধীদের মাঝে আছে নাস্তিক দার্শনিকরা। তারা অনেক সময় স্পষ্ট ভাষায় এই দাবির অসারতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অপরিপক্কতা প্রকাশ করেছে। যেমন মাইকেল রুজ[২৬] বলেন, 'আমি এটা বিশ্বাস করি না যে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের দ্বারাই সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অতএব পৃথিবীর অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা সম্ভব ধরে নিলে বিজ্ঞানের চেয়েও বেশি কিছুর প্রয়োজন হবে।'[২৭]

একটি দল প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতি নিজেদের আস্থাশীলতা দাবি করে বিজ্ঞান ছাড়া জ্ঞানের অন্য সকল পন্থাকে তুচ্ছ মনে করে অর্থহীন আনন্দ খুঁজে পায়। তারা মূলত তাদের বক্তব্যের প্রেক্ষাপট অনুধাবনে অক্ষমতার ফলে ধোঁকার মাঝে

---

২৬. Michael Ruse (জন্ম ১৯৪০) একজন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞান দার্শনিক। বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং সৃষ্টি ও বিবর্তনের বিতর্কে তার বিশেষ বিচক্ষণতা রয়েছে।

২৭. Interview with Michael Ruse. Gary Gutting, 'Does Evolution Explain Religious Beliefs?' The Stone, The New York Times, JULY 8, 2014

রয়েছে। কারণ তারা আপনার কাছে এই দাবি চাপিয়ে দেয় যে, আপনি তাদের মতবাদ বিশ্লেষণে নিজ থেকে ব্যর্থ চেষ্টা ব্যয় করবেন। আবার তাদের মতবাদের আবশ্যকীয় বক্তব্যগুলো জ্ঞানের সাধারণ অধ্যায়েও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পূর্বের অনুমানগুলো নিরীক্ষণ ব্যতীত জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিকে গ্রহণ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি তাড়াহুড়া করে। এই অনুমানগুলোকে তা স্বতঃসিদ্ধ মনে করে, যা পুনরায় যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সত্য হচ্ছে এই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটিটি তার অকথিত পূর্বানুমানের মাঝেই রয়েছে।

এখন এই বিষয়গুলো প্রাথমিক অবস্থা থেকে বুঝতে হবে, এর জন্য প্রথমে সব বিষয়ে বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্তির ফলে যে উদ্ভূত বিভ্রান্তি তৈরি হয়, তা দূর করতে হবে। আর বিজ্ঞান যখন অস্তিত্বের সকল ক্ষেত্রে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে নেয় তখন বিজ্ঞানের ঔদ্ধত্যের পরিণাম অনুসন্ধান করা উচিত। এজন্য বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবাদের বিষয়গুলো একদম সূচনালগ্ন থেকে গবেষণা করতে হবে। তার ইতিহাস ও পরিভাষা, অতঃপর তার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী ফলাফলে আবশ্যক বিষয় ও পরিণামসমূহ দেখতে হবে। তাই আমরা কুসংস্কারের বিপরীত আকর্ষণ থেকে নয়, বরং প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতি যে পক্ষপাতমূলক আকর্ষণ, তা থেকে মানবীয় জ্ঞানের প্রতি ন্যায়বিচার করব। আমাদের লক্ষ্য হলো মানবীয় জ্ঞান-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের সঠিক অবস্থানকে নির্ণয় করা।

কয়েকটি চ্যালেঞ্জিং বিজ্ঞানবাদী প্রশ্ন :

প্রথমদিকে বিজ্ঞানবাদ খুবই সহজবোধ্য একটি বাক্য হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। তবে তা ব্যাপক অর্থবহ ছিল। স্বাভাবিকভাবে দেখলে তা প্রত্যক্ষভাবেই নিজের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করত। এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন, যা জ্ঞানের মহান তত্ত্বের সুগভীরে নিহিত।

বিজ্ঞানবাদ কর্তৃক পূর্বগৃহীত মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানবাদের কতক অপরিহার্য অনুষঙ্গ এমন আছে, যা থেকে একজন বিজ্ঞানবাদী পলায়ন করতে পারে না। কাজেই সেগুলো বোঝার জন্য আমরা মূল বিষয়বস্তুকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নে বিভক্ত করব, যাতে আমরা বিজ্ঞানবাদের মতাদর্শকে মূল্যায়ন করতে পারি এবং তার কতটুকু অংশ সঠিক তা যাচাই করে দেখতে পারি। তা ছাড়া আল্লাহ

তাআলার প্রতি বিশ্বাসের সাথে তা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ অথবা কতটা অসঙ্গতিপূর্ণ তা অনুসন্ধান করতে পারি।

এ বিষয়গুলো যাচাই করার জন্য এ বইয়ে সে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে, যা বিজ্ঞানের মতাদর্শের সমস্যা পর্যালোচনা করার সময় জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়। তা হলো :

- বিজ্ঞানবাদ কী?
- বিজ্ঞানবাদ কি শুধু একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণামূলক থিওরি না-কি সুবিস্তৃত একটি মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি?
- বিজ্ঞানই কি জ্ঞানার্জনের একমাত্র পথ?
- বিজ্ঞানবাদ কি আসলেই বিজ্ঞানভিত্তিক?
- বিজ্ঞান কি সত্যিকারভাবেই পক্ষপাত বা অনুভূতিহীন বস্তুনিষ্ঠ বিষয়?
- বিজ্ঞানবাদ কি তার নিজস্ব মানদণ্ডে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করতে সক্ষম?
- মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক বিষয়ে কি বিজ্ঞানবাদের নেতিবাচক ভূমিকা আছে?
- আল্লাহ তাআলা ও বিজ্ঞান কি পরস্পরবিরোধী? আমাদের কি যেকোনো একজনকে গ্রহণ করে নিতে হবে?
- বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে কি রবের অস্তিত্ব অস্বীকার করার সুযোগ রয়েছে?

আমরা বস্তুনিষ্ঠ সমীক্ষা ও অনুসন্ধান করে এ প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদানের চেষ্টা করব। এদিকেও লক্ষ রাখা হবে যে, এ বইয়ে যখনই আমরা মূলনীতি বা আবশ্যক বিষয় আলোচনা করব, সে আলোচনার মাঝে মাঝে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানবাদের সংজ্ঞা ও তার প্রভাবগুলোর আলোচনা পুনরাবৃত্তি হবে।

আমাদের বিশ্বাস, এ বইয়ের মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে প্রকৃত আলোচনা তুলে ধরে নাস্তিক্যবাদী যুক্তিগুলো খণ্ডন করার ক্ষেত্রে আমরা একটি বড় লক্ষ্য অর্জন করেছি; যা আমাদের 'যুক্তির নিরিখে নাস্তিক্যবাদ' সিরিজের একটি

বড় সফলতাও বটে। তা ছাড়া এতে করে বিজ্ঞানীদের সাথে নাস্তিক্যবাদের সম্পর্ক ও সত্যের মানদণ্ডে তার অবস্থান কেমন তাও উঠে আসবে ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ, আপনি যা সহজ করে দেন তা ছাড়া সবই কঠিন। অতএব নাস্তিক্যবাদের যুক্তিগুলোর বাস্তবতা স্পষ্ট করাকে সহজ করে দিন। হে আল্লাহ, বইটি রচনার ক্ষেত্রে আমার ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে আপনি মার্জনা করুন! আমিন।

বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানবাদ

> 'আর আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।'
>
> [সুরা ত্বহা, আয়াত ১১৪]

> "বর্তমান সময়ে 'বিজ্ঞানবাদ' শীর্ষক নিন্দনীয় পরিভাষাটি এই অর্থে ব্যবহার করা হয় যে, বিজ্ঞান আমাদের সকল সমস্যার সমাধান প্রদান করতে সক্ষম!"
>
> —দার্শনিক এলিস্টার ম্যাকগ্রা[২৮]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক ধর্মহীন যুবক ও তাদের নাস্তিক্য ভাবাদর্শই বিজ্ঞানবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তবে তার প্রকৃত রূপ মানুষের নিকট এখনো অজানা। কেননা তার সমর্থকরা বিজ্ঞানবাদকে সুস্পষ্ট ও প্রকৃত মতবাদের ভাষায় নয়, বরং আকর্ষণীয় মার্কেটিং প্রচারণার ভাষায় উপস্থাপন করার প্রয়াসী। বিজ্ঞানবাদ পরিভাষাটির শব্দগত প্রচ্ছন্নতা এই আদর্শের বাস্তবিক সীমা ও তার পরিণতি ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে তার সাধারণ অনুসারীদেরকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধাঁধায় ফেলে রাখে। এটি এক ধরনের শাব্দিক প্রবঞ্চনা। আরবি ভাষায় এই শব্দটির উৎপত্তি 'ইলম' তথা জ্ঞান থেকে। আদতে যার অর্থ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। জ্ঞান হচ্ছে কোনো বিষয়ের আদ্যোপান্ত সার্বিক অবস্থা জানা।[২৯]

---

২৮. Alister E. McGrath, Dawkins'God: From the Selfish Gene to The God Delusion (UK: John Wiley & Sons, 2014), p 80

২৯. আল বাকিল্লানি, আত তাকরিবু ওয়াল ইরশাদ (বৈরুত, মিশন ফাউন্ডেশন, ১৪১৩

এখান থেকে কিছু প্রশ্ন উঠে আসে :

- বিজ্ঞান কী আর বিজ্ঞানবাদ কী?
- বিজ্ঞানবাদের ইতিহাস কী?
- ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বে বিজ্ঞানের অবস্থান কী?
- বিজ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পর্ক কী?

বিজ্ঞানবাদের সংজ্ঞা

প্রথাগত ইসলামি অভিধানে জ্ঞান সাধারণত[৩০] ইতিবাচক অর্থ প্রদান করে। অতএব জ্ঞান হচ্ছে অজ্ঞতার বিপরীত, বিভ্রমের বিরোধী। বিজ্ঞান হচ্ছে কোনো কিছুর বাস্তবিক জ্ঞান লাভের সমার্থক এবং জ্ঞানীয় নিশ্চয়তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিটি প্রচেষ্টা এতে অন্তর্ভুক্ত যে প্রচেষ্টার দ্বারা সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

বিজ্ঞান শব্দটি ইংরেজি (science) ল্যাটিন (scientia) শব্দ থেকে নির্গত। যুক্তির মাধ্যমে যা জানা যায় তার সবকিছু এতে অন্তর্ভুক্ত। তা শুধু পরীক্ষালব্ধ হতে হবে এমন নয়। এজন্য যুক্তিবিদ্যা, গণিত ও দর্শনও এতে অন্তর্ভুক্ত। Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers অভিধানে[৩১] বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'জ্ঞান হচ্ছে দার্শনিক অর্থ অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত উপলব্ধি। চাই তা স্বতঃসিদ্ধ নীতির ওপর ভিত্তি করে হোক বা নিয়মতান্ত্রিক যুক্তি উপস্থাপনের পন্থায় হোক। জ্ঞান শব্দটি এই অর্থে সন্দেহের বিপরীত।'[৩২]

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান বলতে সাধারণভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞান (Natural science) বোঝানো হয়।[৩৩] তা হচ্ছে পদার্থবিদ্যাগত যে সূত্রসমূহ প্রকৃতির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে তার ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করা।

হিজরি/১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ১৭৬। তবে এই সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানকে অবগতি লাভ বলেন না।

৩০. এখানে সাধারণত বলা হয়েছে, কেননা কথা বলার সময় তা শুধু উপলব্ধি বোঝায়।

৩১. অভিধানটি সম্পাদনা করেছে দিদোরেত, যা ১৭৫১ সাল থেকে ১৭৭৭ সাল পর্যন্ত একুশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এটি এনলাইটেনমেন্টের চেতনাকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছে।

৩২. Cited in : Ian Hutchinson, Monopolizing Knowledge, pp 5-6

৩৩. অবশ্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কী তা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো দার্শনিক ও বিজ্ঞানী একমত হতে পারেনি। –Philosophy of science: A very short introduction, Samir Okasha

অথবা কলিন্সের ইংরেজি অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী 'প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের গতি-প্রকৃতি অধ্যয়ন ও সে সম্পর্কে অধ্যয়ন করে আমরা যা পাই তা জানা।'[৩৪] আরও সংক্ষেপে ম্যাকগ্রা তার 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে' বলেছেন, "বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের অধ্যয়ন।"[৩৫]

সংক্ষেপে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা যদি এটাই হয় যে, ভৌত-জগতের নিয়মনীতি উপলব্ধি করার জন্য তার নির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন, তাহলে মৌলিকভাবে ও উদ্দেশ্যগতভাবে বিজ্ঞানবাদ এটার সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা তা প্রকৃতির বস্তুবাদী গঠনের নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন নয়, বরং ভিন্ন কিছু। তা হচ্ছে মূলত বিজ্ঞানের দর্শন, অথবা বাহ্য-জগতের প্রকৃত অবস্থা অধ্যয়নের পদ্ধতিগত তাত্ত্বিক কাঠামো।

বিজ্ঞানবাদকে অস্বীকার করার দ্বারা আমরা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করি না। বরং আমরা বিজ্ঞানের আদর্শিক ভাবধারাটি বিশ্বদর্শন হয়ে ওঠাকে প্রত্যাখ্যান করি। যেমন আমরা যুক্তির প্রামাণিকতা স্বীকার করে নিলেও যুক্তিবাদ (Rationalism)-কে অস্বীকার করি। যা মূলত ঐশী প্রত্যাদেশের উৎসমূল ও বাস্তবতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যেমন পদার্থবিজ্ঞানের কোনো নব আবিষ্কারে আমরাও খুশি হই, কিন্তু আমরা ভৌতবাদের মতাদর্শ অস্বীকার করি। যা মনে করে যে মানুষ হচ্ছে অন্ধ শারীরিক মিথস্ক্রিয়ার সমষ্টি। আমরা একদিক থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যম ও গবেষণার পদ্ধতির মাঝে এবং অপরদিক থেকে আদর্শ ও তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করি।

বিজ্ঞানের আদর্শিক দিকটি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আজ অবধি বিজ্ঞানকে একটি নেতিবাচক খ্যাতি দিয়েছে। দুই শতাব্দী আগেও বিজ্ঞানবাদ ফরাসি সাহিত্যে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হতো। যেমন : উগ্রতা, শীতলতা, অতিরঞ্জন, লাম্পট্য, সংকীর্ণতা, মূর্খতা ও অভদ্রতা।[৩৬]

এজন্যই নাস্তিক দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট তার 'ধর্ম নামক প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের মোহভঙ্গ' (Breaking the Spell: Religion as a Natural

---

৩৪. https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/science

৩৫. McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology (McGraw-Hill, 1966) 12/73

৩৬. Peter Schöttler, Scientisme, sur l'histoire D'un Concept Difficile, Revue de Synthèse, volume 134, (2013), 98

Phenomenon) বইয়ের সমালোচকদের ব্যাপারে বলেছিলেন, "যখনই কেউ কোনো একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উত্থাপন করে, যা ধর্মীয় সমালোচকদের নিকট অপছন্দনীয়, তখনই সে 'বিজ্ঞানবাদের' নামে এটিকে বিকৃত করার আশ্রয় গ্রহণ করে।'[৩৭]

বিজ্ঞানবাদের এই নেতিবাচক বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও অনেক লেখক বিজ্ঞানবাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছে, তাদের মতে 'যেকোনো ঘটনা বোঝার একমাত্র সঠিক পন্থা হচ্ছে বিজ্ঞানবাদ।'[৩৮] যারা এ দাবি করে, তাদের মাঝে রয়েছে অ্যালেক্সান্ডার রোজেনবার্গ,[৩৯] জেমস লেডিম্যান,[৪০] ডন রজ,[৪১] ডেভিড স্পারেট[৪২] ও জেরি ফোডর।[৪৩] ফোডর লিখেছেন, আমি একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি, যা সাধারণত নেতিবাচক অর্থে দেখা হয়, তা হচ্ছে 'বিজ্ঞানবাদ'। তা দাবি করে যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতামূলক তথ্যের আবিষ্কার। আর বিজ্ঞান এই উদ্দেশ্য অর্জনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। আমি এই বিশ্বাস রাখতে চাই যে, বিজ্ঞান, যা এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তা শুধুমাত্র সঠিকই নয়, বরং নিশ্চিতভাবে সুস্পষ্ট ও সঠিক। এটি এমন একটি বিষয়, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে জ্ঞানী অথবা শিক্ষিত কোনো ব্যক্তির এতে সন্দেহ করা উচিত নয়।[৪৪]

---

৩৭. Cited in: Shoito Byrnes, 'When it comes to facts, and explanations of facts, science is the only game in town, New Statesman, 10 April 2006

৩৮. অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট প্রফেসর পিটার এর মতে, বিজ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র পন্থা এবং ধর্মের জায়গা নেওয়ার যোগ্য। –Nature's Imagination - The Frontiers of Scientific Vision, chapter 8

৩৯. Alexander Rosenberg (1946) : Duke University-এর দর্শন বিভাগের শিক্ষক। বিজ্ঞান ও অর্থনীতির দর্শনে তার বিশেষ পাণ্ডিত্য রয়েছে।

৪০. James Ladyman ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মার্কিন দার্শনিক। ভৌতবিজ্ঞানের দর্শন ও প্রকৃতিবাদের দর্শনে তার বিশেষ অবদান রয়েছে।

৪১. Don Ross : University of Cape Town-এর অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক।

৪২. David Spurrett : দর্শনের শিক্ষক ও Howard College Campus-এ জ্ঞানতাত্ত্বিক বিজ্ঞান অনুষ্ঠানের প্রধান।

৪৩. Jerry Fodor (1935-2017) : সুপ্রসিদ্ধ একজন মার্কিন দার্শনিক। তার রচনা ভান্ডার বেশ বিস্তৃত। মনের দর্শন ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বিজ্ঞানে তার বিশেষ অবদান রয়েছে।

৪৪. Jerry Fodor, Is Science Biologically Possible in Naturalism Defeated? James K. Beilby, ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2002), p. 30

বিজ্ঞানবাদ তাহলে বিজ্ঞানের একটি দার্শনিক ভাবধারা। এটি উপযোগিতা কিংবা প্রয়োজনীয়তা কোনো দিক থেকেই বিজ্ঞান নয়। এটি বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি ও এর জ্ঞানতাত্ত্বিক সক্ষমতা। তাই এটি বিজ্ঞানের সমগ্র অস্তিত্বের মধ্য থেকে একটি প্রাথমিক ধারণাকে নিরীক্ষা করে। বিজ্ঞানবাদের মৌলিক অর্থের একটি সমষ্টিকে ঘিরে এর অনেকগুলো সংজ্ঞা রয়েছে।

বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে :

* বিজ্ঞানের চেতনা ও তার পদ্ধতিগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা।[৪৫]

* একটি থিসিস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে প্রকৃতিবিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহ সকল গবেষণার কাজেই ব্যবহার করা অপরিহার্য। কেননা তাতে দর্শন, মানবিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত। এটা এমন বিশ্বাস যে, জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করতে হবে।[৪৬]

* এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন যা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি দৃষ্টবাদ (Positivism) দর্শনের ছায়াতলে বেড়ে উঠেছে। তার মূলভাব হচ্ছে, মানবজাতির সকল সমস্যা সমাধানে ও তার চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এবং তার পদ্ধতিসমূহ সক্ষমতা রাখে।[৪৭]

* বর্তমান সময়ে পশ্চিমা বিশ্বে বিজ্ঞানবাদ পরিভাষাটি প্রকৃতিবাদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অথবা হ্রাসবাদ অথবা মানববাদী সেকুলারিজম। অর্থাৎ এখানে এটা বিশ্বাস করা হয় যে, এই ভৌত-জগৎটাই একমাত্র বাস্তবতা। আর এই বস্তুবাদী জ্ঞান অর্জনের জন্য বিজ্ঞান একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা প্রদর্শন করে। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব শুধুমাত্র বিজ্ঞানের, যা অতিপ্রাকৃত তথ্যের জ্ঞান সম্পর্কে ধর্মের সকল দাবিকে নিছক কল্পনা বা মিথ্যা হিসেবে সাব্যস্ত করে।[৪৮]

---

৪৫. André Lalande, Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie (PUF, 2010), p. 960

৪৬. Webster's Third New International Dictionary of the English Language

৪৭. Dizionario Devoto-Oli 2000-1

৪৮. Lindsay Jones, et al, eds, Encyclopedia of Religion (Detroit: Munich, Thomson Gale. 2005), 12/8185

* বিজ্ঞানের এই আধুনিক পরিভাষা ও সামসময়িক বিজ্ঞানীগণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে যেভাবে উপস্থাপন করে, তাতে বিজ্ঞানের প্রতি এই আস্থা সৃষ্টি হয়, তা জ্ঞানার্জনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক পদ্ধতি বর্ণনা করে। এটি বাস্তব যেকোনো বিষয়ে উপলব্ধ হতে পারে।[৪৯]

* বিজ্ঞান হচ্ছে বাস্তবতা জানার একমাত্র পন্থা।[৫০]

* এই পরিতুষ্টি লাভ করা যে, কোনো কিছুর জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়। বিশ্বকে বিজ্ঞান যেভাবে ব্যাখ্যা করে সেটিই মৌলিকভাবে সঠিক। বিজ্ঞান বাস্তবতা সম্পর্কে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জ্ঞান প্রদান করে। বিজ্ঞানবাদী হওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনি বিজ্ঞানকে বাস্তবতা ও প্রকৃতির একমাত্র প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করেন। তা হচ্ছে আমাদের প্রকৃতি ও তার যাবতীয় বিষয়াদি।[৫১]

* জ্ঞান বা সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার তুলনায় প্রকৃতিবিজ্ঞানকে খুব বেশি মূল্যায়ন করা।[৫২]

* এই বিশ্বাস লালন করা যে, সঠিক জ্ঞান একমাত্র বিজ্ঞান থেকেই আগত। বিজ্ঞানীরা বলেন, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক। এটা ছাড়া অন্য যা কিছুকে জ্ঞান বলে দাবি করা হয় তা হচ্ছে কুসংস্কার, অযৌক্তিক জিনিস, অন্ধ মোহ বা বাজে আলাপ।[৫৩]

* এই দৃষ্টিভঙ্গি যা বলে তা হচ্ছে, বিজ্ঞানপ্রদত্ত জ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। পাশাপাশি অধিক পরিমাণে বিজ্ঞানচর্চা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত।[৫৪]

---

৪৯. John James Wellmuth, The Nature and Origins of Scientism (Milwaukee: Marquette University Press, 1944), pp. 1-2

৫০. Roger Trigg, Rationality and Science (Oxford: Blackwell, 1993), p.90

৫১. Alexander Rosenberg. The Atheist's Guide to Reality: Enjoying Life without Illusions (New York: W.W. Norton, 2011), pp.6-8

৫২. Tom Sorell, Scientism: Philosophy and the Infatuation with Science (New York: Routledge, 1991), p.x

৫৩. Ian Hutchinson. Monopolizing Knowledge. p.1

৫৪. Arthur Peacocke, Theology for a Scientific Age (Oxford: Blackwell. 1993). p.8

* বিজ্ঞানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত বিজ্ঞান আমাদের সকল তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে এবং ব্যবহারিক সকল সমস্যার সমাধানও উপস্থাপন করবে।[৭৫]

উল্লিখিত সকল সংজ্ঞার সামগ্রিক অর্থ হচ্ছে, যারাই বিজ্ঞানবাদ পরিভাষাটিকে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তারা সকলেই অস্পষ্টভাবে এটাই বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞানবাদ মূলত একাধিক বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত। যা তার প্রকৃত অবস্থা ও মূলনীতিসমূহ প্রকাশ করে। তা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞানবাদ শুধু বিজ্ঞানকে মহিমান্বিত করার চেয়েও বড় কিছু।

বিজ্ঞানবাদের এ সকল সংজ্ঞা থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় :

* বিশ্বজগৎ সামগ্রিকভাবে স্বয়ংক্রিয়, বস্তুগত রীতির কাছে সমগ্র অস্তিত্ব অনুগত। এই রীতিই সবকিছুকে প্রতিনিয়ত পরিচালিত করছে।

* বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে[৭৬] এমন পন্থায় পরিচালিত, যা থেকে তা বিচ্যুত হয় না। এই পন্থা জানা সামগ্রিকভাবে বিশ্বজগৎকে অনুধাবন করার নিশ্চয়তা দেয়।

* মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যার বিষয়কে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর সীমা থেকে বিয়োজন করে দেওয়া। কারণ তাদের মতে যা কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অথবা গবেষণার জন্য অনুপযুক্ত, সেসবই হচ্ছে কল্পকাহিনি-ফিকশন, আমাদের বাস্তব জীবনে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

* বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের পরিধি থেকে অতিপ্রাকৃত সবকিছু বিয়োজন করা। কেননা যে সকল ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সুযোগ নেই তা এমন অলীক কল্পনা, যার কোনো বাস্তবতা নেই।

---

৭৫. See G. Radnitzky, The Boundaries of Science and Technology, in The Search for Absolute Values in a Changing World. Proceedings of the 9th International Conference on the Unity of Sciences, 1978, Vol 2. p. 1008

৭৬. এই তত্ত্বটিই অধিক প্রচলিত। তবে নিয়তিবাদের কতিপয় বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তি কোয়ান্টামকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের মতানুযায়ী এই নিয়তিবাদ সকল ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে প্রদর্শিত হয় না।

* বিজ্ঞান একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমজাতীয় জিনিস। গবেষণার বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ঐতিহাসিক বিজ্ঞান হচ্ছে যেখানে অতীত ঘটনার ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করা হয়। আর পদার্থবিজ্ঞানের মতো প্রকৃতিবিজ্ঞানে, দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মতো মানবিক বিজ্ঞানে এবং নৃবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মতো সামাজিক বিজ্ঞানে কোনো মৌলিক পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সবকিছুই একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এবং একই মূলনীতি মেনে চলে। কেননা এই সমগ্র বিশ্ব একই বুনন, একই প্রকৃতির। আর তা হচ্ছে বস্তুবাদী প্রকৃতি।

* বিজ্ঞানের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। আজ অথবা কাল মহাবিশ্বের সকল গোপন ও অপ্রকাশ্য রহস্যের ব্যাপারে বিজ্ঞান জানতে পারবে। বিজ্ঞান হচ্ছে সকল সূক্ষ্ম জ্ঞান উপলব্ধি করার মাধ্যম এবং দূরবর্তী দিগন্তে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা। বিজ্ঞান আমাদের ধারণার চেয়েও মহান। তার বিস্ময়ের কোনো অন্ত নেই।

* বিজ্ঞান অস্তিত্বের বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য একটি বস্তুনিষ্ঠ বিষয়। সুতরাং কোনো কল্পনা বা খেয়ালখুশির সাথে বিজ্ঞান সম্পর্কহীন। এটি এই অস্তিত্বের একটি বিশুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং যে প্রকৃতিবিজ্ঞানের লেন্সে এই মহাবিশ্ব দেখে, শুধুমাত্র সেই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে।

* পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সবকিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরা, যেন তা জ্ঞান অর্জন করার একমাত্র উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। অথবা তা সর্বোচ্চ উৎস, যা অন্যান্য পন্থার ওপর কর্তৃত্ববান হয়। অতএব দর্শন, রাজনীতি কিংবা অর্থনীতির সমস্যায় সমাধান দেওয়ার একমাত্র অধিকারী হচ্ছে বিজ্ঞান। এটিই একমাত্র সঠিক ও কার্যকর জ্ঞান। আর এই প্রবাদের দ্বারা এটাই বোঝানো হয়—জ্ঞানের অন্য সকল শাখার ওপর গবেষণাগারের বিজ্ঞান আধিপত্য বিস্তার করেছে।

* জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে রেফারেন্স হিসেবে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের বক্তব্যই চূড়ান্ত বিবেচ্য। কোনো বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য বিজ্ঞানীদের উক্তি, তাদের গবেষণাপত্র এবং তাদের ল্যাব এক্সপেরিমেন্টের দিকে দেখতে হবে। যা কিছু বিজ্ঞানীদের কথায় নেই, সেই সবই অবৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ প্রমাণহীন মৌখিক দাবি।

* মানুষের প্রতিটি নৈতিক কর্মে বিজ্ঞান উপযোগী। এজন্য বিজ্ঞান নৈতিকতার ওপরেও কর্তৃত্ববান। কিন্তু নৈতিকতা বিজ্ঞানের ওপর আধিপত্য রাখে না।

* বিজ্ঞানবাদ প্রয়োজনের খাতিরে প্রমাণবাদ (Evidentialism) মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়। অতএব প্রতিটি গ্রহণযোগ্য দাবির অবশ্যই প্রমাণ থাকতে হবে এবং প্রমাণটি সায়েন্টিফিক হতে হবে।

* বিজ্ঞানবাদের দুটি অবস্থা রয়েছে—কঠোর ও নমনীয়। কঠোর বিজ্ঞানবাদের দাবি হচ্ছে প্রকৃতিবিজ্ঞান জ্ঞানার্জনের একমাত্র পন্থা। এ ক্ষেত্রে অন্য কেউ তার অংশীদার নেই। সমকক্ষ কেউ নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরে কোনো সত্য নেই। অতএব বিজ্ঞান একাই সত্যের অনুসন্ধানী এবং সকল দাবি যাচাইকারী। এটি চেতনার সংস্কারক ও মিথ্যার বিপরীত। পক্ষান্তরে নমনীয় বিজ্ঞানবাদ জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের তুলনায় তাকে ছোট করে দেখে। এটিও বাকি জ্ঞানের ওপর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রাধান্য দেয়।

মৌলিক দিক থেকে এটাই বিজ্ঞানবাদের বাস্তবতা, অন্তর্নিহিত বিষয় ও মূলনীতি। আর এই বইয়ে তার প্রকাশ্য ও সুবিস্তৃত দিক অর্থাৎ অস্তিত্বগত দিকটি আরও বেশি উদ্বেগজনক। এটি বলে, সমগ্র বিশ্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য উপযুক্ত বস্তু। কোনো কিছুই তার আয়ত্তের বাইরে নয়। বিজ্ঞানবাদী এই কথাগুলো নিবন্ধের ভাষায় বলে অথবা বলতে বাধ্য, কেননা সে পূর্বধারণার ব্যাপারে কথা বলে।

বিজ্ঞানবাদীকে চেনার মাধ্যম হচ্ছে নিচের ছয়টি বৈশিষ্ট্য। যা লিখেছেন বিজ্ঞানের প্রখ্যাত দার্শনিক সুজান হ্যাক।[৫৭] তিনি 'বিজ্ঞানবাদের ছয়টি নিদর্শন' নামক একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে তিনি বিজ্ঞানবাদীদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।

১. বিজ্ঞান, বিজ্ঞানসম্মত, বিজ্ঞানী ইত্যাদি শব্দগুলো সম্মানসূচক অভিব্যক্তিতে জ্ঞানীয় প্রশংসা হিসেবে ব্যবহার করা।

২. বৈজ্ঞানিক প্রথা ও প্রায়োগিক পরিভাষাগুলো অনুপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করা। (যেমন জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিবর্তনীয় ব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ।)

৩. বিভিন্ন পাবলিক ক্যাম্পেইনে প্রকৃত বিজ্ঞান ও ছদ্মবিজ্ঞানের মাঝে সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা আছে বলে জোর দেওয়া।

---

৫৭. Susan Haack (1945-) : প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ দার্শনিক। জ্ঞানতত্ত্ব, ভাষার দর্শন ও বিজ্ঞানের দর্শনে তার বিশেষ অভিনিবেশ রয়েছে।

৪. বিজ্ঞানের সাফল্য বর্ণনা করার মাধ্যমে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে' নির্ণয় করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা।

৫. বিজ্ঞানের সীমা বহির্ভূত বিষয়েও বিজ্ঞান অন্বেষণ করা।

৬. সত্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পন্থা ছাড়া অন্য সকল পন্থাকে অস্বীকার করা। অথবা তার থেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। অথবা প্রকৃতিবিজ্ঞানের গবেষণা ব্যতীত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকে অবমূল্যায়ন করা।[৫৮]

দার্শনিক উইলফ্রিড সেলার্সের[৫৯] ভাষায়, বিষয়টি সংক্ষেপে বললে বিজ্ঞানবাদী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে বলে, 'বিজ্ঞান হচ্ছে সকল কিছুর মাপকাঠি।'[৬০] অথবা বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাষায়, 'বিজ্ঞান যে রহস্য উদঘাটন করতে পারে না, মানবজাতি তা কখনোই জানতে পারবে না।'[৬১]

বিজ্ঞানবাদের সাথে সংশ্লিষ্টতার সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও জনপ্রিয় বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রেই অবচেতন মনে একজন ভাবাদর্শগত ব্যক্তির ন্যায়, যে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিগত পন্থার অন্তর্ভুক্ত; যা প্রায়শই অন্যান্য পদ্ধতি ও মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত হয়। কেননা সে বিজ্ঞানবাদকে শুধুমাত্র কিছু সুশোভিত কথামালা হিসেবে বিবেচনা করে।

বিজ্ঞানবাদ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বিজ্ঞান ও তার পদ্ধতিগুলো পবিত্রকরণের অতিরঞ্জন হিসেবে বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। এই বইয়ের আলোচনা মূলত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া বিজ্ঞানবাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে। এটিই মূলত ধর্ম ও অদৃশ্যের জগৎকে অস্বীকার করে।

---

৫৮. Susan Haack, 'Six Signs of Scientism; Logos and Episteme 3 (1):75-95 (2012)

৫৯. Wilfrid Sellars (1912-1989) একজন মার্কিন দার্শনিক। সমালোচনামূলক বাস্তববাদ ও যৌক্তিক দৃষ্টবাদের লেখালেখিতে তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

৬০. Wilfrid sellars, Science, Perception, and Reality (CA: Ridgeview, 1991), p.173

৬১. Bertrand Russel, Science and Religion (Oxford: Oxford University Press), p.235

বিজ্ঞানবাদের ইতিহাস

বিজ্ঞানবাদ সাম্প্রতিক সময়ের আবিষ্কার নয়, বরং তার ইতিহাস সুপ্রাচীন। এই পরিভাষাটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিন্দার অর্থে ব্যবহৃত হতো। সর্বপ্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহারকারীদের মাঝে অন্যতম হচ্ছে নাস্তিক বিজ্ঞান দার্শনিক, জীববিজ্ঞানী ফেলিক্স লে দেনতেক।[৬২] তিনি অবশ্য জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির আলোচনায় সেই সময়ের সমাজ প্রচলনের বিপরীতে এই পরিভাষা একটি ইতিবাচক অর্থে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ১৯১১ সালে Grande Revue ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলেছিলেন, 'আমি বিজ্ঞানের ভবিষ্যতে আস্থা রাখি। অর্থাৎ আমি বিশ্বাস রাখি, বিজ্ঞান, শুধুমাত্র বিজ্ঞানই অর্থপূর্ণ সকল প্রশ্নের সমাধান দিতে পারবে। তবে আমি এটাও নিশ্চিত যে, কিছু ব্যক্তি অর্থহীন প্রশ্ন উত্থাপন করবে। বিজ্ঞান এই প্রশ্নগুলো খণ্ডন না করে তার অসারতা প্রকাশ করে দেবে। এটাই প্রমাণ করে যে এর কোনো উত্তর নেই।'[৬৩]

বিজ্ঞানবাদের প্রধান ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এই মতবাদ সপ্তদশ শতকে প্রকাশিত দেকার্ত[৬৪] ও ফ্রান্সিস বেকনের[৬৫] চিন্তাধারা থেকেই আগত। যেখানে দেকার্ত মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকে অধিক মূল্যায়ন করার পাশাপাশি ধর্মীয় নীতিবোধকে অবমূল্যায়ন করেছেন। অপরদিকে বেকন অভিজ্ঞতাবাদকে অধিক মূল্যায়ন করেছেন। গ্রীস থেকে পশ্চিমা খ্রিষ্টানরা উত্তরাধিকার সূত্রে যে চিন্তাচেতনার পদ্ধতি লাভ করেছে, তার বিপরীতে তিনি এটিকে (অভিজ্ঞতাবাদ) জ্ঞান আহরণের সর্বোচ্চ পন্থা এবং বিশ্ব ও তার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার পথ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এভাবেই দেকার্ত ও বেকন বিশ্বকে উপলব্ধি করার নিমগ্নতার আহ্বানে অংশ নিয়েছিলেন, যেন দুনিয়াতে মানুষই বিশ্বজগতের

---

৬২. Félix Le Dantec (১৯৬৯-১৯১৭): ফরাসি দার্শনিক ও জীববিজ্ঞানী। দৃষ্টবাদ মতাদর্শের অনুসারী।

৬৩. Félix le Dantec, Pragmatisme, La Grande revue, 1911, p.754

৬৪. Rene Descartes (১৫৯৬-১৬৫০) : ফরাসি দার্শনিক ও গণিতবিদ। আধুনিক দর্শন ও যৌক্তিক দর্শন মতবাদের পথপ্রদর্শক। তার অন্যতম গ্রন্থ : Discours de la Méthoden

৬৫. Francis Bacon (১৫৬১-১৬২৬) : বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ইংরেজ রাজনীতিক। De dignitate et augmentis scientiarum এই বইতে তিনি তার অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানীয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পরিচালক হয়ে উঠতে পারে। দেকার্তীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে মহাবিশ্ব একটি বিশাল যন্ত্র, যাতে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যতীত খুব অল্পকিছু চিন্তাধারার পথ খোলা থাকে।

বুদ্ধিবৃত্তিক অনেক গবেষণার ক্ষেত্রে, যেমন এই ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, দেকার্তের অভিজ্ঞতাবাদ ও বেকনের যুক্তিবাদ এই দুটি পদ্ধতির অবদানে মূলত প্রকৃতিবাদ (Naturalism)[৬৬] পদ্ধতির উত্থান ঘটে। এ ক্ষেত্রে গবেষক সামগ্রিকভাবে নাস্তিকতার নীতিগুলো পূরণ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয়ে শুধুমাত্র বস্তুগত কারণগুলো অনুসন্ধান করতে বাধ্য। পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকজন খ্রিষ্টান ধর্মবেত্তা গির্জার বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা থেকে রক্ষা করার জন্য এই তত্ত্বটি গ্রহণ করেছিলেন। এখানে ঐশ্বরিক প্রভাবকে সামগ্রিকভাবে বর্জন করা হয়নি। তারা প্রকৃতিকে নিজের মাঝেই আবদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, যা নিজ সত্তাকেই ব্যাখ্যা করবে।

আমার ধারণা, বিজ্ঞানবাদ দিয়ে যদি প্রত্যক্ষ অথবা সিদ্ধান্তমূলক প্রভাব উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে বিজ্ঞানবাদের এই ধারা দেকার্ত ও বেকনের মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত করা অমূলক। কেননা বিজ্ঞানবাদ যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ স্থানে সমাসীন করার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা হচ্ছে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞানের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার। এটিও স্পষ্ট যে, এনলাইটেনমেন্টের যুগটি ছিল বিজ্ঞানবাদের শৈশব, যখন ধর্মবিরোধী বিধাতার মতবাদ বিকাশ লাভ করে। এটি বিশ্বাস করে যে, বিধাতা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে এটিকে তার যান্ত্রিক নিয়মনীতিতে স্থাপন করে দিয়েছেন। মানব কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এবং মহাবিশ্বের জ্ঞানীয় অবগতির জন্য মহাজাগতিক রীতিনীতির অধীনে মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক কার্যক্রম অনুধাবন করাই যথেষ্ট।

এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিকগণ প্রথাগত চিন্তাবিদদের সাথে যেসব ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছিল সেসব ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দী যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিজয়ের শতাব্দী ছিল না; বরং তা ছিল যুগের প্রধান সংস্কৃতিকে একক, সর্বজনীন যুক্তিবাদ চর্চা প্রচেষ্টার যুগ। এটি ধর্মীয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়ের স্থান সংকুচিত করে যুক্তিকেই

---

৬৬. Naturalism : এই দৃষ্টিভঙ্গির অভিমত হচ্ছে প্রকৃতিই সকল কিছুর আধার। সুতরাং প্রকৃতির বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। বাস্তবতার প্রতিটি ক্ষেত্রের গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই ব্যবহার করতে হবে।

সবকিছু ব্যাখ্যা করার ও পরিবর্তন করার কর্তৃত্ব প্রদান করে। এভাবে রাজনীতি, কবিতা ও সমাজেও যুক্তিই শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এনলাইটেনমেন্টের যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তিনটি বাক্যে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় :

১. মানবীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য চার্চের পরিবর্তে যুক্তির সক্ষমতার ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি।

২. সমস্ত ইতিহাসকে ঐতিহাসিক পর্যালোচনার আওতাধীন করার উদ্যোগ। এবং তার ভিত্তিতে সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থাকে একটি নতুন পদ্ধতিতে গঠন করা।

৩. ধর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মানব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা।[৬৭]

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানবাদী ধারণা প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কিছু-সংখ্যক চিন্তাবিদ সত্য অনুসন্ধানের, বিশেষত মানব-ইতিহাস ও তার সংস্কার অধ্যয়ন করার জন্য, মহাবিশ্ব উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তখনই ফ্রান্সে সাঁ সিমোঁর[৬৮] আবির্ভাব ঘটে। তিনি এই বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি অধিবিদ্যাগত বিমূর্ততা ও প্রমাণগুলোর বিকল্প হয়ে উঠবে। তাই তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজ-ব্যবস্থাকে অধ্যয়ন করেন। ঠিক যেমন মানব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ধর্মতত্ত্ববিদদের বিকল্প হয়ে আসবে।

অগাস্ট কোঁৎ[৬৯] ছিলেন সাঁ সিমোঁর একজন শিষ্য। গুরুর পরে সেই ছিল বিজ্ঞানবাদের সবচেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। সংক্ষেপে তিনি বিজ্ঞানীর দায়িত্বকে দুইটি

---

৬৭. মানহাজুল বাহসিল ইজতিমাইয়্যি বাইনাল ওয়াদইয়্যাহ ওয়াল মিয়ারিয়্যাহ, মুহাম্মাদ আমজায়ান (ভার্জিনিয়া : ইসলামি গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, ১৪১২ হিজরি, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৪০

৬৮. Henri de Saint-Simon (১৭৬০-১৮২৫)। সাঁ সিমোঁ বা সেইন্ট সাইমন। ফরাসি দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ। তাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে একটি মতবাদ গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এটি সাঁ সিমোঁবাদ (Saint-Simonism) নামে পরিচিত, যা মূলত একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন।

৬৯. Auguste Comte (১৭৯৮-১৮৫৭) : সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ফরাসি রাজনৈতিক কর্মী। দৃষ্টবাদ মতাদর্শের প্রবর্তক। তিনি 'মানবতার ধর্ম' উদ্ভাবন করেন, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ। এই ধর্ম খোদাকে বিশ্বাস করত না।

বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা, যার মাঝে মানবীয় আচরণও অন্তর্ভুক্ত, তা নিছক প্রাকৃতিক নিয়মনীতির প্রভাব হিসেবে উল্লেখ করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মকে যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপ করে সেগুলো পদার্থবিজ্ঞানের আইনের অধীনে একত্রিত করা।[৭০] যেন মানব-বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার পর পরিবর্তনীয় সমষ্টিতে একীভূত হয়।

কোঁৎ বলেছেন, 'নতুন শ্রেণির সুপ্রশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের একটি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যারা একই সময়ে প্রাকৃতিক দর্শনের কোনো শাখায় বিশেষ গবেষণায় নিমগ্ন হবেন না। এর কাজ হবে বিভিন্ন ইতিবাচক বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রকৃত অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতা প্রকাশ করা এবং বিজ্ঞানের সমস্ত মূলনীতিগুলো সংক্ষিপ্ত করা। বিজ্ঞানের অল্পকিছু যৌথ সাধারণ মূলনীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টবাদী পদ্ধতিতে মৌলিক নীতিমালায় সবসময় সীমাবদ্ধ থেকে যদি এটি সম্ভব হয়, তাহলে উত্তম হবে।'[৭১]

কোঁৎ বিশ্বাস করতেন, অবশ্যই মানবীয় উপলব্ধির ক্রমাগত অগ্রগতি মহাজগৎ বিশ্লেষণকারী মানবীয় বোধের উদ্যোগ থেকে ধর্মকে পরিহার করতে সক্ষম। দর্শন ও মানবিক জ্ঞান প্রকৃতিবাদী নীতিতে ধর্মের স্থান দখল করবে, যা প্রাকৃতিক মূলনীতিতে উজ্জীবিত। মানবীয় সকল জ্ঞান অবশেষে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। এই পরিধি-বহির্ভূত সকল চিন্তাচেতনাকে কল্পনা ও কুসংস্কার[৭২] হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।[৭৩]

বিজ্ঞানের এই ব্যাপক কর্তৃত্ব লাভের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান সমগ্র ইতিহাসের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলত প্রাচীন পদ্ধতিতে ইতিহাস অধ্যয়ন

---

৭০. এর কারণ হচ্ছে নাস্তিকদের মধ্যে একদল পদার্থবিদ্যাকে মৌলিক মনে করে। তাদের বিশ্বাস পদার্থবিদ্যা থেকে বাকি রসায়ন, বায়োলোজি ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব। এই দলকে বলা হয় 'Materialists'।

৭১. মুহাম্মাদ আবিদ আল জাবেরি তা উল্লেখ করেছেন, বিজ্ঞান দর্শনের ভূমিকা (বৈরুত, মারকাযু দিরাসাতি ওয়াহদাতিল আরাবিয়্যাহ, ১৪১৮ হিজরি/১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ২৬

৭২. বিজ্ঞানবাদীদের ভাষায়, বিজ্ঞানের আওতার বাইরে কোনো কিছুর ওপর বিশ্বাসই হচ্ছে অন্ধবিশ্বাস এবং তার ওপর অটল রেখে আচরণ ও কর্মবিধি হচ্ছে কুসংস্কার।

৭৩. Thomas Burnett, 'What is Scientism?' AAAS https://www.aaas.org/programs/dialogue-science-ethics-and-religion/what-scientism

করার বদলে নিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস অধ্যয়নের পট পরিবর্তন হয়েছে। যার কারণে আজ ইতিহাস সৃষ্টিকারীদের নাম ব্যতীত শুধু ইতিহাস রয়ে গিয়েছে। যেহেতু ইতিহাস সাহসী বীর ও প্রভাবশালীদের কল্পনার বিপরীতে কঠোর বৈজ্ঞানিক নীতি অনুযায়ী চলে।

কোঁৎ প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি বস্তুই বিজ্ঞানবাদী অধ্যয়নের উপযোগী। ইতিহাসও তার অন্তর্ভুক্ত। যার অনেক অনুঘটক প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। এক বন্ধুর কাছে তিনি চিঠির মাধ্যমে এই প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানুষের সামনে তিনি প্রকাশ করবেন, এমন কিছু নীতি রয়েছে যা মানব-সভ্যতার বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এবং তা একটি পাথর পতনের নিশ্চয়তার মতোই প্রামাণিক।[৭৪]

কোঁৎ তার এই তত্ত্বকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন যে, ইতিহাস তিনটি পর্বে নিয়ন্ত্রিত। কারণ মানবীয় চিন্তাধারা দৃষ্টবাদের পথ অনুসরণ করে তিনটি ধাপ অতিক্রম করেছে :

১. ধর্মতাত্ত্বিক পর্ব (থিওলজিক্যাল স্টেইজ) : যেখানে মানুষ মহাবিশ্বের সকল কার্যক্রমকে অতিপ্রাকৃত কিছু ও পরবর্তী সময়ে একাধিক ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা এক খোদার সাথে সম্পৃক্ত করা পর্যন্ত এই পর্ব অব্যাহত ছিল।

২. অধিবিদ্যাগত[৭৫] পর্ব (মেটাফিজিক্যাল স্টেজ) : যেখানে মানুষ মহাবিশ্ব ও মানুষের বাস্তবতা অধিবিদ্যামূলকভাবে ও কার্যকারণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চায়। যেমন রুশোর মতে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। এই যুগটি পশ্চিমারা এনলাইটেনমেন্টের সময় অতিক্রম করেছে।

---

৭৪. Cited in: Ian Hutchinson, Monopolizing Knowledge, p.78

৭৫. সহজভাবে মেটাফিজিক্স বুঝতে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরুন আপনার খেলনার বক্স রয়েছে। সেই বক্সটির অণু-পরমাণু কত, বস্তুটি স্থির আছে কেন এবং কতটুকু আয়তন ও ভেক্টর ফিল্ড খুব সহজে বিজ্ঞানের মাধ্যমে বের করে ফেলতে পারি। তবে মেটাফিজিক্স আপনাকে প্রশ্ন করতে শেখাবে যে, এই বক্সটার অস্তিত্বের পেছনে অর্থ কী? বক্সের সংজ্ঞা কী? বক্সের কোনো ফিজিকাল সিগনিফিক্যান্স আছে কিনা? এটির বিকল্প কী হতে পারে? এটি কি অংশ (part) না-কি পুরো অংশ (whole) ইত্যাদি। অর্থাৎ পদার্থের বহির্ভূত প্রশ্ন করতে শেখায়। দার্শনিক Peter Van-এর মতে, মেটাফিজিক্স হলো 'The study of fundamental reality'.

৩. দৃষ্টবাদ বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পর্ব : যেখানে মহাবিশ্বের সকল বিষয়কে মানুষ তার বস্তুগত নীতিতে চিন্তা করবে। নীতি ও উদ্দেশ্যগত প্রশ্নকে পরিত্যাগ করবে।

অগাস্ট কোঁতের এই মেথডোলজিক্যাল বিপ্লবটি দার্শনিক ও বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ আর্নেস্ট রেনানের[১৬] জন্য একটি অনুঘটক ছিল, যেন সে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নামক তার গ্রন্থে দৃষ্টবাদের যুগে (Positivism) সুসংবাদ দিতে পারে। তিনি বলেন, 'মানবতাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সংগঠিত করাই আধুনিক বিজ্ঞানের শেষ শব্দ। এটাই বিজ্ঞানের মহিমা। তবে এটি একটি নীতিসম্মত আবেদন।'[১৭]

অতঃপর ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম কোঁতের দৃষ্টবাদকে গ্রহণ করেন। এবং 'শুধুমাত্র প্রকৃতি'র ব্যাপারে জোর দান করে দৃষ্টবাদের মূলনীতিগুলো সুদৃঢ় করেন। আর সামাজিক ঘটনাগুলোও বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবিক জগতেরই একটি অংশ। সুতরাং এই ঘটনাগুলোও আবশ্যিকভাবে প্রাকৃতিক নীতির অনুগত। এটাকে বিজ্ঞানের অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও গবেষণার কাজে অনুগত করা হয়।[১৮]

ডুর্খেইম তার এই দাবির ব্যাপারে খুবই সোচ্চার এবং বিশেষত ধর্মতত্ত্বের সাথে এই লড়াইয়ে বেশ একগুঁয়ে ছিলেন। এজন্য তিনি বলেছেন, নিশ্চয় বিজ্ঞান হচ্ছে সেই মৌলিক ধারণা; যা আমাদের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর তা হচ্ছে কারণ, আইন, স্থান, সংখ্যা, দেহের ধারণা, জীবন, বোধ, সমাজ ইত্যাদির ধারণা। বিজ্ঞান সুগঠিত হওয়ার আগে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়েছিল। কারণ সমস্ত পৌরাণিক কাহিনিতে মানুষ ও মহাবিশ্বের মৌলিক পরিকল্পনার ধারণা রয়েছে। বিজ্ঞান ধর্মের উত্তরসূরি হয়েছে মাত্র।[১৯]

---

১৬. Ernest Renan (১৮২৩-১৮৯২) : একজন ফরাসি প্রাচ্যবিদ, ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিদ। তার ডক্টরেট ডিগ্রির থিসিসটি ছিল ইবনে রুশদের দর্শন।

১৭. Renan, L'Avenir de la Science (Paris: Calmann-Levy, 1890), p.37

১৮. মুহাম্মাদ আমযায়ান, দৃষ্টবাদ ও আদর্শের মাঝে সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ৪৩

১৯. C'est la science qui élabore les notions cardinales qui dominent notre pensée: notions de cause, de lois,"d'espace, de nombre, notions des corps, de la vie, de la conscience, de la société, etc.... Avant que les même office, car toute mythologie consiste sciences ne fussent constituées, la religion remplissait en une représentation, déjà très élaborée, de l'homme et de l'univers." Emile Durkheim, Education et Sociologie (Paris: Librairie Felix Alcan, 1922), p.56

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে দৃষ্টবাদের এই মতবাদ এখনো শেষ হয়ে যায়নি, বরং যৌক্তিক দৃষ্টবাদের রূপে ভিয়েনাতে তা পরিপূর্ণতা পেয়েছে আবার। যেটিকে কখনো কখনো নব দৃষ্টবাদ অথবা বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাবাদও বলা হয়। এর মর্ম হলো, কোনো কথা যদি বিশ্লেষণমূলক (analytic) তত্ত্ব না হয়, তবে তা অনর্থক, অর্থহীন। যুক্তি ও গণিতও এর অন্তর্ভুক্ত। অথবা কোনো বৈজ্ঞানিক গঠনমূলক তত্ত্ব যা যাচাইকরণ (verification) নীতির নিকট দায়বদ্ধ।

যৌক্তিক দৃষ্টবাদকে কোঁতের দৃষ্টবাদ থেকে আলাদা করে বলা হয় যে, যা কিছু ইন্দ্রিয় উপলব্ধ জ্ঞানের আয়ত্তে থাকে না সেসব অনর্থক। আর যারা সেই ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত বিশ্বের কথা বলে, তাদের ব্যবহৃত একই ভাষার বিশ্লেষণের নিয়মে সেই জ্ঞান লাভ করা নিষিদ্ধ। কেননা যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই পরিভাষাগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এগুলো অর্থহীন পরিভাষা। এ সময় কোঁতের দৃষ্টবাদ দেখতে পায় যে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের অভাবে আজ মানুষ যা জানতে পারছে না তা আগামীতে জানতে পারবে, যখন সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।[৮০]

লজিক্যাল পজিটিভিজম অস্ট্রিয়ান দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের একটি দলের মাধ্যমে মরিতস শ্লিকের[৮১] নেতৃত্বে ভিয়েনায় বিকাশ লাভ করেছিল। এর লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানকে আরও মজবুত একটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। গবেষকদের এই বৃহৎ দলের উদ্দেশ্য ছিল একটি সমন্বিত পদ্ধতি তৈরি করা, যা প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা) এবং অন্যান্য বিজ্ঞান (নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান) এসব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

যৌক্তিক দৃষ্টবাদ তিনটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত

প্রথম মূলনীতি : ডেভিড হিউম (David Hume)-এর অভিজ্ঞতাবাদ। অতএব অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত কোনো কিছুই এতে বিবেচ্য হবে না। তবে এই দলটি সম্ভাবনার যুক্তি গ্রহণ করে (তত্ত্ব) প্রস্তাবনামূলক সমস্যা এবং সামগ্রিকভাবে সুনিশ্চিত কোনো তত্ত্ব আনয়নের অক্ষমতা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাচ্ছিল। গাণিতিক

৮০. যাকি নুগাইব মাহমুদ, জ্ঞানতত্ত্ব (মুয়াসসাসাতুল হিন্দাভি, ২০১৮), পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪

৮১. Moritz Schlick (১৮৮২-১৯৩৬) : জার্মান দার্শনিক ও পদার্থবিদ। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতি দর্শন বিভাগের প্রধান ছিলেন।

সম্ভাবনা যদি সূত্র থেকে উঁচু স্তরের হয়, তাহলে তা বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে বিবেচ্য হবে। আর সম্ভাবনাটি নিচু হলে বিজ্ঞানগতভাবে তা গৃহীত হবে না।

দ্বিতীয় মূলনীতি : মানব-সভ্যতা বিকাশে অগাস্ট কোঁতের তিন পর্ব নীতি, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এবং তার এই বক্তব্য যে, 'একটি একক বৈজ্ঞানিক রীতি উদ্ভাবন করা উচিত যা বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় সামঞ্জস্য বিধান করবে।'

তৃতীয় মূলনীতি : অস্ট্রিয়ান দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের[৮২] কীর্তি। তবে ভিটগেনস্টাইন ভিয়েনা চক্রে যুক্ত হননি। এই কমিটি নিজেদের সভাগুলোর সময় নিয়মিতভাবে তার গবেষণা নিয়ে আলোচনা করত। আর তিনি মরিতস শ্লিকের মতো সেই কমিটির অনেক ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

ভিটগেনস্টাইন ভাষার যৌক্তিক কাঠামোতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, ভাষা কার্যকরী হওয়ার জন্য বর্ণনা ও বর্ণিত বিষয়ের মাঝে একপ্রকার যৌক্তিক সংযোগ থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ভিটগেনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে, বাস্তবতার কাঠামোই ভাষার গঠন নির্ধারণ করে। আর এটি সত্য হওয়ার জন্য একজনকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে, ব্যক্তি যে বাস্তবতার কথা বলছেন তা হচ্ছে পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। অন্য কথায় যা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি না, সে বিষয়ে আমরা কথা বলতে পারি না। যা কিছু ইন্দ্রিয় ও পরিমাপের আওতায় আসবে না তা অবাস্তব।

ভাষার যৌক্তিক কাঠামোর ওপর ভিটগেনস্টাইনের এই কাজের ওপর ভিত্তি করে ভিয়েনা চক্রের সদস্যগণ বিজ্ঞানের একটি সাধারণ ভাষা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছিলেন, যা বৈজ্ঞানিক সত্য ও ধর্মীয় এবং অদৃশ্য বিষয়গুলোর মাঝে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা প্রদান করবে। এই নতুন ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো 'যাচাই নীতি'; যা বলে, প্রতিটি যুক্তি বাস্তবতার সাথে একমত হওয়ার দাবি করে এবং এর সত্যতা নিশ্চিত করে এমন তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এখন কেউ যদি এমন কথা বলে, যা সে যাচাই করতে পারে না এবং পরীক্ষামূলকভাবে পরিমাপ করতে পারে না, তাহলে তার কথাগুলো ভিত্তিহীন। তা ভুল বলেও গণ্য নয়। বাস্তবে এটি একটি অনর্থক কথা।

---

৮২. Ludwig Wittgenstein (১৮৮৯-১৯৫১) : একজন প্রসিদ্ধ অস্ট্রিয়ান দার্শনিক। যুক্তি ও ভাষার দর্শনে তার বিশেষ পাণ্ডিত্য রয়েছে।

১৯২৯ সালে ভিয়েনা চক্রের[৮৩] সদস্যরা বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাথে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের পরিচিত করার জন্য প্রাগ (Prague) শহরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের ফলস্বরূপ ভিয়েনা চক্রের সদস্যদের সাথে জার্মানি, ভিয়েনা ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় কর্মরত অন্যান্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বিশেষভাবে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের ম্যাগাজিন প্রকাশের পর ভিয়েনা চক্রের প্রভাব আরও বিস্তার লাভ করে। দার্শনিক এ জে আইয়ার[৮৪] এর লেখার প্রভাবে তা একাডেমিক সার্কেলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষভাবে 'সত্য ও যুক্তি' লেখাটি।

পরবর্তী সময়ে যৌক্তিক দৃষ্টবাদ বর্ণনার মাঝে দার্শনিক সমস্যাগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্রুত সম্প্রসারিত হবার পরে থিসিসটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়ে যায়। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে যখন এ জে আইয়ারকে যৌক্তিক দৃষ্টবাদের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক সেইসব সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি উত্তরে বলেন, সম্ভবত সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে সবকিছুই ভুল ছিল।[৮৫]

বিংশ শতাব্দীর শেষ ও একবিংশ শতাব্দী শুরু পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক দৃশ্যপটে বিজ্ঞানবাদ বিশেষত 'নব্য নাস্তিক্যবাদ' নামে পরিচিত নিদর্শনগুলোর সাহিত্যে শক্তিশালী রূপে ফিরে আসেনি। বিজ্ঞানের প্রতি তাদের মতাদর্শিক আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের অবস্থা বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে। তাদের বক্তব্যে বেশ স্পষ্টভাবেই বস্তুগত অভিজ্ঞতাই সবকিছুর মানদণ্ড এবং জ্ঞানের ওপর বিজ্ঞানের

---

৮৩. ভিয়েনা চক্র (Vienna Circle) ছিল একটি প্রভাবশালী দার্শনিক গোষ্ঠী, যা ১৯২০-এর দশকে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ চক্রটি মূলত যৌক্তিক দৃষ্টবাদ (Logical Positivism) বা যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ (Logical Empiricism) নামে পরিচিত দর্শনের প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠী ছিল। ভিয়েনা চক্রের সদস্যরা বিশ্বাস করত যে, বিজ্ঞানী চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞানের সত্যতা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে পারে। তারা আরও বিশ্বাস করত যে, ধ্রুবক বা অমীমাংসিত ধারণাগুলো (যেমন ধর্ম বা মেটাফিজিক্স) বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা করা উচিত নয়।

৮৪. Alfred Jules Ayer (১৯১০-১৯৮৯) : ব্রিটিশ দার্শনিক ও ভাষা বিজ্ঞানী। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

৮৫. See Nigel Brush, The Limitations of Scientific Truth: Why Science Can't Answer Life's Ultimate Questions (Grand Rapids, Mi: Kregel Publications, 2005). Pp.61-72

একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা বলা হয়েছে। তাতে আরও যা রয়েছে তা সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতার মাধ্যমে অথবা জ্ঞানের পূর্বশর্তগুলোর অপরিহার্য অনুষঙ্গ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তা বাতিল করে দেয়।

টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়া, বিশেষত জনপ্রিয় বিজ্ঞান (Popular Science)-এর অনুষ্ঠানগুলো বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আবিষ্কারসমূহ মহিমান্বিত করা এবং সংজ্ঞার (intuition) বিপরীত বৈজ্ঞানিক দাবির প্রচার করার মাঝে বিজ্ঞানবাদের প্রসার ঘটিয়েছে এবং তা এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, এটাই একমাত্র চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য। বিশেষ করে জনপ্রিয় সাহিত্য, কোয়ান্টাম ফিজিক্স, কসমিক ফিজিক্স, মাল্টিভার্স, স্ট্রিং থিওরিতে দশটি কিংবা তারও অধিক ডাইমেনশনের আলোচনায়, বিশ্বকে যা অতি বিস্ময়কর হিসেবে উপস্থাপন করে।

জ্ঞানতত্ত্বের অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদকে অগ্রগামী হিসেবে পরিগণিত করতে ডারউইনের মতবাদকে স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। যেহেতু আত্মা, মন, সমাজ, শেষ গন্তব্য ও পরিণতির সর্বজনীন রচনাগুলোর আলোচনায় প্রথম অস্তিত্বের সূত্রপাতে ডারউইনবাদের উপস্থিতি ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়।

বিজ্ঞানবাদ বিশেষত যুবক শ্রেণির মাঝে জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতে এখনো তার ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তবে তা প্রত্যক্ষ কোনো মতাদর্শের রূপে নয়; বরং আত্মা, সমাজ, ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন ও সকল ক্ষেত্রে তার বক্তব্যগুলোকে সমর্থন প্রদানের জন্য বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কারের আড়ালে থাকতে বিশ্বাসী।

বিজ্ঞানবাদের এই চিন্তাধারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসি পজিটিভিজমের প্রভাবে ধর্মের ওপর সন্দেহের সৃষ্টির সময়কালে আরব বিশ্বে অনুপ্রবেশ করে। ১৮৮৩ সালের মার্চে আর্নেস্ট রেনানের 'ইসলাম ও বিজ্ঞান' সম্পর্কে বক্তৃতাটি ছিল এই প্রভাবের প্রথম স্ফুলিঙ্গ। সেখানে তিনি দাবি করেছিলেন, একটি উন্নত সভ্যতা তৈরি করার সক্ষমতা ইসলামে নেই। কেননা তা অপরিহার্যভাবে বিজ্ঞানের বিপক্ষে। তার সেই বক্তৃতা ইসলামি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জামাল উদ্দিন আফগানি, তুর্কি লেখক নামিক কামাল ও সেন্ট পিটার্সবার্গের মুফতি আতাউল্লাহ বায়েজিদফ তার বক্তব্য খণ্ডন করেন। রেনানের জবাবে আরও অনেক লেখা প্রকাশিত হয়।

পরবর্তী সময়ে আরব পজিটিভিস্ট ও বস্তুবাদী চিন্তাধারায় তাদের ঘনিষ্ঠ যারা ছিল তারা রেনানের উপস্থাপনার চেয়ে আরও বিস্তৃত পরিধির আওতায় বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সংঘাতকে নতুনভাবে উসকে দেয়। তখন মিশরীয় দার্শনিক জাকি নুগাইব মাহমুদ[৮৬] তার বিতর্কিত বই 'অধিবিদ্যার কল্পকথা' লেখেন। পরবর্তীকালে যার নাম পরিবর্তন করা হয় 'অধিবিদ্যার অবস্থান' নামে। তিনি তার বইয়ের ভূমিকায় যৌক্তিক দৃষ্টবাদের আদর্শ সম্পর্কে বলেছেন, (বিশ্বকে যথার্থভাবে বর্ণনা করার দাবির ক্ষেত্রে অধিবিদ্যার (এর মাঝে ধর্মও অন্তর্ভুক্ত) সাথে এর বৈপরীত্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন) 'যৌক্তিক দৃষ্টবাদ সবচেয়ে নিকটতম বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ, যা বিজ্ঞানমনস্কতার প্রকৃত অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। বিজ্ঞানীরা এভাবেই তা অনুধাবন করেছেন, যারা ল্যাবে আমাদের জন্য সভ্যতার মূলনীতি তৈরি করেন। আমি তার দাবির সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে এটিকে গ্রহণ করেছি। তার দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যান্য গবেষণা দেখা শুরু করেছি, তখন মতবাদের মূলতত্ত্বগুলো আমাকে যা পরিত্যাগ করার নির্দেশনা দেয় তা আমার নিজের জন্য মুছে ফেললাম সেই বিড়ালের মতো, যে নিজ সন্তানদের খেয়ে ফেলে। অধিবিদ্যাকেই আমি আমার প্রথম শিকার বানিয়ে নিলাম। যৌক্তিক দৃষ্টবাদের দৃষ্টিতে দেখা বস্তুগুলোর মাঝে এটাকেই সবার আগে দেখলাম। কারণ আমি দেখতে পেলাম এটি এমন অনর্থক কথা, যা মিথ্যা হিসেবেও উত্থাপিত হয় না।'[৮৭]

জাকি নুগাইব মাহমুদের বিজ্ঞানবাদ জর্জ তারাবিশি[৮৮] এর মতো কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকটেও অতীব নিন্দনীয় ছিল। যিনি তার 'সমকালীন আরব সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যের অপমৃত্যু' বইয়ে কঠোরভাবে তার থিসিসের সমালোচনা করেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, জাকি নুগাইব মাহমুদ তার 'আরব চেতনার সংস্কার' বইতে একটি আবেগপূর্ণ দরবেশি অনুশীলন করছেন। এই বইয়ে তিনি তার কঠোর পাশ্চাত্যবাদ নীতি থেকে ও নির্দ্বিধায় ঐতিহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার

---

৮৬. জাকি নুগাইব মাহমুদ (১৯০৫-১৯৯৩) : মিশরীয় লেখক। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

৮৭. জাকি নুগাইব মাহমুদ, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ (কায়রো, মাকতাবাতুল আনহিল্লু, ১৯৫১), ভূমিকা।

৮৮. জর্জ তারাবিশি (১৯৩৯-২০১৬) : সিরিয়ান লেখক ও অনুবাদক। তিনি সিরিয়া, লেবানন ও ফ্রান্সে বসবাস করেন এবং ফ্রান্সেই মৃত্যুবরণ করেন। তার চেতনাগত অনেক পরিবর্তনের কথা জানা যায়। গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ : نقد العقل العربي

এ গ্রন্থে এটাও উল্লেখ করেছেন, যেন শুধু প্রযুক্তিগত ও উপকারী বিষয়ের মাঝে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করা হয়। 'নিশ্চয় সভ্যতার উপাদান সৃজিত হয়েছে তা দ্বারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে' এ কথা বলার পর তিনি বলেছেন, 'ঐতিহ্যের জন্য যেন কোনো স্থান রাখা না হয় (যেমন তিনি ঐতিহ্য হিসেবে বলেছেন, সাহিত্য, শিল্প ও সকল প্রথাগত জ্ঞান)। তবে যদি তা অবসর সময়ের চিত্ত বিনোদনের উপাদান হয়, তাহলে থাকতে পারে।'[৮৯]

পরবর্তী সময়ে সাদেক জালাল আল আজম[৯০] তার সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'ক্রিটিক অন রিলিজিয়াস থট' বইতে অবৈজ্ঞানিকভাবে কথার দ্বারা ধর্মের সমালোচনা করেন। বইটি আরব দেশগুলোতে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার সবচেয়ে সাহসী নাস্তিক্য লেখাগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত ছিল। তিনি বলেন, আমরা যখন ফ্রিডরিখ নিটশে (Friedrich Nietzsche)-এর মতো বলি যে, আল্লাহ মারা গিয়েছেন অথবা মারা যাবেন, তখন আমাদের অর্থ এই নয় যে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো মানুষের অন্তর থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বরং আমরা বলতে চাচ্ছি, মহাবিশ্বের প্রকৃতি, সমাজ ও মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষ যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছেছে, তা ঈশ্বরের স্মরণ বিবর্জিত।'[৯১]

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের প্রভাব আরব স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে দেখা যায়, যখন প্রধান সামাজিক বা নৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাধারণত একজন ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও একজন মনোবিজ্ঞানী কিংবা সমাজবিজ্ঞানী উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মাজহাব দ্বারা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলোর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি জানার ব্যাপারে ধর্মীয় ব্যক্তির আলোচনা থাকে। আলোচনা শেষ হয় মনোবিজ্ঞানী অথবা সমাজবিজ্ঞানীর নিরপেক্ষ ও সৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বস্তুর বাস্তবতা উপলব্ধি করার আলোচনা দিয়ে। উপস্থাপনা ও আলোচনার এই একই ধরনের পুনরাবৃত্তিতে দর্শকের মনে হয়, বিষয়টি একটি প্রমাণ যে ধর্ম

---

৮৯. জাকি নুগাইব মাহমুদ, আরব চেতনার সংস্কার (কায়রো, দারুশ শুরুক, ১৯৯৩), পৃষ্ঠা ২৪১

৯০. সাদেক জালাল আল আজম (১৯৩৪-২০১৬) : সিরিয়ান লেখক। সিরিয়া ও জর্ডানে দর্শনের শিক্ষক ছিলেন। আদদিরাসাতুল আরাবিয়্যাতুল বৈরুতিয়্যাহ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে জার্মানিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৯১. সাদেক জালাল আল আজম, ক্রিটিক অন রিলিজিয়াস থট (বৈরুত, দারুত তলিয়াহ, ১৯৭০), পৃষ্ঠা ২৮

হচ্ছে একটি বিশেষ মাজহাবগত পছন্দ। স্বাভাবিকভাবেই এখানে মতানৈক্য হয়। প্রায়ই এখানে আলোচনাকারী সত্যের সাথে মেলে না। অপরদিকে বিজ্ঞানের কথা এক। বিজ্ঞানের কথা অবশ্যই বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আর এটাকেই তারা নাম দিয়েছে ব্যবহারিক প্রকৃতিবাদ (practical naturalism)। সকল কিছুর ক্ষেত্রে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের কথাই চূড়ান্ত। যদিও তার কথা গ্রহণকারী আবশ্যিকভাবে প্রকৃতিবাদী না হয়।

গত কয়েক দশক ধরেই আরব বিশ্বে বিশ্বাস-বিজ্ঞানের দ্বৈত্ববাদের বিতর্কের উত্তেজনা চলে আসছে। যদিও এই শিরোনামটি পরবর্তী সময়ে মার্ক্সবাদী ও আধুনিকতাবাদী স্রোতের উত্থানের সাথে প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল, জ্ঞানতত্ত্ব-মূর্খতার মতো নতুন দ্বৈত্বে পরিণত হয়েছে। অধিবিদ্যার পৌরাণিক কাহিনির বিপরীতে বিজ্ঞানের পক্ষে মার্ক্সবাদী পঠন, যা ইতিহাস পড়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ দাবি করে, তা একটি অনুঘটক ছিল। যদিও মার্ক্সবাদ প্রান্তিক, ব্যাপক অর্থে বৈজ্ঞানিক ছিল না।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞান ও বিশ্ব

ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বের চিরায়ত ধারায় 'জ্ঞান' শব্দটি একাধিক অর্থবোধক একটি পরিভাষা। তা বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য অভিধানে ব্যবহৃত 'বিজ্ঞান' তথা Science এর প্রতিশব্দ নয়। কেননা তা অভিজ্ঞতামূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং বিজ্ঞান ব্যাপকতা ও স্তরের দিক দিয়ে উপলব্ধির সাথে সম্পর্কিত। 'কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলুম'-এর গ্রন্থকারের মতে আলেমদের পরিভাষায় 'ইলম' শব্দটি সাধারণত কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে :

- সাধারণ উপলব্ধি। হোক তা ধারণা অথবা বিশ্বাস, নিশ্চিত বা অনিশ্চিত।
- সাধারণভাবে সত্য জ্ঞান করা। সুনিশ্চিত হোক অথবা না হোক।
- বিশ্বাস ও সাধারণ উপলব্ধি।
- কাণ্ডজ্ঞান বা সাধারণ বোধ।
- কল্পনা, সাধারণ বোধ ও খেয়াল।
- অনুধাবনগতভাবে অথবা বিধানগতভাবে পূর্ণাঙ্গ অবগতি।
- ধারণাগত অথবা বিশ্বাসগতভাবে জটিল বস্তুর উপলব্ধি।

- প্রমাণসাপেক্ষে কোনো বিষয় জানা।
- সমস্যা উপলব্ধি করার জন্য লব্ধ যোগ্যতা।[১২]

আরব সাংস্কৃতিক অভিধান অনুযায়ী জ্ঞান হচ্ছে উপলব্ধি করতে পারা, কোনো বিষয়ে দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হওয়া এবং যেকোনো বিষয়ের ভিত্তিমূল ও ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের জ্ঞান। এসবের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থা ও ফলাফল আয়ত্ত করা যায়।

কুরআন মাজিদেও জ্ঞান শব্দটি একাধিক অর্থবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হচ্ছে কোনো বিষয়ের বাস্তবতা আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অনুধাবন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

'তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে সবই আল্লাহ জানেন।' [সুরা বাকারা, আয়াত ৭৭]

প্রমাণ অর্থে :

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا

'তুমি (নবি) তাদেরকে বলো, তোমাদের কাছে কি এমন কোনো প্রমাণ আছে, যা আমার সামনে বের করতে পারো?' [সুরা আনআম, আয়াত ১৪৮]

ইলম হচ্ছে সঠিক জ্ঞানের ধারণা। আলাহ তাআলা বলেন,

فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

'তারা তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তারই বড়াই করতে লাগল।'

[সুরা গাফির, আয়াত ৮৩]

নবুওয়াত অর্থে :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

'ইউসুফ যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে হিকমত ও নবুওয়াত দান করলাম।' [সুরা ইউসুফ, আয়াত ২২]

১২. থানভি, কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলুম (বৈরুত, মাকতাবাতু লেবানন নাশিরুন, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ), ১৯/২

ইসলামে জ্ঞান হচ্ছে রব, সৃষ্টি ও উপলব্ধির সাথে সম্পর্কিত প্রারম্ভিক বিবরণের একটি সমষ্টি। ইসলামি ধারণায় অস্তিত্বের প্রধান রূপটি এই সমষ্টিতে চিত্রায়িত হয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে :

* আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সকল কিছুর স্রষ্টা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ

'আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর রক্ষক।'

[সুরা যুমার, আয়াত ৬২]

* আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যা কিছু ইচ্ছা করেন তা করে ফেলেন। কোনো কিছুই তাকে বিরত রাখতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

'আমি যখন কোনো জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করি, তখন আমার পক্ষ থেকে কেবল এতটুকুই কথা হয় যে, আমি তাকে বলি, "হয়ে যাও", অমনি তা হয়ে যায়।' [সুরা নাহল, আয়াত ৪০]

* আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বজগৎ একটি বিশেষ হেকমতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন যথোচিত।' [সুরা আনআম, আয়াত ৭৩]

তিনি আরও বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে, তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' [সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১৬]

* বিশ্বের প্রতিটি বস্তু আল্লাহ তাআলার প্রতি নিয়মতান্ত্রিক অধীনতায় অনুগত :

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

'তবে কি তারা আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কোনো দীনের সন্ধানে আছে? অথচ আসমান ও জমিনে যত মাখলুক আছে, তারা সকলে আল্লাহরই সামনে মাথা নত করে রেখেছে (কতক তো) স্বেচ্ছায় এবং (কতক) বাধ্য হয়ে। এবং তারই দিকে তারা সকলে ফিরে যাবে।' [সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৩]

* সৃষ্টিজগৎই আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের জ্ঞান লাভের জন্য উত্তম পথপ্রদর্শক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَأٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ.

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমনে বহু নিদর্শন আছে বুদ্ধিমানদের জন্য।'

[সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯০]

* বিশ্বজগৎ নিয়ে অধিক চিন্তাভাবনা ও পর্যবেক্ষণ ঈমান বৃদ্ধিতে সহায়ক :

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْأٰفَاقِ وَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ.

'আমি আমার নিদর্শনাবলি তাদেরকে দেখাব বিশ্বজগতেও এবং খোদ তাদের অস্তিত্বের ভেতরেও, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য।' [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত ৫৩]

* সৃষ্টির লক্ষণ এটা প্রকাশ করে যে, এই সমগ্র অস্তিত্ব একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا.

'তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে), হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি।'

[সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১]

* আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি অতি উত্তম। (অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পূরণের সাথে তার উত্তমতা সম্পৃক্ত।) আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِيْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

'তিনি যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটিকে করেছেন সুন্দর।'

[সুরা সাজদাহ, আয়াত ৭]

* আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার দিকে পরিচালিত করেছেন :

رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

'আমাদের রব তো তিনি, যিনি প্রত্যেককে তার উপযুক্ত আকৃতি দিয়েছেন, তারপর তার পথপ্রদর্শনও করেছেন।' [সুরা ত্বহা, আয়াত ৫০]

* দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহ তাআলা মানবজাতির উপকারের জন্য নিয়োজিত করেছেন। তিনি বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

'তিনিই তো সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' [সুরা বাকারা, আয়াত ২৯]

* আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে সমস্ত সৃষ্টিজগতের রিজিক সরবরাহ করেছেন। তিনি বলেন,

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

'বলো, আমার প্রতিপালক নিজ বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিজিকের প্রাচুর্য দান করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) তা সংকীর্ণ করে দেন। তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।' [সুরা সাবা, আয়াত ৩৯]

* আল্লাহ তাআলা মানুষের পর্যবেক্ষণের মাধ্যম বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, যাতে সে অনুধাবন করতে পারে। তিনি বলেন,

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। তারপর তাকে বানিয়েছি শ্রবণকারী ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।'

[সুরা ইনসান, আয়াত ২]

* জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা দ্বারাই আল্লাহ তাআলা জ্ঞানীদেরকে অন্যদের ওপর মর্যাদা দান করেন :

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন।' [সুরা মুজাদালা, আয়াত ১১]

* বিশ্বজগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা ও পর্যবেক্ষণ ওই জ্ঞানের মাধ্যম, যা ভীতি সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ. وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ .

'তুমি কি দেখোনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছি? আর পাহাড়ের মধ্যেও আছে বিচিত্র বর্ণের অংশ—সাদা, লাল ও নিকষ কালো। এবং মানুষ, পশু ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও আছে অনুরূপ বর্ণ-বৈচিত্র। আল্লাহকে তো কেবল তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানের অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীলও বটে।'

[সুরা ফাতির, আয়াত ২৭-২৮]

* আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান অতি নগণ্য, তুচ্ছ:

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।' [সুরা বাকারা, আয়াত ২১৬]

কখনো কখনো মানব জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা ফুটে ওঠে :

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

'তোমাদের যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা সামান্যমাত্র।'

[সুরা ইসরা, আয়াত ৮৫]

* আল্লাহ তাআলা মানুষকে মেধা ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দান করেছেন এবং ওহির মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেছেন,

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।' [সুরা আলাক, আয়াত ৫]

উল্লিখিত আয়াতে প্রতীয়মান হলো যে, ইসলাম স্বয়ং বিজ্ঞানবাদের সাধারণ মূলনীতির ভিত্তিতে ও ইসলাম ও বিজ্ঞানবাদের মধ্যকার চিন্তাগত সংঘর্ষের কারণে বিজ্ঞানের মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি, গবেষণার পদ্ধতি ও জ্ঞানের মানদণ্ডরূপে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। বিজ্ঞানের ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানবাদের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে মতানৈক্যগুলো নিম্নরূপ :

- অনুধাবন, প্রাপ্তি ও শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান হচ্ছে মানবজাতির ওপর আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ, দান।
- জ্ঞান হচ্ছে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের চেয়েও বিস্তৃত। কেননা অর্জিত অথবা সহজাত, সব ধরনের অবগতি জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।
- জ্ঞানের নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে, যা সে অতিক্রম করতে পারে না। এজন্যই মানুষের প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়া উচিত নয় যে, সে সকল কিছুর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ছাড়া পরিপূর্ণ জ্ঞানী আর কেউ নেই।
- জ্ঞানের পরিপূর্ণতার তুলনায় সমগ্র মানবজ্ঞানই আকারে অতি ক্ষুদ্র।
- অভিজ্ঞতা অথবা ইন্দ্রিয়উপলব্ধ ছাড়াও জ্ঞানের ভিন্ন কিছু উৎস রয়েছে। তা হচ্ছে ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। অথবা ঐশী অনুপ্রেরণা ও অনুমানের মাধ্যমে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে। অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ যে তথ্য প্রচার করে।
- জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব তার ফলাফলের ভিত্তিতে হয়।
- জ্ঞান দুনিয়াতে মানবীয় অবস্থার কল্যাণের জন্য উপকারী। জ্ঞানের প্রধানতম লক্ষ্য হলো, আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ গুণাবলির সাথে তাকে চিনতে পারা। অন্তরে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তার মর্যাদা বর্ণনা করা।

- ইসলাম উপলব্ধিগত (অভিজ্ঞতাগত) জ্ঞানকে জানার একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম হিসেবে দেখে না। বরং সত্যে পৌঁছানোর জন্য অন্যান্য উৎসের সাথে এটিও পরস্পরকে সহযোগিতা করার একটি মাধ্যম।
- জ্ঞান নৈতিকতার অধীন। যার প্রত্যাবর্তন ঐশী প্রত্যাদেশ ও সুস্থ স্বভাবজাত উপলব্ধি। জ্ঞান নৈতিকতার দেখানো পথে চলে, তার ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে না।

অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের সম্ভাবনা ও গুরুত্ব স্বীকার করার পর বাকি সবকিছুতেই ইসলাম বিজ্ঞানবাদের বিরোধিতা করে। জ্ঞানের বাস্তবতা, পরিধি ও উৎস, তা থেকে উপকৃত হওয়ার উপায়, সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম বিজ্ঞানবাদের বিরোধিতা করে। এজন্য ইসলাম বিজ্ঞানবাদকে সমূলে উৎপাটন করে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানবাদকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করে। ইসলাম বিশ্বাস করে, একজন বান্দার অন্তরে কখনো কুরআনের প্রতি বিশ্বাস ও বিজ্ঞানবাদী মতবাদের অনুসরণ একত্রিত হতে পারে না।

বিজ্ঞান, সেকুলারিজম ও বিজ্ঞানবাদ

আরব প্রকাশনীগুলোর বহুল প্রচলিত একটি ভুল হচ্ছে, সেকুলারিজমের উত্থানের জন্য বিজ্ঞানের সাথে চার্চের দ্বন্দ্বকে দায়ী করা। অর্থাৎ কয়েক শতাব্দী যাবৎ চার্চই সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব প্রদর্শন করত। অতঃপর চার্চের পাদ্রিদের সাথে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অধিকারী জ্ঞানী ব্যক্তিদের যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিই ইউরোপের চিন্তাশীল ও সংস্কারপন্থি ব্যক্তিবর্গকে এই দাবির দিকে প্ররোচিত করেছিল যে, রাজনৈতিক ও সাধারণ নৈতিকতা উভয় দিক থেকেই চার্চের কর্তৃত্ব হ্রাস করা উচিত।

সেকুলারিজমের ইতিহাস ও তা মতবাদের রূপ লাভ করার সময় এবং তার পারিভাষিক গঠন পর্যালোচনা করলে যে কেউ অনায়াসে বুঝতে পারবে যে, সেকুলারিজমের জন্য মূলত চার্চের সাথে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব দায়ী নয়; বরং চার্চের সাথে যুক্তির অসামঞ্জস্য দায়ী। কেননা এই বিরোধের পুরো ধাপে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মৌলিক কোনো ইস্যু খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং বিরোধের মূল বিষয় ছিল বাস্তবতা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থার অবগতি এবং কর্মের ক্ষেত্রে কল্যাণের ধারণা লাভের মূলনীতির উৎস ও মানদণ্ডকেন্দ্রিক জটিলতা। এই বিষয়টি আমাদের

সম্মুখে সেকুলারিজমের বাস্তবতা তুলে ধরে। তা হচ্ছে, সেকুলারিজম এমন একটি আদর্শ, যার ভিত্তি হচ্ছে মানুষের জীবনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে ধর্মীয় মাপকাঠি অথবা তার কর্তৃত্ব হটিয়ে দেওয়া। আর এটি প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বজগতের সম্ভাব্য কল্যাণ ও বাস্তবতার অবগতি লাভ করার জন্য মানুষের সাধারণ মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে।[১৩]

পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানের ইতিহাসের ফলস্বরূপ আরব ঐতিহাসিকদের লেখায় প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সেকুলারিজমের সম্পৃক্ততা ফুটে উঠেছে। এটি মূলত পাশ্চাত্যে নাস্তিক্যবাদ প্রচারণার প্রভাব, যা সামগ্রিক জীবন বা তার অংশবিশেষের ব্যাখ্যায় সেকুলারিজমের সংগ্রামকে উপস্থাপন করার প্রয়াসী। প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উন্মোচনের সাথে পবিত্র গ্রন্থের নীতি মেনে চলা ধর্মের সংঘাতের ফলে সেকুলারিজম উত্থাপিত হয়েছে। কেননা বিজ্ঞান ও তার বিশেষ কীর্তিসমূহের প্রতি আকর্ষণের কারণে এ ক্ষেত্রে সংগ্রামের নতুন একটি রূপ প্রদান করা নাস্তিকতার জন্য একটি প্রচারণামূলক অর্জন।

জর্জ হোলিওক[১৪] ও সেকুলারিজমের প্রধান ব্যক্তিত্বদের লেখা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সরাসরি কোনো পবিত্র গ্রন্থের সাথে মৌলিকভাবে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধিতা ছিল না। বরং অতীন্দ্রিয় সবকিছুর সাথেই বিরোধ ছিল। এজন্য হোলিওক সেকুলারিজমকে এমন একটি মতবাদ হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন, যা প্রকৃতির কর্তৃত্ব ব্যতীত অন্য কারও কর্তৃত্ব মেনে নেয় না। বিজ্ঞান ও দর্শন ছাড়া অন্য কোনো পন্থাকে গ্রহণ করে না। এবং মানবজাতির সাধারণ জ্ঞান দ্বারা চিত্রিত বিবেক ছাড়া কোনো নিয়মকে বাস্তবে সম্মান করে না।[১৫] অতএব ধর্মনিরপেক্ষতা পবিত্র বাইবেলের সাথে শুধু তার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির জন্য বিরোধিতা করে না, বরং সাধারণ অবগতি ও বিশেষ জ্ঞানের অধ্যাবসায়ে তা ওহি শ্রবণের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে।

---

১৩. সামি আমেরি, যুগের মহামারি সেকুলারিজম, কাশফুল মুসতালাহ ওয়া ফাদহুদ দালালাহ (লন্ডন : মারকাজু তাকভিন, ১৪৩৮ হিজরি, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ৯৯

১৪. George Holyoake (১৮১৭-১৯০৬) : একজন ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী। বিভিন্ন বিতর্ক, টকশো ও মিডিয়ার মাধ্যমে সেকুলারিজমের বাণী ছড়িয়ে দিতে ও তা সংরক্ষণে কাজ করেছেন।

১৫. George Holyoake, Principles of Secularism (London: Austin & co, 1871), p.14

বিজ্ঞানবাদের আলোচনা করার সময় বিজ্ঞান-আন্দোলনের ভুল ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়। বিজ্ঞানবাদ জ্ঞানের মাধ্যম বলতে শুধু 'পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের মতো' ভৌতবিজ্ঞানকে বোঝায়। যেহেতু তা আমাদের ও পশ্চিমাদের লেখালেখিতে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষত ফরাসিরা, যারা ক্যাথলিক চার্চের সাথে প্রবল দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এ কথাটি মোটেও সঠিক নয় যে, চার্চের পৃথিবী সমতল হওয়ার দাবি এবং এমন আরও কল্পকাহিনির জন্যই চার্চের সাথে দ্বন্দ্বের প্রভাবেই বিজ্ঞানবাদের উত্থান ঘটেছে। বরং তা হচ্ছে মূলত চার্চের বিরুদ্ধে অতি উগ্র ও আদর্শিক প্রচারমূলক লেখালেখির প্রভাব। বিশেষত জন ড্রাপারের[৯৬] বই 'বিজ্ঞান ও ধর্মের লড়াইয়ের ইতিহাস'[৯৭] যা ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর এন্ড্রু হোয়াইটের[৯৮] বই 'খ্রিষ্টবাদের দুনিয়ায় ঐশ্বরিকতা ও বিজ্ঞানের লড়াই এর ইতিহাস'[৯৯] যা ১৮৯৬ সালে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তাতে অনেক কিছু বাইবেল অথবা চার্চের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে পেয়েছেন।[১০০] এই দুইটি বই বিজ্ঞানের সাথে চার্চের সংগ্রামের কথাকে প্রমাণ করে এবং এর প্রভাব জনসাধারণকে যাজক সংস্থা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। বিজ্ঞান ইতিহাসবিদ রোনাল্ড নাম্বার্সের[১০১] ভাষায়, সাধারণ ইতিহাসবিদরা উল্লিখিত বইদুটিকে ইতিহাসের চেয়ে প্রচারণামূলক কাজ হিসেবে বেশি গণ্য করেন।

---

৯৬. John Draper (১৮১১-১৮৮২) : মার্কিন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। আমেরিকান কেমিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রথম কর্তাব্যক্তি।

৯৭. History of the Conflict between Religion and Science.

৯৮. Andrew White (১৮৩২-১৯১৮) : ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ। আমেরিকায় কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি ধর্মবিদ্বেষ ও বিজ্ঞানের বিকাশে ধর্মের নেতিবাচক প্রভাবের দাবি রক্ষণের জন্য খ্যাতি লাভ করেছেন।

৯৯. A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom

১০০. ডারউইনবাদের সাথে সম্পৃক্ততা ছাড়া এই বইয়ে উল্লিখিত অনেক দৃষ্টান্তই সঠিক। তবে এই বইতে যতটা খারাপভাবে চিত্রিত হয়েছে বাস্তব চিত্রে তেমন নয়। জেমস ওয়েলস ১৯০৮ সালে এই বইটি খণ্ডন করে একটি বই লেখেন। যার নাম ছিল : The Popes and Science: The History of the Papal Relations to Science During the Middle Ages and Down to Our Own Time

১০১. Ronald Numbers, ed. Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009), p 6

বাইবেল যে প্রচুর কল্পকাহিনিতে ভরপুর আমি তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু বিজ্ঞানবাদের মতবাদ যে বাইবেল ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের কারণেই উদ্ভব হয়েছিল, আমি এই ধারণা অপনোদন করি। বিশেষত পৃথিবী সমতল হওয়ার দাবি, যা নিয়ে বিজ্ঞানমনস্করা প্রচুর শোরগোল করেছিল। কেননা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর পৃথিবীর ক্ষেত্রে ইসলামের আলেমদের সর্বজনীন মত ছিল পৃথিবী গোলাকার। এর প্রভাবে ধীরে ধীরে চার্চও পৃথিবী গোলাকার হওয়ার সিদ্ধান্তে ফিরে আসতে শুরু করেছিল। অপরদিকে ইহুদি সমাজও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে এই মতটিই গ্রহণ করেছিল। যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে পৃথিবী সমতল হওয়ার ব্যাপারেই ঐকমত্যে পৌঁছেছিল, অথবা তারা এই বিষয়ে কথা বলা থেকে চুপ থাকার নীতি গ্রহণ করেছিল।[১০২] অপরদিকে গ্যালিলিও-এর সেই আন্দোলন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, যদিও এটি আক্ষরিক ব্যাখ্যাকারদের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু পশ্চিমাদের ধর্মীয় কিংবা বিজ্ঞানবাদের মাঝে বিভক্ত করেনি। সুতরাং বিজ্ঞানবাদ কোনো পবিত্র গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক দাবির ব্যাপারে কোনো অবস্থান নয়। বরং এটি অভিজ্ঞতাকে গবেষণা, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদনের কর্তৃত্বে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানের পন্থাগুলোর মাঝে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান।

বিজ্ঞানবাদের বীজ বপন ও পানি সিঞ্চন করেছিল ধর্মহীন ডেইস্ট বা একাত্মবাদী অস্তিত্বে বিশ্বাসী বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি, যারা এনলাইটেনমেন্টের সময়ে পরিচিতি পেয়েছিল। অতঃপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে অগাস্ট কোঁতের হাতে পজিটিভিজম মতবাদটি বিজ্ঞানবাদকে বিশ্বে ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। এরপর অস্ট্রিয়ায় লজিক্যাল পজিটিভিজম তাকে আপন করে নেয়, যাতে করে বাস্তবতা শুধু বিশ্লেষণমূলক ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে।

নিঃসন্দেহে বাইবেলের ত্রুটিগুলো ধর্মীয় জ্ঞানের বিরুদ্ধে এবং প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার পন্থায় মনুষ্য জ্ঞানের উন্নতিতে তার নেতিবাচক প্রভাব বিতর্কের রসদ জুগিয়েছে। কিন্তু নাস্তিকরা তা যাচাই করতে গিয়ে অবৈজ্ঞানিক বিষয় ও সাধারণত অস্বাভাবিক (অলৌকিক) বিষয়ের মাঝে

---

১০২. The Hebrew Encyclopedia: General, Jewish Sefrit Poalim, (1986-1989) 10/69

পার্থক্য করতে বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা মুজিযাকে নিন্দনীয় অবৈজ্ঞানিক ভুল হিসেবে বিবেচনা করেছে।

প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের বিজ্ঞান সম্পর্কিত কল্পকাহিনিগুলো বিংশ শতাব্দীর আগপর্যন্ত খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। তা হয়েছে মূলত ব্যাকরণ ও অন্যান্য অধ্যায়ে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা, প্রত্নতত্ত্ব ও মহাজাগতিক জ্ঞানের বিকাশের পর। যখন গবেষণায় দেখা গেল, সৃষ্টির ঘটনার ক্রমবিন্যাস জেনেসিস বই ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানবীয় উদ্ভাবন দ্বারা অনুপ্রাণিত। এটি এমন একটি বিষয়, যার জন্য হিব্রু ও গ্রিক উৎসে বাইবেলের শব্দগুলো এবং গবেষকদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানগুলো পর্যালোচনা করে বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করা প্রয়োজন। অন্য একটি বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[১০৩]

পূর্বোক্ত বিষয়গুলো একদিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মাঝে অনিবার্য পারস্পরিক সম্পর্ককে এবং অন্যদিক থেকে বাইবেলের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রত্যাখ্যাত বিষয়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বিজ্ঞানবাদের আদর্শিক প্রকৃতির বাস্তবতা বোঝার জন্য এ বিষয়ে সচেতনতা অধিক গুরুত্ববহ। বরং এ দুটি যেকোনো পরিস্থিতিগত সংকীর্ণতার চেয়েও বিস্তৃত। এ দুটি হচ্ছে বিস্তৃত বৈশ্বিক মতবাদ, যা দ্বারা অস্তিত্বকে দেখা হয়। যাতে অস্তিত্বের বাস্তবতা ও তাতে মানুষের মূল্য উপলব্ধি করা যায়।

১০৩. আল ইলমু ওয়া হাকাইকুহু বাইনা সালামাতিল কুরআন ওয়া আখতাইত তাওরাত ওয়াল ইঞ্জিল, ড. সামি আমেরি, ২০১৯

বিজ্ঞানবাদ একটি ধর্মীয় মতাদর্শ

> 'তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তার ভিন্ন অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল-সোজা পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।'
>
> [সুরা ইউসুফ, আয়াত ৪০]

> 'বিজ্ঞানের প্রধানতম ব্যক্তিদের বিপক্ষে আমি কখনো কোনো মন্তব্য করিনি। আদতে আমার বিরোধ একটি কুহেলিকাপূর্ণ জনপ্রিয় দর্শনের সাথে, যা নিজেকে বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে দেখে, অথচ বাস্তবে তা একটি ধর্ম বৈ অন্য কিছু নয়।'[১০৪]
>
> –দার্শনিক জি. কে. চেস্টারটন

বিজ্ঞানবাদীদের ধারণা বর্তমান সময়ে তাদের সংগ্রাম মূলত ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের লড়াই। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে সমর্থন করবে সে ধর্মকে অস্বীকার করবে। অন্যথায় বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে ধর্মে বিশ্বাসী হবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদ ধর্মচিন্তা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত-স্বাধীন। বরং ধর্মচিন্তাকে তা বিশ্বের সঠিক উপলব্ধি থেকে বিকৃত হিসেবে গণ্য করে। এ ক্ষেত্রে জটিলতার মূল বিষয় হচ্ছে 'ধর্ম' ধারণার প্রকৃত রূপ এখানে আলোচ্য নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে ধর্মচিন্তাকে প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের ভিন্ন একটি বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ ধর্ম

১০৪. Gilbert Keith Chesterton, The Club of Queer Trades (New York: Harper & Brothers, 1905), p.241

তা থেকেও অনেক সুবিস্তৃত বিষয়। এমনিভাবে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিষয়ে ধর্মীয় আলোচনা নিতান্তই কম।

বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিপরীতভাবে পুনরায় চিন্তাভাবনা করা উচিত। এভাবে যে—আমরা বিজ্ঞানকে ধর্মের মাপকাঠিতে তুলনা করব, ধর্মকে বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে নয়। অর্থাৎ ধর্মীয় সীমারেখায় বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ এবং পরীক্ষামূলক গবেষণার পরিধির বাইরে গিয়ে তা (বিজ্ঞানবাদ) ধর্মতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা বিষয়ক আলোচনায় পরিণত হওয়া পর্যবেক্ষণ করব। এ ক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় :

১. বিজ্ঞানবাদ কি কোনো ধর্ম হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে? ধর্ম যেহেতু অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন ও নির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য ও সত্তাকে পবিত্র মনে করে ও সম্মান করে, এজন্যই কি বিজ্ঞানবাদ ধর্মের সাথে সংঘাতে লিপ্ত?

২. বিজ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের জন্য ধর্ম আবির্ভাবের পদ্ধতি কী?

নিষ্কলুষতার পথে বিজ্ঞান

পাশ্চাত্যে এমন একটি যুক্তির ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানবাদের প্রচারণা চালানো হয়, যা সেকুলারিজম অথবা লিবারেলিজমের প্রচারণার যুক্তি থেকে ভিন্ন। যেহেতু এটিকে শুধু বিজ্ঞানের একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করলেই তার প্রচারণা পূর্ণতা লাভ করে, তাই এটি বিজ্ঞানকে ছাপিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে না। অপরদিকে বিজ্ঞানবাদ নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে মহাবিশ্বকে বুঝতে চাওয়ার একটি সামগ্রিক পন্থা। বিজ্ঞানবাদের বক্তব্যগুলো অর্থ ও তাৎপর্যের পথের আঁধারে শুধু তার নিজের আলোতেই পথ খুঁজে ফেরে।

বিজ্ঞানবাদের প্রাথমিক মৌল গঠিত হওয়ার ইতিহাসে দেখা যায়, তার উত্থান ঘটেছিল পাশ্চাত্যের চার্চ ও ধর্মতত্ত্বের বিকল্প হিসেবে। বিশেষত ক্যাথলিক চার্চ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনকি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও তাদের হস্তক্ষেপ ছিল। ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও পাদ্রিগণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার ফলাফল অনুসন্ধানের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বিজ্ঞানবাদ কিছু শূন্যস্থান পূরণ করতে অথবা ত্রুটি সংশোধন করতে বিকশিত হয়নি; বরং প্রকৃতির ক্ষেত্রে

মানুষের অনুধাবনকে এবং এর সাথে সকল বিষয়ের অনুধাবনকে সংস্কারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিজ্ঞানবাদ মূলত আমাদের সামনে একটি নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল রঙিন পৃথিবীরূপে বিশ্বকে উপস্থাপন করে। সুতরাং অস্তিত্ব হচ্ছে কেবল অণু কিংবা তার চেয়ে ছোট কিছু থেকে উদ্ভূত একটি বস্তু। শুধু নিরবচ্ছিন্ন কঠোর রীতিগুলো ব্যতীত বস্তুর ওপর কারও কোনো কর্তৃত্ব নেই। এটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামি অর্থের বিপরীত। কেননা ইসলামে অস্তিত্ব হচ্ছে অণুর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এবং অতিপ্রাকৃত বিষয় প্রাকৃতিক জগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আর বস্তু হচ্ছে অস্তিত্বের একটি অসম্পূর্ণ রূপ। অতএব বিজ্ঞানবাদের চোখে অস্তিত্ব হচ্ছে জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র, বিশেষ করে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক বন্ধনকে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও বিনির্মাণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুগত। এটা হচ্ছে বিজ্ঞানবাদের একটি সুস্পষ্ট ধর্মীয় চরিত্র। যেহেতু ধর্মের একটি প্রসিদ্ধ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেক মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার প্রতি মানুষ উৎসাহী হয় ও যার থেকে অপরিহার্য কর্তব্য (ফরজ) নির্ধারিত হয়।[১০৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বিশ্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে একটি ছিল, বিপ্লবী ও সংস্কারপন্থি দলগুলো সকল প্রকার ঐতিহ্যগত বিশ্বাসকে আপন করে নিয়ে নিজেদেরকে ধর্মীয় অবয়বে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করত। এটি প্রকাশিত হয় ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী সাঁ সিমোঁর জীবনের শেষভাগের লেখাগুলোতে, উদাহরণস্বরূপ 'নব্য খ্রিষ্টবাদ'। সাঁ সিমোঁ সেই ব্যক্তি, যে তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই বলেছিল, 'ক্যাথলিক জীবনব্যবস্থা আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, তাই এই জীবনব্যবস্থার পতন অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত এটাই ঘটেছে। আর এই পতনটি একটি নতুন বিশ্বাসের ইঙ্গিত, যা স্বীয় প্রেরণা দ্বারা সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করবে, যা চার্চের সমালোচনা দ্বারা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে।'[১০৬]

---

১০৫. See Lindsay Jones, eds. Encyclopedia of Religion (Detroit: Macmillan Reference USA 2004, 2nd edition), 11/7695

১০৬. Cited in: Richard Olson, Science and Scientism in Nineteenth-century Europe, p.52

সাঁ সিমোঁর অনুসারীরা বার্থোলোমিয়া এনফেন্টিনের[১০৭] নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এমন নতুন একটি আন্দোলন শুরু করেছিল। একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করার দ্বারা তাদের কার্যক্রমের সূচনা ঘটেছিল। এরপর তারা হিপোলাইট কার্নো-এর আমন্ত্রণে চার্চ হাউজ নামে বিবেচনা করা সম্ভব এমন কাজে অগ্রসর হয়। সাঁ সিমোঁর ধ্যানধারণা অনুযায়ী অভিভাষণ উপস্থাপনের দ্বারা বিষয়টি আরও বিকশিত হয়। অতঃপর তা পরিবারতন্ত্রের রূপ নেয়, প্রধান যাজক হিসেবে যার সভাপতিত্ব করেন এনফেন্টিন ও বাযার্ড[১০৮] (নব্য পোপ)। পাশাপাশি এখানে ছিল দূতদের সমাবেশ, প্রকাশ্যে পাপ স্বীকার, ভ্রমণকারী যাজক এবং সমগ্র দেশে আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

যদিও অগাস্ট কোঁৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সাঁ সিমোঁর মতাদর্শ থেকে ফিরে আসেন। তবে পরবর্তী সময়ে তার 'দৃষ্টবাদী রাজনীতিব্যবস্থা' (১৮৫১-৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) ও 'দৃষ্টবাদী ধর্মীয় শিক্ষা' (১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ) এই প্রবন্ধগুলোতে তার মতবাদের প্রচারণার জন্য তিনি মানবতার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে ধর্মীয় চরিত্র গ্রহণ করার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেন। মানবতার ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পোপতন্ত্র, যার শীর্ষে ছিল একজন বড় পাদ্রি। কোঁৎ নিজেই ছিলেন সেই পাদ্রি। মৃতদের স্মরণের রীতি অনুযায়ী স্মৃতিচিহ্নের মাধ্যমে এই সংঘের অভ্যন্তরে সর্বজনীন উপাসনার চর্চা করা হতো।[১০৯]

ক্যাথলিক ধর্মের বিকল্প হিসেবে কোঁতের ধর্মীয় প্রকৃতি অনেক চিন্তাবিদ উপলব্ধি করেছিলেন। তাদের মধ্যে গ্যাস্টন বোথল বলেছেন, 'জীবন সায়াহ্নে এসে কোঁৎ মানবতার ধর্মের নিদর্শনগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করার প্রতি যত্নবান ছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল ধর্মের এমন একটি প্রকার প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে মানবতাকে 'প্রধান অস্তিত্বময়' হিসেবে বিবেচনা করে তার মহিমা

---

১০৭. এনফেন্টিন (Enfantin) ছিলেন ফরাসি সমাজ সংস্কারক এবং চিন্তাবিদ, যিনি Saint-Simonism নামক সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮২০-এর দশকে ফরাসি সমাজের উন্নতির জন্য নতুন ধরনের সামাজিক ধারণা ও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেন। তার নামের সাথে বার্থোলোমিয়া (Barthélemy) শব্দটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিচিতি বহন করে।

১০৮. ফ্রাঁসোয়া-অগুস্ত বাযার্ড (François-Auguste Bazard) (১৮০০-১৮৬৪) ছিলেন একজন ফরাসি সমাজ সংস্কারক এবং সাঁ-সিমোঁবাদ আন্দোলনের নেতা।

১০৯. Ian Hutchinson, Monopolizing Knowledge, pp.৭৯-৮০

বর্ণনা করা হবে। তিনি এই ধর্মের বিদ্যমান সকল বৈশিষ্ট্য একত্রিত করার জন্য প্রচেষ্টা করেন। এটিকে একটি পোপতান্ত্রিক রূপ এবং ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রদান করেন। একই সাথে তার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মানবতার ভাগ্য পরিচালনা করা।'[১১০]

দর্শনের ইতিহাসবিদ এমিল বাহিয়ে[১১১] বলেছেন, কোঁৎ মূলত সেসব বিষয় সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন, যা ক্যাথলিকদের জন্য একক ও সুশৃঙ্খল কর্তৃত্ব তৈরি করেছে। বরং মানবতার ধারণার বাস্তবধর্মী বৃদ্ধি অনুযায়ী তাতে কিছু অংশ বর্ধিত করতে চেয়েছেন। সুতরাং তার ধর্ম ক্যাথলিক ধর্মের সকল বিষয় এমনকি তার ধর্মীয় রীতিনীতি ও পবিত্র নৈবেদ্য ও মূল্যবোধ পুনরায় সৃষ্টি করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করত। পাশাপাশি মানবসভ্যতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা হিসেবে খোদার আসনে বসানো হয়। মনীষীদের সাধুদের স্থান দেওয়া হয়। তিনি একটি আধ্যাত্মিক বা যাজকীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার কাজ হলো বিশ্বাস-মতবাদ শেখানো।[১১২]

কোঁৎ অধিবিদ্যার ধর্মতত্ত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ভৌতবিজ্ঞানের ধর্মতত্ত্বকে উপযোগী করে তোলার জন্য তার বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তিনি শুধু তাই গ্রহণ করেছিলেন, যা চার্চ ও অধিবিদ্যার ধর্মতত্ত্বকে অস্বীকার করে। তার বিকল্প হিসেবে অপর একটি ধর্ম এসেছে, যার উৎস বিজ্ঞান, আর লক্ষ্য মানুষ।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে এবং আমাদের শতাব্দীতেও বিজ্ঞান বন্দনার হাওয়া পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রবহমান ছিল। তার প্রভাব চলচ্চিত্র, সিরিজ, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক প্রোগ্রামগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল। যার মাধ্যমে চেতনার সুপ্ত গভীরতায় প্রসার ও অনুক্রমের জন্য বৃহৎ দরজা উন্মোচিত হয়েছিল। যেন তা এমন প্রতিটি সময়ে প্রকাশিত হয়, যখন সমালোচনার চাপে বিজ্ঞান কোণঠাসা হয়ে পড়ে, তখনো যেন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গৌরব ও প্রসিদ্ধির

---

১১০. মানহাজুল বাহসিল ইজতিমাইয়্যি বাইনাল ওয়াযইয়্যাহ ওয়াল মিইয়ারিয়্যাহ, মুহাম্মাদ আমজায়ন, পৃষ্ঠা, ৮১

১১১. এমিল বাহিয়ে (Émile Bréhier) (১৮৭৬-১৯৫২) : ফরাসি দার্শনিক। প্রথাগত দর্শনে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮২

ব্যানার সমুচ্চ থাকে। সেই গৌরব বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের আকর্ষণকে শুধুমাত্র সম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং এটি একটি নিম্নগামী ঢালু পথের সূচনা, যেখানে কোনো ব্যক্তি এক ধাপ ওপরে উঠতে চাইলে প্রতিটি পদক্ষেপ পরবর্তী পদক্ষেপকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জোরে একটি নতুন, দৃঢ় পদক্ষেপে নিচে নিয়ে যায়। নিষ্কলুষতার দিকে অভিমুখী হওয়া হচ্ছে সেই গৌরবের দ্বারা প্রভুত্ব ও সেই পরম প্রভুত্বকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণের দিকে একটি প্রারম্ভিক পদক্ষেপ।

> 'বিজ্ঞান অবিকল ধর্মের ন্যায়। তবে তার প্রভু হচ্ছে বাস্তবতা।'[১১৩]
>
> —জীববিজ্ঞানী ডেভিড স্লোন উইলসন[১১৪]

বিজ্ঞানবাদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানবাদ মূলত বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে অভিভূত ব্যক্তির ধারণার চেয়েও বিস্তৃত। তা বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের গৌরব থেকেও বিশাল। বিজ্ঞানবাদ একটি সূচনা, যা গবেষণাগারের রুমে সাধনাকারী ব্যক্তির জন্য একটি নতুন ধর্মের মূলনীতি তৈরি করে দেয়। হুবহু সেই ধর্ম, 'ধর্ম' শব্দটি যে অর্থ বোঝায়। এই ধর্মের নিজস্ব উপাস্য, অস্তিত্বের প্রাথমিক বর্ণনা, নবি, অলৌকিক ঘটনা, মুক্তির বর্ণনা, যুদ্ধ, বন্ধন্যা ও অভিশাপ, ক্ষমা ও মুক্তির দলিল রয়েছে।

ধর্ম মানে শুধু এমন চিন্তাধারা নয় যে, লোকেরা একটি নির্ধারিত সত্তার উপাসনা করবে। যে সত্তা প্রজ্ঞাবান, শক্তিমান ও পরিপূর্ণ গুণবিশিষ্ট। যার অস্তিত্ব আবশ্যক। উদাহরণ হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলা যায়। সকলের মতেই এটি একটি ধর্ম, কিন্তু এটিও এক প্রকার নাস্তিকতা। এই ধর্ম উপাস্যদের কোনো ঈশ্বরের সন্ধান দেয় না। ধর্ম হচ্ছে জাগতিক প্রতিটি চিন্তাচেতনা, যা থেকে কিছু নির্দিষ্ট কর্তব্য (ফরজ) ও পরিত্যাগ নির্ধারিত হয়। এমনকি যদিও এই চিন্তাধারা নিরশ্বরবাদী হয়।[১১৫] প্রচলিত ধর্মীয় আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে কোনো ব্যক্তি মুক্তভাবে বেঁচে

---

১১৩. একটি বৈজ্ঞানিক কনফারেন্সে আলোচনা করেছেন <https://www.youtube.com/watch?v=KBmASHDVI-Q>

১১৪. David Sloan Wilson (১৯৪৯-) : মার্কিন নাস্তিক জীববিজ্ঞানী। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

১১৫. ড. সামি আমেরির গ্রন্থ : সেকুলারিজম যুগের মহামারি। কাশফুল মুসতালাহ ওয়া ফাযহে দালালাহ, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৭

থাকতে পারে না। এজন্যই সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস থেকে যখন কেউ সরে যায় তখন সে মহাবিশ্বের এমন একটি চিত্র অঙ্কন করতে বাধ্য হয়, যা বিশ্বকে অনুধাবনের জন্য তার অন্বেষণ-অধ্যয়নকে পরিতুষ্টি দেয়। অস্তিত্বের ইতিহাসের জন্য সে কিছু কল্পকাহিনি রচনা করে। সেখান থেকেই প্রাণের ঘটনা ও প্রাণের অধিকাংশ কষ্টের প্রতিষেধক নির্ধারণ করে।

বিজ্ঞানবাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে অনায়াসেই বোঝা যায় যে, তা ধর্মের সকল শর্ত ও মৌলিক বিষয়ে পরিপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি কোনো অদৃশ্য ধর্ম থেকে পলায়ন করে বিজ্ঞানবাদ গ্রহণ করে নেয়, সে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান গ্রহণ করে নেয় না, যে বিজ্ঞান হাত দিয়ে পরীক্ষা করা যায় ও চোখে দেখা যায়। সে এক ধর্ম থেকে অন্য একটি ধর্মে, এক ধর্মানুশাসন থেকে অন্য ধর্মানুশাসনে, এক অদৃশ্য থেকে ফিরে গিয়ে অন্য অদৃশ্য গ্রহণ করে। এজন্যই ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী গ্রেস ডেভি[১১৬] নব্য নাস্তিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তারা যে ধর্মকে অপছন্দ করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই ধার্মিক অবয়বকেই গ্রহণ করে নেয়।[১১৭] তাহলে বিজ্ঞানবাদ ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো কী?

একটি সামগ্রিক পরিপূর্ণ বর্ণনা :

বিজ্ঞানবাদ ভৌতবিজ্ঞান অথবা গাণিতিক পরিভাষার কোনো গাণিতিক সমীকরণ নয়। বরং তা হচ্ছে আত্মা ও মহাবিশ্ব নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য। যা থেকে অস্তিত্বের সূচনা ও পরিসমাপ্তির সামগ্রিক কিছু বর্ণনা রচিত হয়।

নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে সৃষ্টি ও ধ্বংসের একটি জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানবীয় পারিপার্শ্বিকতার সাথে বিরোধ। তা ভৌতবিজ্ঞান ও অধিবিদ্যাকে একত্রিত করে দাবি করে যে, ভৌতবিজ্ঞান অধিবিদ্যার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। তবে এসবের সারকথা হচ্ছে এই বক্তব্য—নিশ্চয় আমাদের এই বিশ্ব একটি সুনির্ধারিত মহাজাগতিক বিন্যাস। বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে যেকোনো কিছুর অস্তিত্বকে তা

---

১১৬. Grace Davie (১৯৪৬) : এক্সটার ইউনিভার্সিটির সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক। ধর্মীয় সমাজ বিজ্ঞানের মার্কিন সংগঠনের সাবেক পরিচালক। ইউরোপের ধর্মীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণে তার বিশেষ পরিচর্যা রয়েছে।

১১৭. Grace Davie, 'Belief and Unbelief: Two Sides of a Coin: Approaching Religion, 2012, 2:6

প্রত্যাখ্যান করে। সকল কিছুই এই বস্তুবাদের অংশ এবং তাতেই সীমাবদ্ধ। অস্তিত্ব কোনো মাধ্যম ছাড়াই মহাশূন্যের অতল গহ্বর হতে আগত। অথবা তার কোনো শুরু নেই, আদিকাল থেকেই এমন। অর্থহীনতাই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। এটিই সবকিছু পরিচালিত করছে। সকল ক্রিয়া ঘূর্ণন শেষে তাতেই শেষ হবে। আর পৃথিবী যেহেতু একটি পদার্থ বৈ কিছু নয়, তাই দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গভীরতা, গতি ও দিকনির্দেশনা অনুসারে মহাবিশ্বের বর্ণনাই তার বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট।

দার্শনিক ডালাস উইলার্ড[১১৮] বস্তুবাদী বিজ্ঞানবাদের বিশ্বাসের প্রকৃতি তার এই বক্তব্যে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, 'এখানে বাস্তবতা বলতে শুধু একটা বিষয়। আর তা হচ্ছে প্রাকৃতিক জগৎ। ভৌতবিজ্ঞান হচ্ছে তার নবি।'[১১৯]

এর দ্বারাই তা মানবজগতের গণ্ডির বাস্তবতা ও এই অস্তিত্বকে অনুধাবন করার উপকরণ ব্যাখ্যা করে। ডকিন্স বিজ্ঞানবাদী বিশ্বদর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেছেন, 'বিজ্ঞানের পক্ষে জীবন ও বিশ্বের ধারণাকে আরও এগিয়ে নেওয়া সম্ভব, যা আরও বিস্তৃত রূপে সকল ধর্ম–বিশ্বের ধর্মগুলোর প্রচলিত প্রথার মাঝে যে মতানৈক্যগুলো আছে–তার ওপর শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ রাখবে।'[১২০]

প্রায় কাছাকাছি একটি বিবরণ উপস্থাপন করেছেন মার্কিন সংশয়বাদী জীববিজ্ঞানী এডওয়ার্ড উইলসন।[১২১] তিনি বলেন, 'বৈজ্ঞানিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিকশিত চিন্তাধারা ব্যতীত এই প্রধানতম প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া সম্ভব না– আমরা কারা? কোথা থেকে এসেছি? আর আমরা এখানে কেন?'[১২২]

বিজ্ঞানীরা যখন বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে ফেলেন, যাতে করে তাদের ধারণা অনুযায়ী বিজ্ঞান একটি দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে বিশ্বকে বুঝতে

---

১১৮. Dallas Willard (১৯৩৫-২০১৩) : মার্কিন দার্শনিক। সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া ভার্সিটির দর্শন ডিপার্টমেন্টের হেড। দার্শনিক যুক্তির ব্যাপারে তার বিশেষ পরিচর্যা রয়েছে।

১১৯. Cited in: Nancy Pearcey, Finding Truth (David C Cook, 2015), p.71

১২০. Richard Dawkins, Is Science a Religion? <http://www.2think.org/Richard_Dawkins_is_Science_A_Religion.shtml >

১২১. Edward Wilson (১৯২৯-) : মার্কিন জীববিজ্ঞানী। বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মার্কিন একাডেমিয়ার সদস্য। হার্ভার্ড ভার্সিটি সংলগ্ন জীববিজ্ঞান মিউজিয়ামের জেনারেল সেক্রেটারি।

১২২. Cited in Richard Weikart. The Death of Humanity: and the Case for Life (Washington, DC Regnery Faith, .2016), p.111

সক্ষম হয়, তখন তা আর বিজ্ঞান থাকে না। কেননা তখন তা অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অংশ হয়ে পড়ে, যা বিজ্ঞানকে কোনো কার্যকর উপকরণ ছাড়া অদৃশ্যে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।[১২৩]

উপাস্য

বিজ্ঞানের উপাস্য কী?

মুসলিম, ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান ধর্মতাত্ত্বিকদের নিকট উপাস্য হচ্ছেন এমন এক সত্তা, যার অস্তিত্ব আবশ্যক। তার অনস্তিত্ব অসম্ভব বিষয়। পৌত্তলিকদের নিকট উপাস্য হচ্ছেন মহান শক্তির অধিকারী এক আধ্যাত্মিক সত্তা, যিনি মূর্তির মাঝে আবির্ভূত হন। অথবা কখনো কখনো তিনিই স্বয়ং মূর্তি। তবে ধর্মতত্ত্ববিদ 'গর্ডন কফম্যান' ঈশ্বরের যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, সকলের ঐকমত্যে তিনি সে সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অর্থাৎ এমন কিছুর দিকে ইঙ্গিত করা, যা মানুষকে জীবনের একটি উদ্দেশ্য প্রদান করে এবং জীবনের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে অনুপ্রেরণা দেয়।[১২৪]

এটি কুরআনে বর্ণিত উপাস্যের বিস্তৃত সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআনে উপাস্য মানে বলা হয়েছে সাধারণভাবে প্রত্যেক এমন কিছু, যা অনুসরণ করা হয়। এমন আনুগত্য যা একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সেই ধর্মে বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত বিষয় গ্রহণ করে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে?' [সূরা জাসিয়া, আয়াত ২৩]

অর্থাৎ প্রবৃত্তিও একটি উপাস্য। কেননা তা মানুষের ওপর ও তার পথচলার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। যদিও মানুষ ধারণা করে সে নিজেই প্রবৃত্তির ওপর কর্তৃত্ববান।

---

১২৩. (David Bentley Hart, The Experience of God (Yale University Press, 2014), pp. 75-76

১২৪. Thomas A, James, In Face of Reality: The Constructive Theology of Gordon D. Kaufman (Wipf & Stock Publishers, 2011), p.146

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে প্রবৃত্তি অনুসারী নয়, বরং অনুসৃত। কেননা সে আদেশদাতা ও গন্তব্যের দিকে পরিচালক। মানুষ যখন বিজ্ঞানকে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে তখন তাকেই রবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। এজন্যই মার্কিন দার্শনিক জন র‍্যান্ডল[১২৫] লিখেছেন, 'যখন বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিলীন করে দিচ্ছে বলে মনে হয়, তখন মানুষ বিবর্তনের মতো প্রাকৃতিক কিছু শক্তিকেই দেবতার আসনে সমাসীন করে।'[১২৬]

বৈজ্ঞানিক মন, যা সবকিছুর জ্ঞান অর্জন করতে ও সকল কিছুর পূর্বাভাস দিতে সক্ষম, যা ঐশ্বরিক জ্ঞানের পরিপূর্ণতা বহন করে, তার আলোচনা করতে গিয়ে উনিশ শতকে ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী পিয়ার সিমোঁ ল্যাপ্লাস[১২৭] লিখেছেন, 'একটি বুদ্ধিমত্তার কথা চিন্তা করুন, কোনো এক মুহূর্তের জন্য তার পক্ষে ওই সকল শক্তির ব্যাপারে অবগত হওয়া সম্ভব, যে শক্তি সমগ্র অস্তিত্বের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির সাথে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ অস্তিত্বও প্রকৃতি থেকেই গঠিত হয়। যদি এই বুদ্ধিমত্তা এ সকল তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তাহলে একই ফর্মুলায় তার পক্ষে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বস্তু ও সবচেয়ে হালকা পরমাণুর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। কেননা সেখানে অনিশ্চয়তার কোনো স্থান থাকবে না। ভবিষ্যৎটাও তার দৃষ্টিতে অতীতের মতো বর্তমান হয়ে যাবে।'[১২৮]

এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানবাদের মতাদর্শ। যা ভৌতবিজ্ঞানের মাঝেই পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষমতা, এই মহাবিশ্বকে নিজের মর্জিমাফিক পরিবর্তন করার এবং দুনিয়াতেই মানুষের জন্য জান্নাত নির্মাণের অভিলাষ দেখতে পায়। এটি বলে যে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের ঈশ্বরে জ্ঞান ও ক্ষমতার পূর্ণতায় যা বর্ণনা করে, তার মূল উপাদান বিজ্ঞানেই নিহিত রয়েছে। যদিও এটি নিজ মতবাদকে ধর্মতাত্ত্বিকদের ভাষায় চিত্রায়িত করে না।

---

১২৫. John Randall (১৮৯৯-১৯৮০) : একজন মার্কিন দার্শনিক। দর্শনের মার্কিন এসোসিয়েশনের সদস্য ও মার্কিন অধিবিদ্যা সংগঠনের প্রধান।

১২৬. John Randall, Philosophy After Darwin. (New York: University Press. 1977), p8

১২৭. Pierre Simon Laplace (১৭৪৯-১৯২৭) : বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিদ।

১২৮. PS. Laplace, A Philosophical Essay on Probabilities) New York. 1819), p. 4

মানুষের প্রকৃত অবস্থা

বিজ্ঞানবাদের ধর্মে মানুষ কী?

নাস্তিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং[১২৯] তার বিখ্যাত বাক্যে বলেছেন, মানুষ হচ্ছে শুধুমাত্র একটি রাসায়নিক জঞ্জাল (a chemical scum), যা একটি অন্ধ বিস্ফোরণের পরে অর্থহীন অস্তিত্বে আনুষঙ্গিক বিষয়।

মানব ইতিহাস প্রথমে প্রাণহীন একটি বস্তু। ধীরে ধীরে তা একটি প্রাণী হয়ে ওঠে, যা দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে। কাদামাটি বস্তু ও জীবজন্তুর পশুত্ব ব্যতীত তার কোনো পূর্বসূরি নেই। ড্যানিয়েল ডেনেটের উক্তির মাধ্যমে ডারউইনবাদ 'জীবজগৎ, তার অর্থ ও উদ্দেশ্যকে স্থান ও কালের জগৎ, কারণ ও প্রভাব, প্রক্রিয়া ও পদার্থবিজ্ঞানের রীতির'[১৩০] সাথে সামঞ্জস্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ তার ইতিহাস উদঘাটনের ক্ষেত্রে ডারউইনবাদের কাছে চিরঋণী। তার ভূত-ভবিষ্যৎ সবকিছুর জন্যই ডারউইনবাদের প্রতি নির্ভরশীল।

ধর্মীয় অনুভূতি

ধর্মীয় বিশ্বাসে একনিষ্ঠতার যে অনুভূতি তা শুধু সেসব উপাসকের জন্য নির্ধারিত নয়, যারা একজন পবিত্র সর্ববিধ গুণবিশিষ্ট উপাস্যের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। কেননা বিজ্ঞানবাদের ধর্মেও একনিষ্ঠতা রয়েছে। ডকিন্স তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'প্রধানতম প্রতিটি ধর্মেই সৃষ্টির বিস্ময় ও সৌন্দর্যে মনোরম পরিভ্রমণের জন্য সমীহভাবের কথা রয়েছে। আর এটাই সমীহভাব ও শিহরণের অনুভূতি, কার্যত ইবাদত। আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের এই ব্যাপক আনন্দময় উচ্ছ্বাসের অনুভূতি দেয়। বিজ্ঞান এমনভাবে আমাদের এই সুখ নিশ্চিত করে, যা অতীন্দ্রবাদী ও সাধু চরিত্রের ব্যক্তিদের ধারণারও ঊর্ধ্বে।'[১৩১]

---

১২৯. Stephen Hawking (১৯৪২-২০১৮) : বিখ্যাত ইংরেজ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী।

১৩০. Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life (New York: Simon and Schuster, 1996), p.21

১৩১. Richard Dawkins, Doubting Thomases, Outlook, December 13, 2019 <https://www.outlookindia.com/magazine/story/doubting-thomases/216478

বিজ্ঞান হচ্ছে সবকিছুর প্রভু। তার ওপরে অন্য কারও কর্তৃত্ব নেই। তার বিধানকে খণ্ডনকারীও কেউ নেই। তার বক্তব্য কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। এজন্যই সকলের উচিত বিজ্ঞানের প্রতিই অনুগত হওয়া। যেমনভাবে একজন অসহায় অনুগত গোলাম আনুগত্য প্রদর্শন করে। নাস্তিক বিজ্ঞান চর্চাকারী ফেলিক্স লে দেনতেক এই কথায় পরিপূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, বিজ্ঞানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা নিরপেক্ষ। বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষত্ব হলো এটি তার আবিষ্কারকের মেজাজ অথবা ব্যক্তির বিশেষ অভিরুচির ওপর নির্ভরশীল নয়। বাস্তবে এ কারণেই বিজ্ঞান সকলের ওপর অপরিহার্য। এজন্যই আমরা বিজ্ঞানের দাস। বিজ্ঞানের একটি সাধারণ মূল্যবোধ রয়েছে। যদিও অধিকাংশ সামসময়িকদের চিন্তাধারা আমার মতোই, বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কারও এই কদর নেই।[১০২]

বিজ্ঞানীরা হচ্ছেন নবি

প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাই মূলত প্রতিটি বিষয়ের রেফারেন্স। গবেষণাগার, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের বিজ্ঞানে তাদের কথাই বিবেচ্য। এমনিভাবে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতিবিজ্ঞান ও ইতিহাসের জ্ঞানেও তাদের কথাই যৌক্তিক। তারা (নির্বাক উপাস্যবিজ্ঞান) মূর্তির পক্ষ থেকে অস্তিত্বের প্রকৃত অবস্থার প্রচারকারী। সত্য অনুসন্ধানকারী সকলেই তাদের নিকটে ছুটে আসবে, যেহেতু তারা বিশ্বস্ত প্রচারকারী।

লরেন্স এম প্রিন্সিপে[১০৩] তার প্রবন্ধে 'বিজ্ঞানবাদ ও বিজ্ঞানের ধর্ম' কথাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'যেমনিভাবে নবি ও পুরোহিতরা একটি বিশেষ আলোয় উদ্ভাসিত, তেমনি তারা অন্তর্নিহিতভাবে বিজ্ঞানীদের ভাবমূর্তি নবি ও পুরোহিতদের অনুরূপ আকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকতার অন্ধকারের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতদের বিপক্ষে) সত্য উপস্থাপন করছে ও সুসমাচার প্রচারের জন্য সংগ্রাম করছে। এভাবেই তারা নিজেদের জন্য বেছে

---

১০২. Félix Le Dantec, Contre la Métaphysique (Paris: Alcan, 1912), p. 68

১০৩. Lawrence M. Principe (১৯৬২-) : Johns Hopkins University-এর মানবিক বিজ্ঞানের শিক্ষক। সাধারণ বিজ্ঞানের ইতিহাস, বিশেষত রসায়নের ইতিহাসে তার বিশেষ পাণ্ডিত্য রয়েছে।

নিয়েছিল পৌত্তলিক রোমানদের দ্বারা নির্যাতিত প্রাথমিক খ্রিষ্টানদের প্রতিটি নাটক ও তীব্র আবেগ। পরে তারা এই কাজে সফল হয়। বিজ্ঞানের উৎপত্তির মিথ নিজেই বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।[১৩৪]

নির্যাতিত বিজ্ঞানীরা শহিদ

বিজ্ঞানবাদীরা তাদের শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে বেশ যত্নবান। বিজ্ঞানবাদীরা কোপার্নিকাস,[১৩৫] ব্রুনো,[১৩৬] মাইকেল সার্ভিটাসের[১৩৭] মতো বিজ্ঞানীদের এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন তারা সম্পূর্ণ বিনাদোষে বিজ্ঞানের জন্য নিপীড়ন সহ্য করেছেন। দেখানো হয়, যদি তারা না থাকতেন তাহলে ধর্মের অপশক্তি এই বিশ্ব শাসন করত। ভালো হয়ে উঠত মন্দ আর মন্দ ভালো হিসেবে গণ্য হতো।

অলৌকিক ঘটনা

মহাবিশ্বের রহস্যগুলোর সকল রহস্য উন্মোচনের পর ধারাবাহিকভাবে যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে, তাকে বিজ্ঞানের অলৌকিক ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি প্রতিটি অতিপ্রাকৃত ক্রিয়ার ওপর সক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। এজন্যই বিজ্ঞানবাদীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, বিজ্ঞান সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম। বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও চমক সীমাহীন। এখানে অলৌকিক ঘটনা বলতে মহাজাগতিক রীতির মাঝে কোনো অতিপ্রাকৃত ক্রিয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তা হচ্ছে এমন উদ্ভাবন ও উদ্ঘাটন, মানুষ যেগুলোর ব্যাপারে ভেবেছিল, সেগুলো অর্জন করার কোনো উপায় নেই। এজন্যই বলা

---

১৩৪. Lawrence M. Principe, Scientism and the Religion of Science, in Scientism: The New Orthodoxy, eds. Richard N. Williams, Daniel N. Robinson (Bloomsbury Publishing Plc, 2016), p.50

১৩৫. Nicolaus Copernicus (১৪৭৩-১৫৪৩) : পোল্যান্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। মহাবিশ্বের কেন্দ্র পৃথিবী নয়, বরং সূর্য, তিনি এই মতবাদের জন্য বিখ্যাত।

১৩৬. Giordano Bruno (১৫৪৮-১৬০০) : বিখ্যাত ইতালিয়ান জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ। নিজ সময়কার কসমোলজির তত্ত্বের জন্য তিনি বিখ্যাত।

১৩৭. Michael Servetus (১৫১১-১৫৩) : স্প্যানিশ ধর্মতাত্ত্বিক ও পদার্থবিদ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ব্ল্যাসফেমি আইনে তাকে হত্যা করা হয়।

হয়, 'বিজ্ঞান এমন একটি মূর্তি হয়ে উঠেছে, যা জাদুকরিভাবে অস্তিত্বের সমস্ত মন্দকে নিরাময় করে এবং মানব-প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।'[১৩৮]

পরিত্রাণের বিশ্বাস

ধর্মীয় বিশ্বাসব্যবস্থায় পরিত্রাণের বিশ্বাস একটি অপরিহার্য উপাদান। কেননা এটি বিশ্বাস ও সৎকাজের পথ প্রদর্শন করে, যা মুক্তির সুসংবাদ প্রদান করে। ইসলাম ধর্মে মুক্তি হচ্ছে একত্ববাদের পথ ও সে অনুযায়ী আমল করা। অপরদিকে খ্রিষ্টধর্মে তা হচ্ছে মানুষের পাপের জন্য ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করা। আর বিজ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে শুধু বিজ্ঞানকে অনুসরণ ও বৈজ্ঞানিক দাবিসমূহকে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করাই মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা।

বিজ্ঞানের পরিত্রাণ পাওয়ার নীতিবচনগুলো কুসংস্কারে ভরপুর হলেও সমস্যা নেই। যেহেতু দাসত্ব মানেই হচ্ছে অন্ধ। এজন্য নাস্তিক দার্শনিক জন গ্রে[১৩৯] বলেছেন, 'বিজ্ঞান আমাদেরকে কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম নয়। তার পরিবর্তে বিজ্ঞান হয়ে গেছে রূপকথার গল্প প্রচারের একটি মাধ্যম। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরিত্রাণের মিথ। ধর্ম নিয়ে উপহাসকারী অনেক লোক সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবতা আরও উন্নত বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাবে।'[১৪০]

আইন ও ক্ষমতা

বিজ্ঞানবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী মহাবিশ্ব স্বয়ংক্রিয় ও বাধ্য। ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর ওপর কর্তৃত্বশীল। এজন্যই আইন বলতে শুধু পদার্থের আইন ও তার নিয়মনীতি; ক্ষমতা মানেও তাদের ক্ষমতা। মহাজাগতিক ইচ্ছা এসবের কর্তৃত্বের বাইরে যেতে পারে না।

---

১৩৮. Eric Voegelin, The Origins of Scientism, Social Research, Vol. 15, No. 8 (December 1948), p.487

১৩৯. John Gray (1948) : ব্রিটিশ দার্শনিক। চিন্তাচেতনার ইতিহাসে তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

১৪০. John Gray, A Point of View: Can Religion Tell Us More Than Science?, BBC News, September 16, 2011

থিওডেসা

থিওডেসা হলো এই মহাবিশ্বে মন্দের অস্তিত্ব, তার প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে দার্শনিক অথবা ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা। মন্দের প্রশ্নে এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের নিজস্ব উত্তর রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুণবাচক নাম সহকারে অস্তিত্বশীল এবং মন্দেরও অস্তিত্ব রয়েছে। অপরদিকে অগ্নিপূজারিরা দুই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। একজন কল্যাণের, অপরজন অকল্যাণের। একক অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের মতে আল্লাহও নেই, শয়তানও নেই। পূর্ববর্তীদের এই মতবিরোধের ওপর ভিত্তি করে নাস্তিক বিজ্ঞানবাদীরা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে মন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। মন্দ বা অনিষ্ট হচ্ছে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত, যা থেকে রেহাই নেই। এটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন। কারণ এটি বস্তুবাদী নিয়মের কর্তৃত্বের কাছে অনুগত অন্ধ প্রকৃতির একটি যান্ত্রিক প্রভাব।

একটি নৈতিক ব্যবস্থা

বিজ্ঞানবাদ ধর্মীয় নৈতিকতায় বিশ্বাসী নয়। নৈতিকতাকে পবিত্র গ্রন্থের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে না। তা ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি প্রবৃত্তিকে স্বীকৃতি দেয় না। বরং তা এমন এক প্রবৃত্তির কথা বলে, যা কিছু প্রাকৃতিক কার্যসূচির দ্বারা বনে সৃষ্টি হয়েছিল। যা মানুষের জন্য পরিবেশের সাথে অভিযোজন, প্রজননের জন্য নিজেকে টিকিয়ে রাখা নিশ্চিত করে। মানুষ জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই নিজ কোষে প্রোগ্রাম করা বন্য আচরণ থেকে মুক্ত হতে পারে না।

মানুষের নৈতিক চরিত্র, তার উৎস ও উদ্দেশ্য এবং তার ওপর ব্যক্তির ক্ষমতা উপলব্ধি করার জন্য বিজ্ঞানবাদ স্নায়ুবিজ্ঞান ও মস্তিষ্কের গুণকীর্তন করে। অধিকাংশ সময়েই বিজ্ঞানবাদীরা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মানুষ তার নৈতিক পছন্দ ও কাজগুলো করতে বাধ্য। এর দ্বারা মানসিক নৈতিকতা হচ্ছে একটি কল্পনা, যার কোনো বাস্তবতা নেই। সুন্দর নৈতিক নিয়মগুলো শুধুমাত্র স্থিতিশীল সামাজিক অগ্রগতি। যার মূলে রয়েছে আমাদের জেনেটিক কারণ। এরপরেও বিজ্ঞানবাদীরা মস্তিষ্কের রসায়ন ও সমাজের প্রভাবে নৈতিকতাকে অস্বীকার করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছে।

বিজ্ঞানবাদ ও পরীক্ষার আধিপত্যবাদ

> 'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না।'
>
> [সুরা ইসরা, আয়াত ৩৬]

> 'বিজ্ঞানের ব্যর্থতা পরিহারের চেষ্টা থেকেই বিজ্ঞানের পরাজয় ঘটে।'[১৪১]
>
> —দার্শনিক এডওয়ার্ড ফিসার[১৪২]

বিশ্বের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করার জন্য জ্ঞান অর্জনের সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানবাদীরা অন্যদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় না। যদিও প্রাথমিক সময়কার বিজ্ঞানবাদীদের কতিপয়ের বক্তব্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে বলা হয়, এই বিজ্ঞান বিভ্রমের বাস্তবতাকে অতিক্রম করে না। কেননা মস্তিষ্ক এমন একটি যন্ত্র যা বিশ্বের বাহ্যিক বাস্তবতাকে (স্বয়ং বস্তু) নয়, বরং বিশ্বে ঘটমান নানা ঘটনাকে উল্টেপাল্টে হরেকরকমভাবে উপস্থাপন করে। তা ছাড়া বিজ্ঞানবাদের বর্তমান প্রচলিত রূপ সর্বাবস্থায় বিজ্ঞানের পবিত্রতা ও বড়ত্ব বর্ণনা করতে ব্যস্ত। বর্তমান প্রচলিত বিজ্ঞানবাদের নিকট বিজ্ঞানই সকল কিছুর বাস্তবতা উপলব্ধি করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে সকল কিছুর বাস্তবতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

---

১৪১. Edward Feser, The last Superstition: A refutation of the new atheism (South Bend, Ind: St. Augustine's Press, 2011), p.283

১৪২. Edward Feser (১৯৬৮) : মার্কিন থোমিস্ট দার্শনিক। ন্যাচারাল থিওলজি ও বুদ্ধির দর্শনে তার বিশেষ মনোযোগ রয়েছে।

'জ্ঞানের উৎস শুধু এক্সপেরিমেন্ট ও সংকীর্ণ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাঝেই সীমাবদ্ধ' বিজ্ঞানবাদের এই দাবিটি মেনে নিলে সামষ্টিকভাবে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তন্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে :

- বিশ্বকে অনুধাবন করার একমাত্র পন্থা বিজ্ঞান, এই দাবি কি বিজ্ঞান প্রমাণ করতে সক্ষম?
- একজন ব্যক্তি কি পরীক্ষামূলক গবেষণার বাইরে যুক্তির প্রমাণ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে?
- বিজ্ঞানবাদী গুরুরা দর্শনের মৃত্যুর যে দাবি করে তা কতটা সঠিক?
- সত্য সংবাদের ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করা সম্ভব?
- বিজ্ঞান ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হলে কী হবে?

জ্ঞানের উৎস নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞানতত্ত্ব মানবীয় অনুধাবন, মানবীয় অনুধাবনের সম্ভাবনা, উৎস ও মূল্যবোধের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। অর্থাৎ অধ্যয়নের পরিধি কতটুকু হবে? কিংবা অধ্যয়নের পরিধি কতটুকু বিস্তৃত হলে তার মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্ক বিশ্ব, প্রকৃতি ও মানুষের বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে? সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমগুলো কী কী? এবং জ্ঞান অর্জনে এই মাধ্যমগুলোর মূল্য ও ভূমিকা কী?– সে ব্যাপারেও জ্ঞানতত্ত্বের আলাপ রয়েছে।[১৪৩]

যারা সত্য ও মুক্তির সন্ধানে ছুটে চলে তাদের জন্য কুরআনে যুক্তি, চিন্তাভাবনা, দালিলিক পন্থা নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। 'কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা ছাড়াই পূর্বসূরিদের অন্ধ অনুসরণে'র নিন্দায় কুরআনে ধারাবাহিকভাবে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি কুরআনে কারীম মানুষকে এটাও বুঝিয়েছে যে, পূর্ববর্তী পথভ্রষ্টদের উত্তরাধিকারের কর্তৃত্বের বিপরীতে বোধ ও অনুধাবনশক্তি ব্যবহার করাটাই হেদায়েতপ্রাপ্তদের কাজ।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অনুধাবন প্রাথমিকভাবে সঠিক। যার প্রমাণ কুরআনে কারিমের একাধিক আয়াত। সে আয়াতগুলোতে এ কথা বলা হয়েছে, 'যদি

১৪৩. আব্দুর রহমান বাদাওয়ি, আল মওসুআতুল ফালসাফিয়্যাহ, (বৈরুত, আল মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাতু লিদ দিরাসাতি ওয়ান নাশরি, ১৯৪৮) ৩৭০/১

অন্তরের বক্রতা ও ভুল জ্ঞান মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে স্পর্শ না করে, তাহলে অবশ্যই তা নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে।'

দর্শনের ইতিহাস কেউ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারবে যে, জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যাগুলো, বিশেষ করে এর উৎসগুলোর আলোচনার চেয়ে প্রাচীন ও বিস্তৃত অন্য কোনো বিতর্কের উদ্ভব হয়নি। অন্তত যখন থেকে লিখিত দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ জানা গিয়েছে তখন থেকেই দর্শন চর্চার মতবাদ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি দল জ্ঞানের সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, অপরটি কূটতার্কিক, যা জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে। কেননা বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য মাধ্যমের স্বল্পতা রয়েছে, অথবা বাস্তবতা নিজেই অস্তিত্বহীন, তা মস্তিষ্কের পরিধির বাইরে।

এমনিভাবে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞায় দার্শনিকগণ মতবিরোধ করেছেন। বাস্তববাদীদের ধারণা অনুযায়ী বস্তুই চিন্তার মূল উৎস। আইডিয়ালিস্টদের মতে চিন্তাই একমাত্র বাস্তবতা।[১৪৪] প্রাগমেটিকদের মতে বাস্তবতা হচ্ছে কর্মবিষয়ক প্রভাবের অংশ।

যুক্তিবাদীদের অভিমত হচ্ছে, বুদ্ধিই জ্ঞানের একমাত্র অথবা প্রধানতম উৎস। ইন্দ্রিয় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আগপর্যন্ত জ্ঞান আকলের মাঝেই নিহিত থাকে।[১৪৫] অভিজ্ঞতাবাদীরা ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো কিছু জ্ঞান হতে পারে না। সুতরাং আকল বা বুদ্ধি হচ্ছে একটি সাদা কাষ্ঠফলক, অভিজ্ঞতা সেখানে জ্ঞানের ধারণা তৈরি করে।[১৪৬] বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ক্রিটিক্যাল ফিলোসফারগণ। অপরদিকে অতীন্দ্রবাদীরা সংজ্ঞার পক্ষাবলম্বন করেছে। কেননা তাদের বিবেচনায় সংজ্ঞাই জ্ঞানের উচ্চতম ও বিশ্বস্ততম উৎস।

এই বিতর্ক মাঝে মাঝে ব্যাপক প্রচার-প্রসার পায় আবার কখনো সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আবার বেশ শক্তিশালী অবস্থায় প্রকাশ্যে আসে। এটা প্রকাশ করে যে, প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে সম্ভাব্যের প্রশ্ন। সুতরাং মহাবিশ্ব অনুধাবনে জ্ঞানের সম্ভাব্যতা,

---

১৪৪. সংক্ষেপে এটাই বাস্তববাদী ও আইডিয়ালিস্টদের পরিচয়। তবে তাদের অগণিত মতবাদ রয়েছে।

১৪৫. বুদ্ধিবাদীদের মতবাদ জ্ঞান ও সক্ষমতার সাথে পরীক্ষণের সম্পর্ক নিয়ে।

১৪৬. John Locke, Essai sur l'Entendement Humain, tr. Jean-Michel Vienne (Paris: Vrin, 2001), p.164

তার পদ্ধতি ও সীমারেখা অনুধাবন করার পূর্বে মানবজাতি কখনো তৃপ্ত হবে না। যাতে জীবনযাপন সুন্দর হয় এবং তার চাহিদা পূরণ করা যায়।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যখন জ্ঞানের সম্ভাবনা, তার পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করা হয় এবং অন্য উৎসগুলোতে তার জ্ঞানীয় আলোচনা স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখন নব্য নাস্তিকতাবাদের আন্দোলন জ্ঞানতত্ত্বের সকল পারিভাষিক আলোচনা পুনরায় উত্থাপন করে।

জ্ঞানতত্ত্বের উৎস নিয়ন্ত্রণ করা নব্য নাস্তিক্যবাদের জন্য অপরিহার্য অনুষঙ্গ। যেহেতু নাস্তিক্যবাদের বক্তব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে, তাই যথাসময় এই বিষয়ে কথা বলতে বিলম্ব করা অনুচিত। আর তা হচ্ছে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট হওয়া। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিরোধিতা হচ্ছে, জ্ঞানের উৎস হিসেবে শুধু বিজ্ঞানের সাথেই বিজ্ঞানবাদীদের অটলতা। তাদের এই দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এবং তাদের বিতর্কিত বক্তব্য 'অভিজ্ঞতাবিহীন জ্ঞানের প্রতিটি পন্থাই বাতিল' এর প্রমাণে কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক বিস্তারিত বর্ণনাও তাদের পক্ষ হতে উপস্থাপিত হয়নি।

নব্য নাস্তিক্যবাদের প্রধান কিছু নিদর্শন প্রকাশিত হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। এ নিদর্শনগুলো একাডেমিক দার্শনিক বিতর্কের সাথে সামগ্রিকভাবে বৈপরীত্য দ্বারা পৃথক করা হয়েছিল, যেন জ্ঞানতত্ত্বে তার কথা উল্লেখিত হয়। ফলে যখন তারা এমন বিষয়ে মনোনিবেশ করেছে যা সমীচীন নয়, তখন গবেষণার বিষয়বস্তু আরও অধিক বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে নব্য নাস্তিকদের অন্তঃসারহীন উৎসাহব্যঞ্জক অভিব্যক্তিসহ তাদের ত্রুটি বোঝার জন্য জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় পদার্থবিজ্ঞানী লরেন্স ক্রসের[১৪৭] বক্তব্য শ্রবণ করাই যথেষ্ট।

---

১৪৭. Edward Feser, 'Scientists Should Tell Lawrence Krauss to Shut Up Already: Public Discourse, September 28, 2015 </https://www.thepublicdiscourse.com/2015/09/15760>

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদ কি বিজ্ঞানের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রমাণের সামর্থ্য রাখে?

বিজ্ঞানের ইতিবাচক মূল্য উপলব্ধি করার জন্য বিজ্ঞান ছাড়া অন্য সবকিছুকে অস্বীকার করা আবশ্যক নয়। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ তার উদ্ভাবিত বস্তুর মাঝেই সুস্পষ্ট। মানবজাতির জন্য বিজ্ঞানের কল্যাণময় আবিষ্কার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও জ্ঞান অর্জনের অন্য কোনো পন্থা থাকা অস্বীকার করা, এটি তো একটি ভিন্ন আলোচনা। যেহেতু জ্ঞানের ওপর প্রকৃতিবিজ্ঞানের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের দাবির সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য বিজ্ঞানের কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির অংশীদারত্বের পূর্বে অন্য একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। তা হচ্ছে, বিজ্ঞানই সত্য উপলব্ধি করার একমাত্র পথ, বিজ্ঞানবাদীদের এই দাবির প্রমাণ কী?

জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ হিসেবে প্রকৃতিবিজ্ঞান নিজেই নিজের পক্ষে যুক্তি হতে পারে না। কেননা বস্তু নিজেই নিজের প্রমাণ হলে এর দ্বারা বিষয়টি একটি চক্রের মতো হয়ে যায়। তা ছাড়া কীভাবে সে জিনিস সঠিক হতে পারে, যা নিজেই নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং যা বিবেচনা ও বিতর্কের বিষয়ও বটে?

বিজ্ঞানবাদীদের লেখালেখির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, 'জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পন্থা বিজ্ঞান' কথাটির সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সমর্থন হচ্ছে তাদের এই একগুয়েমিপূর্ণ বক্তব্য—ভৌতবিজ্ঞানই সত্যিকার অর্থে মানবজাতিকে উপকারিতা প্রদান করেছে। তা সমস্যা দূরীভূত করে ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণগুলো আরও বিস্তৃত করে। যারা বিনোদন খোঁজে তাদেরকে উপভোগ করতে দেয়। তাদের ভাষ্যমতে, বিশ্বের রহস্য উন্মোচন করার একমাত্র সক্ষমতা বিজ্ঞানের রয়েছে- এটাই 'জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পন্থা বিজ্ঞান' এ দাবি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। এই দাবিটিই রোজেনবার্গ তার বই Atheist's guide to Reality-তে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষে যুক্তি হিসেবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

১. পদার্থবিদ্যা তার ভবিষ্যদ্বাণীতে সঠিক।
২. পদার্থবিজ্ঞানের বিস্তৃত প্রযুক্তিগত প্রয়োগ রয়েছে।
৩. পদার্থবিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে।
৪. অতএব পদার্থবিজ্ঞানই বিশ্বকে অনুধাবন করার একমাত্র পন্থা।

রোজেনবার্গ যে যুক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন তা এই দাবির সঠিকতার প্রমাণ দেয় না যে, বাস্তবতা অনুধাবন করার জন্য পদার্থবিজ্ঞানই একমাত্র পন্থা। কারণ যুক্তিগুলো এটা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয় যে, 'পদার্থবিজ্ঞান (অথবা অন্য যেকোনো বিজ্ঞানসম্মত পন্থা) জ্ঞান অর্জনের সঠিক পথ!' তাহলে কীভাবে এর দ্বারা প্রমাণ করা হবে যে, পদার্থবিজ্ঞান জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ? বিজ্ঞানের কার্যকারিতা তার জানার সঠিকতা আবশ্যক করে না। দেখা যায় প্রতিটি যুগেই সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের কৃতিত্ব রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাতে প্রচুর পরিবর্তন ও রূপান্তর রয়েছে। নিউটনের পদার্থবিদ্যা কি কার্যকর ছিল না? তখন পদার্থবিজ্ঞানীরা কয়েক শতাব্দী ধরে বলেছেন, এটি পদার্থবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট সূত্রসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। নিউটনের পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান তত্ত্বগুলো রহিত করা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা কি চূড়ান্ত সত্য ছিল না? কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব যা আইনস্টাইন তার সম্ভাবনা ও অনিবার্যতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, অবশেষে অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানীদের নিকট সেটাই কি কার্যকর বাস্তবতা হয়ে ওঠেনি? পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে যা বলা যায়, তা হুবহু জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও নিউরো সায়েন্স নিয়েও বলা যায়।

তদুপরি বিজ্ঞানের সঠিকতায় প্রাকৃতিক জগতের কিছু উপসর্গ সম্পর্কে জানলেই এই যুক্তি উপস্থাপন করা যাবে না যে, শুধুমাত্র বিজ্ঞানই বিশ্বের স্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম। সত্যকে জানা এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা অন্য পন্থা থেকে তার সম্ভাব্যতা নাকচ করে না। বিশ্বের অনেক ক্ষেত্রের মাঝে একটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যথার্থতা এটা প্রমাণ করে না যে, ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের যথার্থতা অকাট্য।

নির্দিষ্ট একটি শাখায় বিজ্ঞানের সাফল্য এটা প্রমাণ করে না যে, বিজ্ঞান অন্য সকল শাখাতেই সফলতা অর্জন করবে। যদি না সেই শাখায় এই বিজ্ঞানের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করা হয় এবং এই কারণের সক্ষমতা প্রতিটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নে কার্যকর হয়। অথবা বিজ্ঞানের দার্শনিক পল ফায়রাব্যান্ডের[১৪৮] ভাষায় : এখন পর্যন্ত সমাধান করা হয়নি এমন সমস্যার প্রতিবিধানে বিজ্ঞানের সাফল্যকে

১৪৮. **Paul Feyerabend (১৯২৪-১৯৯৪)** : জার্মান দার্শনিক। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দর্শনের পুরোধা ব্যক্তি। তিনি কার্ল পপারের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি এই চিন্তাধারা থেকে ফিরে আসেন।

একটি আদর্শিক পদ্ধতিতে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এটি শুধু তখনই করা যেতে পারে, যখন এমন কিছু কার্যপ্রণালি থাকে, যা নিখুঁত গবেষণা পদ্ধতি থেকে আলাদা করা যায় এবং যার উপস্থিতি সমস্যা সমাধানে সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়, ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞানের সাফল্য উল্লেখ করে। উদাহরণস্বরূপ মানবীয় আচরণকে পরিমাণগতভাবে পরিমাপ করা প্রমাণহীন একটি দাবি।[১৪৯]

যদি আমরা বিজ্ঞানবাদকে বিবেচনার পদ্ধতি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে তো এর দ্বারা বিজ্ঞানের অর্জন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয় না এবং অবদানকেও অস্বীকার করা হয় না। কেননা বিজ্ঞানবাদের মতাদর্শ থেকে বিজ্ঞান আগত নয়।

"জ্ঞানের একমাত্র পথ হচ্ছে বিজ্ঞান" উক্তিটি বৈজ্ঞানিক নবজাগরণের কোনো কারণ ছিল না, বরং মানব ইতিহাসের প্রধান বৈজ্ঞানিক উত্থানের সূচনা ছিল মুসলমানদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক কাজে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি সংযোজন করা। সুতরাং প্রাচীন চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যকারিতার দিক থেকে দুর্বল। এজন্যই জাবির ইবনে হাইয়ান[১৫০] রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনায় লিখেছেন, এই শাস্ত্রের পরিপূর্ণ বিন্যাস হচ্ছে কাজ ও পরীক্ষা। সুতরাং যে ব্যক্তি কাজ কিংবা পরীক্ষা সম্পাদন করল না, সে কোনো কিছুই লাভ করল না।[১৫১]

রবার্ট ব্রিফল্ট[১৫২] তার মেইকিং অব হিউম্যানিটি গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক উত্থানের ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাবের সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, পশ্চিমে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির পথপ্রদর্শক 'রজার বেকন' খলিফাদের (অর্থাৎ স্পেনের মুসলিমদের) থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও বিজ্ঞান শিখেছিল। রজার বেকন ও তার পরবর্তী সমনাম ফ্রান্সিস বেকন Francis Bacon (মৃত্যু : ১৬২৬) উভয়ের কেউই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য কৃতিত্বের দাবিদার নয়। রজার বেকন খ্রিষ্ট ইউরোপে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার বাহকের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।[১৫৩]

---

১৪৯. Paul Feyerabend, Against Method (London: Verso, 1993), p.2

১৫০. জাবির ইবনে হাইয়ান (১০১ হি, ৭২১ ইং/ ১৯৭ হি, ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ) : প্রখ্যাত রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ ও ভেষজবিজ্ঞানী। তিনি অনেক প্রধানতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জনক।

১৫১. রসায়িলু জাবির বিন হায়্যান, আহমাদ ফরিদ আল মাজিদি, পৃষ্ঠা ৫৬৬

১৫২. Robert Briffault (১৮৭৪-১৯৪৮) : নৃবিজ্ঞানী ও সার্জন। তার লিখিত বইসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য : 'Breakdown: The Collapse of Traditional Civilization'

১৫৩. Robert Briffault, Making of Humanity (London: George Allen, 1919), p.200

ভৌত জগৎকে জানার জন্য বিজ্ঞানের কার্যকারিতা একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ, পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিশ্বের সকল কিছুর ব্যাপারে অবগতি লাভের একমাত্র উপায়। বিজ্ঞানবাদীদের এই দাবির একটা দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায়, ধরুন, মাছ শিকারের জন্য কারও নিকট এমন একটি জাল রয়েছে, যা দিয়ে যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে মাছ শিকার করা সম্ভব; কিন্তু ঘটনাক্রমে কোনো দিন সে জালে মাছ ধরা না পড়লে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে কি—এ স্থানে কোনো মাছ নেই? কিংবা এ কথা বলাও কি ঠিক হবে—এ জালে যেহেতু মাছ ধরা পড়েনি, কাজেই অন্য কোনো জালেও মাছ ধরা পড়বে না?

বিজ্ঞানবাদীদের এ অসার দাবি যেভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, ঠিক একইভাবে 'পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিশ্বের সকল কিছুর ব্যাপারে অবগতি লাভের একমাত্র উপায়', তাদের এই বক্তব্যটিও কোনো উপকারী কিংবা কোনো ইতিবাচক দাবি নয়। এটি বারবার উচ্চারিত একটি পুনরুক্তি মাত্র। কেননা এটি মেনে নিলে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো দেখা দেবে :

১. পদার্থবিজ্ঞান আমাদের জানা সকল কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে।

২. যে জিনিস পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যার আওতাধীন নয় তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

৩. এটাই আমরা জানি। কেননা প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তু অপরিহার্যভাবে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যার আওতাধীন থাকবে।

৪. কেননা পদার্থবিজ্ঞান আমাদের জানা সকল কিছুর ব্যাখ্যা প্রদান করে।[১২৪]

সুতরাং সমস্যার সূচনা যে প্রমাণের মুখাপেক্ষী আমরা সেখান থেকেই আলোচনা শুরু করব। যাতে করে পরবর্তী সময়ে আমরা এই সূচনাতেই তা শেষ করতে পারি। এটিই এই ভূমিকার সূত্র হিসেবে বিবেচ্য। আর এটি একটি চক্র।

অধিকন্তু পরীক্ষামূলক মতবাদ তার সম্ভাব্য জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা আমাদেরকে আবশ্যক কিংবা অসম্ভব বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে পারে না। এটা শুধু এমন বিষয়ে অনুসন্ধান করে, অস্তিত্বের সম্ভাবনা থেকে যার ভিত্তি রয়েছে। সাধারণত অসম্ভব বিষয় আমাদের জানানোই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু এটি সকল পরিস্থিতিতে তা বিরত রাখতে পারে না। পরীক্ষা-এক্সপেরিমেন্ট তো চাঁদের বিদীর্ণ হওয়া ও

---

১২৪. David Bentley Hart, The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss (Yale University Press, 2013), p.77

পুনরায় তা একত্রিত হওয়াকে অস্বীকার করে। কেননা মহাজাগতিক রীতি তো এই পন্থা অনুসরণ করে না। অপরদিকে যুক্তি তা অস্বীকার করে না। মহাজাগতিক রীতি পরিচালনার ওপর যার ইচ্ছার কর্তৃত্ব রয়েছে, সেই মহাজাগতিক রীতির বিপরীতে চাঁদকে বিদীর্ণ করা ও পুনরায় তা ঠিক করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই কর্তৃত্বই সেই অলৌকিক বিষয়কে সম্ভব করে তোলে।

অভিজ্ঞতাকে যা বোধগম্য ও উপযোগী করে তোলে, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা নিজেই অপূর্ণ। তা হচ্ছে কার্যকারণের মূলনীতি বা ভিত্তি। কেননা অভিজ্ঞতা নিজে শুধুমাত্র কারণ ও ফলাফলের পালাক্রমের দিকে নির্দেশ করে। আর আকল বা যুক্তির মাধ্যমে বাস্তবতার পালাক্রম থেকে নির্দিষ্ট মর্ম বা ফলাফল বের করে আনা ছাড়া কারণতত্ত্বের ভিত্তি প্রমাণ করার কোনো সুযোগ নেই।

বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য বিজ্ঞানবাদ শুধুমাত্র প্রকৃতিবিজ্ঞানকেই অনন্য হিসেবে দাবি করতে পারে না। বিজ্ঞানবাদের দাবি হচ্ছে, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রামাণিক, পক্ষান্তরে ধর্ম প্রমাণকে স্বীকার করে নেয় না। কেননা বিজ্ঞানবাদ সাধারণভাবে প্রামাণিক হতে অক্ষম। এ ব্যাপারে আলোচনা সামনে আসছে। কোনো কিছুর মূলনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রমাণ চাওয়াকে ইসলাম অস্বীকার করে না। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ও বিজ্ঞানবাদের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে প্রমাণের প্রকৃতিতে, উৎসে নয়। বিজ্ঞানবাদীদের নিকট পরীক্ষা ও এ জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রমাণ সীমাবদ্ধ। বিপরীতে সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করে এমন প্রতিটি প্রমাণকে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তাই ইসলাম যৌক্তিক প্রমাণ, তথ্যভিত্তিক প্রমাণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে (প্রবৃত্তি) প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে। এজন্য আমরা প্রামাণিক বিজ্ঞান ও নির্দেশমূলক ধর্মের বৈপরীত্যের মুখোমুখি হই না। বরং আমরা প্রমাণ অন্বেষণের দুটি পদ্ধতির মাঝে অবস্থান করি।

বিজ্ঞানবাদ ও যুক্তি

বিজ্ঞানবাদী চেতনার ভিত্তি হচ্ছে মানুষ অভিজ্ঞতার দাস। সুতরাং মানুষের সকল জ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান অথবা জীববিজ্ঞানের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তবে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা সামগ্রিকভাবে অগ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের পর্যবেক্ষণের অনুসারী ও পরিচারক।

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধি কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার সেবক নয়, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরেও আকলের পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত ও প্রসারিত পরিধি রয়েছে। কেননা তা ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় সবকিছুর ব্যাপারেই গবেষণা করে। বাহ্যিক ইন্দ্রিয়তেই সে ধোঁকাগ্রস্ত হয় না। ইন্দ্রিয়লব্ধ বোধকে তা পুনরায় যাচাই করে, যাতে করে তার নিত্যনতুন অর্থে পৌঁছতে পারে। যদিও ইন্দ্রিয়ের কোনো অংশের অনুপস্থিতি আকলের ত্রুটির কারণ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

'তারা বধির, মুক ও অন্ধ। তাই তারা কিছুই বোঝে না।'

[সুরা বাকারা, আয়াত ১৭১]

তা ছাড়া সর্বদা ইন্দ্রিয়ের সঠিকতা আকলের সঠিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ.

'তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না, বরং বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।' [সুরা হজ, আয়াত ৪৬]

পরীক্ষামূলক কাজের ভিত্তি ইন্দ্রিয়শক্তি-এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তবে যুক্তি বা আকলের সমর্থন ছাড়া ইন্দ্রিয়শক্তির যেকোনো কাজ অনেকাংশে মূল্যহীন ও অর্থহীন। আর এটা অস্বীকার করা যুক্তিকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এদিকেই ইশারা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۫ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۫ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

"আর আমি সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা তারা বিবেচনা করে না; তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা তারা দেখে না; তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা তারা শোনে

> না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হচ্ছে গাফেল।' [সুরা আরাফ, আয়াত ১৭৯]

তবে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়শক্তি একজন ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ জ্ঞানী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না। কেননা ইন্দ্রিয়শক্তি কোনো জ্ঞানীয় প্রত্যয়ন প্রদান করে না। বরং তা দৃশ্য, শ্রবণ ও সংবেদন প্রেরণের মাধ্যম। এজন্যই প্রাণীজগৎ বুদ্ধিমান হিসেবে বিবেচ্য নয়। যদিও তাদের কাছে এমন অঙ্গ রয়েছে, যার ওপর তাদের চারদিকের ঘটনা প্রতিবিম্বিত হয়।

কুরআন আমাদের এই নিকটবর্তী ও প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের বাহ্য রূপের ক্ষেত্রে গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অদৃশ্যের খবরাখবরের ওপরেও আকলের সক্ষমতার দিকে ইশারা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَ تَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.
>
> 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন, তার দ্বারা অনুর্বর জমিনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালাতে যা তারই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।' [সুরা বাকারা, আয়াত ১৬৪]

অতএব আকল বা বিবেক-বুদ্ধি জগতের এ সকল জিনিস থেকে সৃষ্টির পূর্বের অস্তিত্বের এমন একটি ঘটনা উদ্ঘাটন করে, যা এই বস্তুবাদী অস্তিত্বের প্রভাবের দিকে ইশারা করে। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান অগ্রগামী, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বাইরে কোনো কিছুর প্রকৃত অবস্থা জানা।

প্রতিটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে 'বাদিহি বিষয়'। বাদিহি বলা হয় ওই জ্ঞানকে, আকল যার দিকে বাধ্যগতভাবেই ধাবিত হয়

(কোনো দলিল ছাড়াই)। অর্থাৎ যেই জ্ঞান বা সূত্র কিংবা ভূমিকাকে আবশ্যকীয়ভাবে মেনে নেওয়া হয় সত্তাগতভাবেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে।

যেমন কুল (পূর্ণবস্তু) তার জুয (অংশ) থেকে বড় অথবা প্রভাব (আসর/ইফেক্ট) তার কার্যকারণের (সাবাব/কোজস) এর অনুগামী হয়—এই সূত্র বা ভূমিকাগুলো বাদিহি বিষয়। কোনো বিজ্ঞানী যখন এগুলোকে অস্বীকার করবে, তখন সে আসলে ল্যাবরেটরিতে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোনিবেশই করতে পারবে না।

বিশ্বজগৎ বাদিহি বিষয় শূন্য হওয়া একজন বিজ্ঞানীকে কেবল গবেষণার ফলাফল অর্জন থেকেই বিরত রাখবে না, বরং তাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনা করা থেকেই অক্ষম করে দেবে।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে বর্তমান সময়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দাবির অন্তরালে সেই বিবেকীয় প্রেরণাকে অকার্যকর করতে চায়, যা সেটিকে বাতিল করে। যদিও এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে অভিনবত্ব প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা, বিস্ময়াভিভূত করা ও অবিশেষজ্ঞদের মোহাবিষ্ট করা, যারা জানে না এটি এমন একটি দাবি, যার পেছনে কোনো পরীক্ষামূলক, অকাট্য অথবা প্রণিধানযোগ্য প্রমাণ নেই। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আকলের প্রেরণাকে এমন কথার মতো অকার্যকর করা যে, একটি বস্তু তার বিপরীতের সাথে মিলিত হতে পারে। এই বক্তব্য স্বয়ং অভিজ্ঞতার বিপরীত। কেননা এটি অযৌক্তিক তথ্যসমূহ অথবা শৃঙ্খলাহীন পরিচয়ের বিক্ষিপ্ততার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং এ কথা বলা যে, বৈপরীত্যের অনুপস্থিতির ভিত্তি শুধুমাত্র কল্পনা—এটির ফলে বৈপরীত্যের অনুপস্থিতির ভিত্তি অস্বীকার করা হয় এবং বিপরীত জিনিস গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে যায়। ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, বৈপরীত্যের অনুপস্থিতির ভিত্তি সঠিক। এর মাধ্যমে মেনে নেওয়া হয়, প্রতিটি এক্সপেরিমেন্ট একই সময়েই একই দিক থেকে সঠিকও হবে, আবার ভুলও হবে। আর এটাই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত গন্তব্য। তার কাছে জ্ঞান হয়ে যায় একটি ফলবিহীন পরিশ্রম। কেননা প্রতিটি আবিষ্কার তার বিপরীতকে মেনে নেয়।

আকল হচ্ছে উপলব্ধির একটি প্রধান অঙ্গ। মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বীজ বপণে ও জ্ঞান অর্জনের অনেক পদ্ধতির মাঝে উপলব্ধির পথকে আলোকিত করতে আকল হচ্ছে একটি সক্ষম ও মোক্ষম হাতিয়ার। কেননা আকল প্রকৃতির নির্দিষ্ট

রীতি ও যেসব ঘটনা বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছে তার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে থাকে। তন্মধ্যে কিছু হলো :

১. সামগ্রিকতা থেকে আংশিকতাকে চয়ন করে নেওয়া, গবেষণার আংশিকতার মাঝেই সামগ্রিকতা উপলব্ধি করা। তার সত্তাগত রীতির পন্থায় বিধান কিংবা সিদ্ধান্তকে ব্যাপক করা।

২. উপমা ও অনুরূপকে পরস্পরের ওপর তুলনা করা।

৩. অর্থের ভিন্নতা ও বৈপরীত্য গ্রহণ করা।

৪. বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, সংগ্রহ ও তার উপলব্ধিগুলোর পার্থক্য করা।

৫. অর্থ ও তার নিকট বোধের যে সম্পর্ক তার অবগতি লাভ।

৬. যৌক্তিক কারণ ও তার ফলের এবং কারক ও যৌক্তিক কারণের মাঝে সম্পর্ক অনুধাবন করা।

৭. অসম্পূর্ণ বস্তুর জ্ঞান থেকে পরিপূর্ণতার জ্ঞান ও পূর্ণতা থেকে অসম্পূর্ণ বস্তুর জ্ঞান লাভ।

৮. অসীম পর্যায়ে অবস্থার সম্ভাবনা ও পরিমাপের কমবেশির ব্যাপারে অবগতি লাভ।[১৫৫]

উপরোক্ত বক্তব্য হতে অপরিহার্যভাবে এমন কোনো দাবিই প্রমাণিত হয় না যে, আকল পরীক্ষামূলক গবেষণার সীমানাও অতিক্রম করবে, ফলে আকলের গবেষণার সীমানা হবে কূলকিনারাহীন বিস্তৃত দিগন্ত পর্যন্ত। আকল সবকিছুর সিদ্ধান্ত দিতে পারে কিংবা আকলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এমনটি ভাবা নিতান্তই মূর্খতা। কেননা আকল তথা মস্তিষ্ক মানবীয় সীমাবদ্ধতায় সীমাবদ্ধ। বোধশক্তি অতিক্রমকারী এমন অনেক বিষয় আছে, যার জ্ঞান অর্জনে আকল সক্ষম নয়।

বিজ্ঞানবাদ ও দর্শনের মৃত্যুর ঘোষণা

অ্যাগ্রেসিভ ব্যাঙ্গাত্মক ভাষার নিজস্ব বিশ্বাসযোগ্য আকর্ষণীয়তা রয়েছে, যা শ্রোতাদের আকর্ষণ করে। কিন্তু অধিকাংশ সময় এই ব্যাঙ্গাত্মক ভাষা নিজের

১৫৫. আবদুর রহমান হাবনাকাহ, জওয়াবিতুল মারিফাতি ওয়া উসুলিল ইসতিদলালি ওয়াল মুনাযারাতি (দামেশক, দারুল কলম, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪

প্রমাণের দুর্বলতা ও গুরুত্বপূর্ণ আনুষাঙ্গিক বিষয় আড়াল করে থাকে। তাই যখন কেউ লরেন্স ক্রসের বিতর্কে তার এই বিদ্রুপাত্মক বাক্যটি উল্লেখ করতে শোনে যে, 'দর্শন তো আবর্জনা ছাড়া কিছু নয়' (philosophy is garbage), তখন তার নাস্তিক সমর্থকরা এটা নিয়ে উল্লাস করে। এতে সে আশ্চর্য হয়, অথচ তার মস্তিষ্ক দ্বারা এটা বোঝা উচিত ছিল যে, সে একজন নাস্তিক বিজ্ঞানবাদীর সম্মুখে রয়েছে, যে তার নিঃশ্বাসের বাতাসকে অভিসম্পাত করে, এবং এটা থেকেও অমুখাপেক্ষী হওয়ার আশা করে। কাজেই বিজ্ঞানবাদ ও দর্শন তখন এমন একটি দার্শনিক গল্প বলে, যার সাথে অভিজ্ঞতা কিংবা ইন্দ্রিয়লব্ধ পর্যবেক্ষণের কোনো সম্পর্ক নেই। তার অভিশাপ যে তার কথাকেই অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে, তা না বুঝেই সে দর্শনকে অভিশাপ করে।

বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের প্রভাব হ্রাস পাওয়া ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টার ইতিহাস বিলীন হওয়াকে অনেক নাস্তিক খুব পছন্দ করে। উদাহরণ হিসেবে পিটার অ্যাটকিন্সের[১৫৬] কথায় তা প্রকাশ পায়। তিনি তার প্রবন্ধে (সায়েন্স এজ ট্রুথ) বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে কথার প্রতিরক্ষা ও প্রকৃতিকে বোঝার ক্ষেত্রে অবশ্যই দর্শনের কোনো অংশগ্রহণ নেই। অবশ্য এমন হয়ে ভালোই হয়েছে। কেননা দর্শন প্রতিবন্ধকতা দূর করা বৈ কিছুই নয়।'[১৫৭]

হকিংয়ের মুখ থেকে সবচেয়ে বড় আওয়াজটি এসেছিল তার বিখ্যাত প্রবন্ধে। তিনি সেখানে বলেন, 'বাস্তবতার প্রকৃতি কী? সবকিছুর অস্তিত্ব কোথা থেকে এল? বিশ্ব কি একজন স্রষ্টার মুখাপেক্ষী? প্রথাগতভাবে এই প্রশ্নগুলো দর্শনের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু দর্শন আজ জীবিত নেই।[১৫৮] অর্থাৎ দর্শনের কাছে এর কোনো জবাব নেই। দর্শন আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে

১৫৬. Peter Atkins (1940) : ব্রিটিশ রসায়নবিদ। রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রির সদস্য। অনেক ধর্মতাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের সাথে মুখোমুখি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। তার কঠোর নাস্তিক্যবাদী বক্তব্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

১৫৭. Cited in: Austin Hughes, The Folly of Scientism. http://www.thenewatlantis.com/publications/the-folly-of-scientism

১৫৮. হকিং যখন বিখ্যাত মন্তব্যটি করেন 'দর্শন মৃত', তখন তারই কলিগ এবং তার সহ-লেখক কসমোলোজিস্ট জর্জ এলিস তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং তিনি মনে করেন বিজ্ঞানে দর্শনের প্রয়োজন আছে। –Scientific American 273(4):55, October 1995

চলতে পারেনি, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানের সাথে। অথচ জ্ঞান অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবনী মশালের বাহক হয়ে উঠেছে।[১২৯]

দর্শন কী? কীভাবে তা বিজ্ঞানের বিকাশের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে?

দর্শনের কোনো সর্বজনস্বীকৃত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কেননা দর্শনের সংজ্ঞা যারা লিখেছে তাদের আধিক্য হিসেবে দর্শনের প্রচুর সংজ্ঞা বিদ্যমান। যখন দর্শনের মৃত্যুর কথা বলা হয় তখন দর্শনকে তার আলোচ্য বিষয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা আমাদের অবস্থান থেকে আরও উপযুক্ত। কেননা এতে করে তার থেকে অমুখাপেক্ষিতার সামর্থ্যটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দর্শন গভীর জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলো নিয়ে গবেষণা করে। তার মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত এস্টোমোলোজি, তার সামর্থ্য, সীমা ও পন্থা। অন্টোলজি, যা অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। অক্ষবিদ্যা, যা মূল্যবোধের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে। সত্য, কল্যাণ ও সৌন্দর্যের যেকোনো আলোচনাই দর্শনের গবেষণার ক্ষেত্র।

বিজ্ঞানবাদের বক্তব্যে দর্শনের মৃত্যুর অর্থ অপরীক্ষামূলক জ্ঞানের সমাপ্তির ঘোষণা। কেননা পরীক্ষাগারের জ্ঞানের ওপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপনের অর্থ হচ্ছে, দর্শন ও চার্চ এতদিন যাবৎ যে প্রধান প্রশ্নগুলোকে (যেমন নীতি, অর্থ, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের প্রশ্ন) একচ্ছত্রভাবে ব্যবহার করত, এখন থেকে পদার্থবিজ্ঞানী ছাড়া অন্য কারও জন্য এর একটি শব্দ নিয়েও আলোচনা করার কোনো অধিকার থাকবে না।

কাজেই এই ঘোষণার অর্থ হলো দর্শনকে অতিক্রম করে যাওয়া। অর্থাৎ এই কথা বলা যে, বিশ্বকে বোঝা ও তত্ত্ব আবিষ্কারের গতিময়পথ চলার ক্ষেত্রে এবং তার নতুন নতুন রূপ বিনির্মাণ করার ক্ষেত্রে দর্শন বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান, বিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে যাকে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়, বিজ্ঞান তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। অথচ হকিং তার মহাজাগতিক কসমোলজিক্যাল মডেল তৈরি করেছেন পৃথিবীর

১২৯. Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, The Grand Design (New York: Random, 2010), p.5

সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত এমন একটি গাণিতিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে, যা বাস্তবতায় রূপ দেওয়া যায় না।

হকিংয়ের বিশ্বাস মতে বিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞানের উপলব্ধি থেকে দর্শনের অচলাবস্থা দূর করেছে। কেননা যদি একটি কাল্পনিক গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয়, তাহলে আমরা বিজ্ঞানের দ্বারা বিশ্বের বাস্তবতা বুঝতে সক্ষম হব না।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে 'বিজ্ঞানকে সঠিক হতে হলে অবশ্যই দর্শনকে অতিক্রম করতে হবে' বিষয়ক আলোচনা। কারণ, দার্শনিক ভিত্তি ব্যতীত বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা একরকম দুঃসাধ্যই বটে। অ্যারিস্টটল, নিউটন, বোল্টজম্যান (Ludwig Boltzmann) এবং আইন্সটাইন মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাদের বৈজ্ঞানিক থিওরি তৈরি করার সময় স্পষ্ট ও অন্তর্নিহিত দার্শনিক বক্তব্যে নিমগ্ন ছিলেন। নিউটন মধ্যযুগের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মেধার অধিকারী দেকার্তের দার্শনিক চিন্তাভাবনা খণ্ডন করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি নিজেকে একজন দার্শনিক হিসেবেই ভাবতেন এবং সেই পরিবেশেই বৈজ্ঞানিক থিওরি অনুশীলন করেছিলেন। বাস্তবতা হচ্ছে প্রতিটি ভৌতবিজ্ঞানীই একজন দার্শনিক অথবা আবশ্যিকভাবে দর্শনের নিকট ঋণী। যেহেতু তিনি অপরীক্ষামূলক অনুমানের ওপরেই তার পরীক্ষার ভিত্তি গড়তে বাধ্য।

একজন পদার্থবিজ্ঞানী তার বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম নয়। সে এই দুটির প্রামাণিকতা দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে বাধ্য। যেমনিভাবে তার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে এর পূর্বে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি মহাবিশ্বের জ্ঞান লাভ করা? যেমনটা বাস্তববাদীদের অভিমত? না-কি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ সমস্ত ফলাফলের বাস্তবতা বিবেচনা না করেই বস্তুবাদের অভিমত অনুযায়ী ব্যবহারিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানকে কাজে লাগানো? যেমনটি অনেক দার্শনিকের অভিমত।

এ সবগুলো মূলত অসংখ্য দার্শনিক প্রশ্ন, যা বিস্তৃত ও পুনরাবৃত্ত এবং যা বৈজ্ঞানিক কর্মের শুরুতেই থাকে ও তার চলার পথ নির্ধারণ করে দেয়। পাশাপাশি তার উদ্দেশ্য কী হবে তাও ঠিক করে দেয়। এমনকি এগুলো প্রতিটি মুহূর্তেই বৈজ্ঞানিক কর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে। ভৌতবিজ্ঞানীর কোনো সামর্থ্য নেই যে, সে তা গ্রহণ করে

নেওয়া ব্যতীত কোনো কাজের পদক্ষেপ নেবে অথবা কোনো বৈজ্ঞানিক ফলাফল প্রকাশ করবে। এর স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা থাকা সত্ত্বেও অনেক বিজ্ঞানবাদী এই বাস্তবতার ব্যাপারে অজ্ঞ। তাদের অজ্ঞতার কারণ, তাদের দার্শনিক অভিমতগুলো জ্ঞানীয় অন্তর্দৃষ্টি। যদিও তা বাস্তবে দার্শনিক সম্ভাবনা মাত্র। যেমনিভাবে তা বিজ্ঞানের দার্শনিক ও বিজ্ঞানের চর্চাকারীদের মাঝে তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্র।

যে সকল ভৌতবিজ্ঞানী অস্তিত্বের ক্ষেত্রে সমীকরণ ও উপমিতি ব্যতীত অন্য কিছুর জ্ঞান রাখে না এবং যাদের দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা সেই পরিসংখ্যান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, এ সকল ব্যক্তি গভীর চিন্তাভাবনা থেকে দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তারা বিশ্বকে বুঝতে সক্ষম। কেননা গভীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি পরিসংখ্যান ও সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণের ঘটনাকেও ছাড়িয়ে যায়। একটি বিশাল কাঠামোর অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে যে পরিসংখ্যান ও পর্যবেক্ষণ নির্মিত হয়, তা দিয়ে ল্যাবের আবিষ্কারের ওপরেই সীমাবদ্ধ মানুষকে বিশ্বকে বোঝানো সম্ভব নয়। কেননা কাগুজে সমীকরণ পরিসংখ্যান ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অনুমতি দেয় না।

বিজ্ঞানবাদীরা সর্বদাই যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে, বিজ্ঞান কি কখনো দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবে? তার উত্তর, কী আশ্চর্য! এটি একটি দার্শনিক প্রশ্ন। এটি তো পরীক্ষাগার, মানমন্দির অথবা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কোনো প্রশ্ন নয়। এই প্রশ্নের যত ধরনের উত্তরের প্রচেষ্টা করা হয়, যদিও মুখে বলা হয় যে জ্ঞান দর্শন থেকে পৃথক, তা একটি দার্শনিক কথা। দর্শন বিজ্ঞানের অনিবার্য ভাগ্য, কেননা এটিই বিজ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের দার্শনিক এডউইন আর্থার বার্ট[১৬০] তার বই 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অধিবিদ্যার ভিত্তি'-তে বলেছেন, অধিবিদ্যা থেকে সরে আসার প্রচেষ্টা অবশ্যই এটিকে এমন একটি রূপ প্রদান করবে, যাতে বড় অধিবিদ্যাগত অনুমান রয়েছে। এজন্যই পজিটিভিজম বা বিজ্ঞানবাদের মতের উদ্দেশ্যে একটি সূক্ষ্ম ও মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। অধিবিদ্যাকে যদি এড়ানো সম্ভব না হয়, তাহলে কোন ধরনের সম্ভাব্য অধিবিদ্যাকে গ্রহণ করা হবে? অবশ্যই এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে,

---

১৬০. Edwin Arthur Burtt (১৮৯২-১৯৮৯) : মার্কিন দার্শনিক। ধর্মের দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন তার ডক্টরেট থিসিসের জন্য, যা পরবর্তী সময়ে একটি বই হিসেবে প্রকাশিত হয়। বইটির নাম : The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science

এই ক্ষেত্রে আপনার অধিবিদ্যা একটি অসমালোচনামূলক আত্মসমর্পণের সাথে গ্রহণ করা হবে। কেননা তা অবচেতনে অদৃশ্যভাবে লুক্কায়িত রয়েছে। তদুপরি এটি আপনার অন্য ধারণাগুলোর চেয়ে আরও সহজে অন্যদের নিকট প্রেরণ করা হবে। কেননা এটি সরাসরি অনুমানের পরিবর্তে ইঙ্গিত দ্বারা প্রচারিত হয়।[১৬১]

মানুষ বৈজ্ঞানিক থিওরির পথ চেনার আগেও দার্শনিক হয়েছে, তার অপছন্দ সত্ত্বেও মানুষ দার্শনিক হয়েছে। প্রয়োজনের জন্যই সে দার্শনিক হয়েছে। প্রথম দিকের অনেক বিজ্ঞান চর্চাকারী 'প্রাকৃতিক দর্শনের' নামে বিজ্ঞান চর্চা করত। এই বিবেচনায় যে, বৈজ্ঞানিক কাজ দর্শনের একটি অনুশীলন, যা প্রকৃতির সত্যতা অনুসন্ধান করে। পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দার্শনিক থিওরি থেকে পৃথক হয়ে জ্ঞানের একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পরিণত হয়।

> 'দর্শন অনুশীলন করা ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর নেই। এখানে একমাত্র বৈধ প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই কাজটি ভালো করব না-কি খারাপ করব? বিজ্ঞানবাদের সাথে সম্পৃক্ত এই ব্যক্তিরা দাবি করে যে, তারা এটি একেবারেই করে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তারা তাদের পদ্ধতি থেকেই অধিবিদ্যা তৈরি করে।'[১৬২]
>
> —দার্শনিক এডওয়ার্ড ফিসার

এ ক্ষেত্রে বাস্তবতা হচ্ছে, বিজ্ঞানবাদীরা অধিবিদ্যা থেকে নিজেদের মুক্ত থাকার দাবির ব্যাপারে নিজের সাথেই মিথ্যা বলে। কেননা তারা তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছে প্রকৃতিবাদী অধিবিদ্যার ওপর ভিত্তি করেই, যা বস্তু ও তার প্রভাব ব্যতীত অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এজন্যই বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে দর্শনের সারনির্যাস ও তার প্রতি অনুগত। যদিও তারা মুখে দার্শনিক তত্ত্বকে অস্বীকার করে।

> বিজ্ঞানবাদ একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বিজ্ঞানকে বস্তুগত দর্শনের আনুগত্যে বাধ্য করে। যদিও তারা দাবি করে দর্শনই বিজ্ঞানের অনুসারী।

---

১৬১. E.A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science (London: Kegan Paul, 1925), pp.225-226

১৬২. Edward Feser, Recovering Sight after Scientism, Public Discourse, March 12, 2010 < /https://www.thepublicdiscourse.com/2010/03/1184 >

বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর দার্শনিক পর্যবেক্ষণের যে প্রভাব বিজ্ঞানবাদীরা মেনে নেয় আমরা তা পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করি না। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদীদের দুটি জিনিসকে আমরা মেনে নিই না। প্রথমটি হচ্ছে তাদের এটি অস্বীকার করা যে সেই প্রভাব এমন দার্শনিক পরিধির মাঝেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়, যা অন্টোলজি ও জ্ঞানের তত্ত্বের ক্ষেত্রে কিছু দার্শনিক বক্তব্য ধারণ করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই প্রভাব সামগ্রিকভাবে নয়। কেননা দর্শন প্রতিটি যুগেই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ওপর প্রভাব ফেলে। তার গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় বৈজ্ঞানিক কাজ, তার পদ্ধতি ও আবিষ্কারে দিকনির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে দুটি মতের প্রভাব, আদর্শবাদ ও বস্তুবাদ।

দার্শনিক বিবেচনাকে ধ্বংস করার জন্য বিজ্ঞান দুটি পন্থা অবলম্বন করে থাকে :

১. বিজ্ঞান নিজেকে নিজে অতিরিক্ত তাজিম করে।

২. বিজ্ঞানবাদের নিদর্শনগুলো খুব জোরেশোরে প্রচার করে, একমাত্র বিজ্ঞানই হচ্ছে ক্রমবর্ধমান। ফলে তার সৌধের ইটগুলো দিন দিন পরিমাণে ও মর্যাদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা ছাড়া সকল সভ্যতা তার মহিমা বৃদ্ধি করেছে। যার দরুন সে নিজেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন ধারায় এগিয়ে নিয়েছে ও অজ্ঞতার সীমাকে সংকুচিত করেছে। উপলব্ধির দরজাসমূহ আরও বিস্তৃতভাবে খুলে দিয়েছে। কিন্তু দর্শন এর বিপরীত। কেননা তার প্রতিটি মতবাদ পূর্ববর্তী মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। পুরোনো মতবাদ খণ্ডন করে তাকে সরিয়ে দেওয়া ব্যতীত নব উদ্ভাবিত দর্শনের সঠিকতায় নতুনত্ব বলে কিছু নেই। সে কারণেই নতুন একটি দর্শনের হাতে নিশ্চিহ্ন হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত একটি দর্শন খুব অল্প কিছুদিনই রাজত্ব করতে পারে। আর ঠিক এ কারণেই বিজ্ঞানবাদীরা দর্শনের একত্ব স্বীকার করে না এবং নতুন একটি দর্শনের হাতে নিশ্চিহ্ন হওয়া প্রতিষ্ঠিত একটি দর্শনের ধ্বংস সম্পর্কে তারা প্রশ্ন তুলে বলে, যদি এমন ঘটতে থাকে তাহলে দর্শনের ফলাফল কী আদতে?

এই দৃশ্যপট, বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম ধোঁকা। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দার্শনিকদের মাঝের মতপার্থ্যকের চেয়ে ভৌতবিজ্ঞানীদের মাঝে মতপার্থক্য অধিক বিস্তৃত। এমনিভাবে প্রধান দার্শনিক বিতর্কগুলো, যার অধিকাংশই প্রাথমিক গ্রিক দর্শন থেকে ছড়িয়েছে, তা হচ্ছে যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মাঝে মতানৈক্য। যারা জ্ঞান ও তর্কের সম্ভাবনার কথা বলে, তাদের মাঝে

যেমনিভাবে মতবিরোধ রয়েছে, তেমনিভাবে যারা বলে সুখ অর্জিত হয় চাহিদা পরিপূর্ণ করে অথবা তা দমন করে, তাদের মাঝেও মতবিরোধ বিদ্যমান। সুতরাং কেউ যদি বলে, 'আজকের দিনে বড় দার্শনিক মতভেদ খুব কমই আছে, তবে তার মূল ও বীজ রয়েছে প্রাচীন দিনে,' তাহলে তা ভুল হবে না।

বিজ্ঞানের ন্যায় অন্যান্য জ্ঞানতাত্ত্বিক শাস্ত্রও নিজ নিজ শাস্ত্রের বিকাশ ও গবেষণায় এমনিভাবে কোনো গভীর বিষয় ব্যাখ্যা করে তা সাধারণীকরণ করা কিংবা কোনো বিষয়ের অতিরঞ্জনতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে দর্শনের পর্যবেক্ষণ থেকে মুক্ত নয়। কাজেই দর্শন পূর্বের সবকিছু ধ্বংস করে দেয় ব্যাপারটি এমন নয়। কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দর্শনের কাজ হচ্ছে প্রত্যেক যুগের প্রতিটি অভিমতের বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটানো এবং ঠিক এ কারণেই আমাদের পরিচিত দর্শনের ইতিহাস জুড়ে অন্টোলজি, জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও অক্ষতত্ত্বের আলোচনায় বিতর্কের ক্ষেত্রগুলো একই।

অপরদিকে প্রকৃতিবিজ্ঞান, যদিও তা সঞ্চিত রাশির মুখাপেক্ষী। কেননা মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের পর্যবেক্ষণের প্রকৃতি বা অবস্থা বিষয়ে সুবিস্তৃত ও গভীর উপলব্ধি অর্জনের জন্য প্রতিটি পূর্ববর্তী আবিষ্কার থেকে তথ্য সঞ্চয় করার প্রয়োজন পড়ে। তবে এটি এই বিষয়কে খণ্ডন করে না যে, যেসব বিষয় বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে তা ধ্বংস করার ওপর বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

গত শতাব্দীতে বিখ্যাত বিজ্ঞান দার্শনিক টমাস কুনের[১৬৩] সবচেয়ে বড় অবদান ছিল তার বিখ্যাত বই The Structure of Scientific Theories. যাতে তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান শক্তির দাবিকে এই বলে আঘাত করেছেন যে, বিজ্ঞান প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক, আর এই বিধ্বংসী ভাবই তাকে পরিচালিত করে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর ভিত্তি সর্বদাই অন্যান্য ভগ্নাবশেষের ওপর থাকে, যা তাদের বিবৃতির সাথে সাংঘর্ষিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

অপরদিকে বিজ্ঞান দার্শনিক কার্ল পপার[১৬৪] 'আমরা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা অর্জন করতে সক্ষম'—আমাদের বিজ্ঞানের এই সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দেন। তার

---

১৬৩. Thomas Kuhn (১৯২২-১৯৯৬) : মার্কিন দার্শনিক। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দার্শনিকদের মাঝে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বৈজ্ঞানিক ও ডায়নামিক দলে চিন্তার আন্দোলন অধ্যয়নে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

১৬৪. Karl Popper (১৯০২-১৯৯৪) : জার্মানির একজন বিজ্ঞান দার্শনিক। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের দর্শনে, বিশেষত বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

মতানুযায়ী বিজ্ঞানের শেষ গন্তব্য এমন কিছু অনুমান, যা খণ্ডন করা সম্ভব। বিজ্ঞানের একমাত্র ইতিবাচক অবদান হলো অনুমানগুলো খণ্ডন করা, তাদের বৈধতার প্রমাণ নয়।

বিজ্ঞানবাদ ও তথ্যমূলক জ্ঞান

নাস্তিক্যবাদী বিজ্ঞানের উক্তিগুলো বিজ্ঞানের ভাষাকে সমুন্নত করতে ও বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা সর্বজনীন করার পাশাপাশি বিজ্ঞান ছাড়া অন্য সবকিছু যে পরিত্যাজ্য তা প্রমাণ করতে জোরালো ভূমিকা পালন করেছে। যা আমাদেরকে এই দাবির বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে প্ররোচিত করে যে, মহাবিশ্বকে উপলব্ধির বিধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানবাদীরা খবর থেকে অমুখাপেক্ষী। খবর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌখিকভাবে অথবা লিখিতরূপে প্রাপ্ত পূর্বপ্রস্তুত জ্ঞান।

নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টিতে সামান্যতম সংশয় নেই। কারণ,খবরের প্রামাণিকতা স্বীকার করার জন্য আমাদের বস্তুনিষ্ঠ দায়িত্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত। আর এর দ্বারাই বিজ্ঞানবাদীদের নিকট তা জ্ঞানের একটি একক উৎস হওয়ার দাবির সত্যতাকে নাকচ করে। কেননা বিজ্ঞান খবরের প্রয়োজনীয়তাকে অপনোদন করতে সক্ষম নয়। যেহেতু বৈজ্ঞানিক সংগঠন তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য জ্ঞানীয় যোগাযোগ ও অসম্পূর্ণের ওপর পূর্ণতার ভিত্তি স্থাপনের মুখাপেক্ষী। এজন্যই কোনো বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ও বই থেকে উপকৃত হওয়ার গুরুত্ব অস্বীকার করে না, যদিও সংবাদটি পরীক্ষামূলক অনুশীলন নয়। বরং তা হচ্ছে শুধু একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়বস্তুর স্থানান্তর।

যারা বিজ্ঞান চর্চাকারী নয় তারা বিজ্ঞানীদের জ্ঞান থেকে জ্ঞানীয় তথ্য অর্জন করতে পারে না। তবে সাধারণ অবস্থায় অবগতি লাভ করতে পারে। কেউ এটা বিশ্বাস করে না যে, ডারউইনবাদের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিজ্ঞানবাদীরা প্রত্যক্ষভাবে জীববিজ্ঞান ও জীবাশ্মবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছে। অথবা তারা জেনেটিক্স ও ফসিল বিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছে। কেননা সাধারণভাবেই তাদের বিষয়টি হচ্ছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফলাফলের দাবির প্রতি সম্মতি ও সত্যায়ন সহকারে বিজ্ঞানীদের দেওয়া তথ্য গ্রহণ করে নেওয়া।

বাস্তবে সংবাদ হলো স্বয়ং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু। কেননা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহের সাথে মস্তিষ্কের সংযোগ স্থাপন, যেন বাস্তবতার সাথে

অনুশীলনের অভিজ্ঞতার দ্বারা তাকে অবহিত করতে পারে। অতঃপর আকল তার বক্তব্য ও অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করে ইন্দ্রিয়ের কাছে বিষয়বস্তুর নিজস্ব উপলব্ধি উপস্থাপন করে। ফলে যখন সে পানিতে লাঠির অর্ধেক অংশ ভাঙা অবস্থায় দেখে, তখন সে দৃষ্টিভ্রমের দ্বারা বিবেচনা করে না। যদিও চাক্ষুষ সংবাদ মস্তিষ্কে জানিয়ে দেয় যে লাঠিটি ভেঙে গেছে। বরং তার আকল জ্ঞানের সাথে পানির অভিজ্ঞতাকে সংযুক্ত করে যে, যখন সে লাঠিটি বের করবে তখন তা সোজা অবস্থায় পাবে। অতএব আকল দিয়ে বিচার করার পূর্বে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কে প্রেরিত খবরে পরিণত হয়। পরীক্ষা ব্যতীত তথ্যেরও একই অবস্থা। খবর গ্রহণে তাকে উপস্থাপন করা হয় কান ও চোখ দ্বারা। অতঃপর তা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, যাতে করে আকল তা সত্য কিংবা মিথ্যার মাপকাঠি দ্বারা বিচার করতে পারে।

আমাদের সময়ে তথ্যভিত্তিক জ্ঞানের গুরুত্বের পরিসীমা কমেনি, বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা শিক্ষার্থীরা স্কুল কিংবা ভার্সিটির চারদেয়ালের মাঝে থেকে যে সাধারণ শিক্ষা অর্জন করছে, তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসহ বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খুব ছোট একটি স্থান রয়েছে, যা উল্লেখযোগ্য নয়। শিক্ষার্থীকে পরীক্ষামূলকভাবে যা বলা হয়েছিল তা পরীক্ষা করা ব্যতীতই শেখানো হয় যে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, তারা গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

বিজ্ঞানবাদ, যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষণের একচ্ছত্র আধিপত্যের দাবিদার বিজ্ঞানবাদ খবরকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে, যদি খবরটি ঐশী প্রত্যাদেশের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। কেননা বিজ্ঞানবাদের নিকট তা আবশ্যিকভাবে মিথ্যা, সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যাত। যদিও এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। কারণ ওহির সক্ষমতা সঠিক হওয়াকে অস্বীকার করেই বিজ্ঞানবাদ পথ চলে। ওহিকে সত্য প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা করে না। বিজ্ঞানবাদের সূচনা সম্পূর্ণ বস্তুবাদী হওয়াতে তা অণু পরমাণু এবং তা থেকে সৃষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করে না। এজন্য ওহিকে অস্বীকার করা বিজ্ঞানবাদের একটি সুদৃঢ় অবস্থান, যাতে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। বিজ্ঞানবাদের মতে ওহির জন্য সৃষ্টি কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি শব্দ বলার অবকাশের পথও নেই।

বিপরীতে বিজ্ঞানবাদের বিরোধী যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস হচ্ছে, ঐশী প্রত্যাদেশই মহাবিশ্বকে জানার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এটি এমন নিখুঁত সংবাদ, যার কোনো সংযোজন প্রয়োজন হয় না। কারণ এটি একটি সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিত সত্য, যা মানবীয় জ্ঞানের বিকাশের সাথে পরিবর্তিত হয় না। এটি রূপান্তর কিংবা পরিবর্তনসাপেক্ষ নয়। তা পরীক্ষার সবচেয়ে বড় ত্রুটিগুলোকে বাধ্য করে যে, এটিই অভিজ্ঞতার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতাগুলোর জন্য প্রতিস্থাপন হিসাবে কাজ করে, যার মধ্যে রয়েছে গবেষণার কৌশল, পদ্ধতি এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রগুলোর বিকাশের কারণে অনেক ফলাফলের পরিবর্তন। কোনো কথাকে ওহি অথবা ইলহামের সাথে সম্পৃক্ত করার শুদ্ধতার জন্য এমন একটি প্রমাণ প্রয়োজন, ধর্মীয় ব্যক্তিগণ যা প্রমাণের চেষ্টা প্রচেষ্টা করে থাকেন। সুতরাং প্রমাণ পাওয়া পর্যন্ত দাবিকারীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া হবে না। যেমনিভাবে প্রমাণ ছাড়াই ওহি কিংবা ইলহামের দ্বারা জ্ঞানের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়াও মেনে নেওয়া হবে না।

জ্ঞানের জন্য ওহির একচ্ছত্র আধিপত্যকে সঠিক করার জন্য কুরআনে বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং কিছু আয়াতে রয়েছে যে, মস্তিষ্ক ও ওহি সঠিক পথের দিশা পাওয়ার অন্যতম বড় দুটি মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

'নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার রয়েছে অন্তর অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।' [সুরা ক্বফ, আয়াত ৩৭]

অতএব অন্তর হচ্ছে সচেতন আকল, আর শ্রবণ হচ্ছে একজন নিষ্পাপ নবির থেকে ওহির মাধ্যমে যা জানা যায় তা।

বিজ্ঞান ও ওহির বৈপরীত্য

জ্ঞানের উৎসসমূহের মাঝে ওহিও একটি উৎস, এ নিয়ে ইসলামপন্থি ও বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যে তর্ক রয়েছে। এই তর্কের মূল বিষয় হচ্ছে দুটি প্রশ্ন।

১. বিজ্ঞান কি ওহির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া সম্ভব?

২. যদি এই দুটির মাঝে সংঘর্ষ হয়, তাহলে কোনটিকে আমরা প্রাধান্য দেব?

বিজ্ঞান ও আকলের সংঘর্ষের সমস্যার মতো আরেকটি বিতর্ক ইসলামি ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে। আর তা হচ্ছে আকল ও ওহির বৈপরীত্যের প্রশ্ন। উপরোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের জবাব শুরু হবে মূলত আমাদের এ বিষয়টি জানার মাধ্যমে। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামি মতাদর্শে ভিন্ন-ভিন্ন উত্তর দেওয়া রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তার রচিত (درء تعارض العقل والنقل)[১৬৫] বইয়ে এই প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। তিনি তার উত্তরে চমৎকার সব বিশ্লেষণ ও একটি নিগূঢ় ভূমিকা উল্লেখের পাশাপাশি উপস্থাপনাতেও মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। তাড়াহুড়া কিংবা অতি বিস্তৃতির বিপরীতে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাটুকু করেছেন।

এ বিষয়ে স্বাধীন উত্তর আকল ও ওহির সংঘর্ষের সমস্যায় ইবনে তাইমিয়া যা বলেছেন তাই। তা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর পরিত্যাগ করে এ ক্ষেত্রে ওহি ও বিজ্ঞানের বাস্তবতা বিবেচনায় এনে বিস্তারিত আলোচনা করা। সুতরাং আমরা এটা বলব না যে, ওহি সাধারণভাবেই বিজ্ঞানের ওপর অগ্রাধিকার পাবে। আবার বিজ্ঞানও সাধারণভাবে ওহির ওপর অগ্রাধিকার পাবে না।

উপরোক্ত প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা এই কথার দ্বারা শুরু হবে, বিজ্ঞান ও ওহির মাঝে বৈপরীত্য সম্ভব। তবে সত্যিকার বিজ্ঞান ও ওহির সত্যিকার মুহকাম অর্থের মাঝে বৈপরীত্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান ও ওহির মাঝে বৈপরীত্যের সম্ভাবনার রূপরেখা এই ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় যে, যার ওপর ওহি নাজিল হয়েছে তার সাথেই সম্পৃক্ত ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট। বিপরীতে বিজ্ঞানের তথ্যটি হবে এমন, যার অকার্যকারিতা প্রকাশ পেয়েছে অথবা অপ্রত্যয়ী। আর এটি প্রতি যুগেই ঘটেছে। যেহেতু বিজ্ঞানের প্রকৃতি হচ্ছে তা সাধারণত বিস্তৃত দৃষ্টির দ্বারা শুরু হয়। তাতে ভুল-ভ্রান্তি থাকে। পরে তার বিকাশ ঘটে। যাতে তা বাস্তবতায় পৌঁছতে পারে। অথবা বাস্তবতার দিকে অন্তহীন চলতে থাকে। তখন সত্য মুহকাম ওহির জন্য আবশ্যক হচ্ছে তার বিরোধিতা করা, যতক্ষণ না তা চূড়ান্ত বাস্তবতার পর্যায়ে পৌঁছায়। এজন্যই এই কথা বলা সঠিক নয়, নিশ্চয় প্রতিটি যুগে বিজ্ঞান আবশ্যিকভাবে ওহির সাথে একমত হবে। আমাদের জন্য শুধু এটুকু বলা আবশ্যক যে, বিজ্ঞানের শুরুর দিকে ও পৌরাণিক কাহিনির প্রসারে আবশ্যিকভাবে আমরা ওহির সাথে প্রচলিত বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব

---

১৬৫. বইটির ইংরেজি অনুবাদ উপলব্ধ রয়েছে The rejection of the conflict between reason and revelation নামে।

দেখতে পাই বা তার বক্তব্য সমর্থনও করা হয় না। এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক বিকাশের যুগেও এই দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। কেননা বিজ্ঞানের ধারণা প্রতিটি যুগেই বিদ্যমান।

কিন্তু বিজ্ঞানে যদি তার বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যতার বিষয়টি নিশ্চিত হয়, তাহলে ওহির বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা এই অর্থে বিদ্যমান যে, এই ওহিটি নবি হওয়ার দাবিদার কারও পক্ষ থেকে একটি মিথ্যা সাক্ষ্য। যেমনটি হয়, উদাহরণস্বরূপ গোলাম আহমদ কাদিয়ানির কথায়। অথবা এমন একজনের সাক্ষ্য যিনি দাবি করেন যে, তিনি প্রেরিত পৌলের[১৬৬] মতো নবুওয়াত দাবি না করলেও ওহির ভিত্তিতে লিখেছেন। অথবা বাইবেলের জেনেসিস বইয়ের মতো কিতাবে মুকাদ্দাস বিকৃত করা হয়েছে। অথবা এমন হতে পারে যে, বর্ণিত হাদিসটির সনদ দুর্বল, অথবা সনদে এমন কেউ রয়েছে, যে মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত, যেমনটি হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অন্যায়ভাবে সম্পৃক্ত করা হাদিসগুলোর অবস্থা।

এমনও হতে পারে যে হাদিসটি যার থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার নিকটেও ওহি আসে, এবং বর্ণনার সনদও সহিহ। কিন্তু লোকেরা ওহি থেকে যা বুঝেছে তার মাঝে ও নিশ্চিত বিজ্ঞানের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এটি এই কারণে যে, ওহির উদ্দেশ্য থেকে যে অর্থ লোকেরা অথবা কতিপয় লোক নির্দিষ্ট সময়ে বুঝেছে তা প্রত্যয়ী নয়। যেহেতু নসে অন্যান্য অর্থেরও সম্ভাবনা রয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে না। অথবা নসটি প্রাকৃতিক বিশ্বকে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তা প্রতীকী বিন্যাসে লিখিত একটি পাঠ্য অথবা একটি স্বপ্নের দৃষ্টিভঙ্গি অথবা অন্যান্য সাহিত্যের ধরন, যা মহাবিশ্বের বাস্তবতাকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নয়। এই ধরনের ব্যাখ্যা খ্রিষ্টানদের কিতাবুল মুকাদ্দাসে প্রচুর পরিমাণে আছে (যা নবিদের কথা, নবি দাবিদারদের কথা ও নবিদের বিকৃত বক্তব্যের সংকলন)।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, সুনিশ্চিত বিজ্ঞান সত্য ওহির সুস্পষ্ট অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি (মহাবিশ্ব ও তার রীতি) আল্লাহর কালাম তথা ওহির বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। যখন সুনিশ্চিত বিজ্ঞান ও ওহির মাঝে বৈপরীত্য পাওয়া যায় তখন এ কথা বলা আবশ্যক যে, এটি বানোয়াট ওহি। আর যখন কোনো মুহকাম ওহি, যা নবির সাথে সম্পৃক্ত

১৬৬. Paul the Apostle.

হওয়া প্রমাণিত তা বৈজ্ঞানিক বিবৃতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন বলতে হবে যে এটি বিজ্ঞানের একটি ভ্রান্ত দাবি।

খ্রিষ্টানদের কিতাবুল মুকাদ্দাসের সমালোচনায় ও তার বিকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইসলামের আলেমগণ পূর্বোক্ত মূলনীতিই গ্রহণ করে নিয়েছেন। তারা কিতাবুল মুকাদ্দাসের অনেক বৈজ্ঞানিক ভুলের অস্তিত্ব চিহ্নিত করেছেন। কেননা তারা জানতেন যে, ওহি অবশ্যই সত্য হবে এবং নিশ্চিত বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

> যদি নস ও বিজ্ঞানের মাঝে বৈপরীত্য পাওয়া যায়, তাহলে যেটা সুনিশ্চিত সেটাই প্রাধান্য পাবে। হোক তা নস কিংবা বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানবাদ কি সত্যিকার অর্থেই বিজ্ঞানসম্মত?

> 'বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত করো।'
>
> [সুরা বাকারা, আয়াত ১১১]

> ভিন্ন কারও পক্ষ হতে যুক্তিপ্রমাণ ব্যতীত বিজ্ঞান নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রাথমিকভাবে অন্য অনেক অনুমানের ওপর বিশ্বাস করা ব্যতীত আমরা বিজ্ঞানের অনুমানকে সত্য মনে করতে পারি না। সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞানের জগতের চেয়ে আমাদের অনেক বিস্তৃত একটি পৃথিবী রয়েছে।'[১৬৭]
>
> —ব্রিটিশ বিজ্ঞান দার্শনিক ম্যারি মিজলে[১৬৮]

বিজ্ঞানবাদীরা এই কথাটি খুব জোর দিয়ে বলে যে, 'বিজ্ঞানই সকল কিছুর মানদণ্ড ও মূলনীতির বিবরণ প্রদান করে। এখানেই সত্যের শুরু ও শেষ। সকল রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব বিজ্ঞানের অথবা এটার জন্য শুধু বিজ্ঞান একাই যোগ্য। বিজ্ঞানের এই গুণ অন্য কোনো জ্ঞানীয় পদ্ধতির সাথে অংশীদার হয় না। কেননা এতে বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পণ্ড হয়ে যায়। তা হলো সত্যকে জানার জন্য বিজ্ঞান হচ্ছে একটি সুসংজ্ঞায়িত পদ্ধতি। প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা কোনো কিছুকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করে না। এবং এই প্রমাণটি বৈজ্ঞানিকভাবে বাস্তবসম্মত হতে হবে।'

---

১৬৭. Mary Midgley, Science as Salvation (London: Routledge, 1992) p.108

১৬৮. Mary Midgley (১৯১৯-২০১৮) : ব্রিটিশ দার্শনিক। নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির শিক্ষিকা। জ্ঞানের দর্শন ও নৈতিকতার দর্শনে তার বিশেষ পাণ্ডিত্য রয়েছে।

কিন্তু...

- বিজ্ঞানবাদ কোন বিজ্ঞানের কাছে রায় কামনা করে?
- বিজ্ঞানী কি ল্যাবে শূন্য জ্ঞান থেকে শুরু করে?
- বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা যা কিছু জানি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কি পরিপূর্ণভাবে অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ?
- যে বিজ্ঞানবাদ বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুকে সঠিকতার মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, তার নিজ সত্তা ও বক্তব্যগুলো কি বিজ্ঞানসম্মত?

বিজ্ঞানবাদ ও বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

বিজ্ঞানবাদের বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ার বক্তব্যটি সঠিক হওয়া আবশ্যিকভাবে নির্ভর করে বিজ্ঞানের এমন একটি মানদণ্ডের ওপর, যা ব্যাপক বিরোধিতা থেকে মুক্ত, যা সত্য বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম। ঘটনাকে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদের সফলতা নির্ভর করে এমন একটি মাধ্যম অর্জন করার ওপর, যা বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই, যাতে তা মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন, তার ব্যাখ্যা ও অধ্যয়নের মাধ্যম হয়। এজন্য কার্ল পপার বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানের দর্শনে অধিকাংশ মৌলিক সমস্যার মূল হচ্ছে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে না পারা।'[১৬৯]

কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণের সমস্যাকে বিজ্ঞানের দর্শনের রীতিনীতিতে পার্থক্যের তথা সীমা নির্ধারণের (problem of demarcation) সমস্যা হিসেবে দেখা হয়েছে। বিজ্ঞানবাদীদের মতে বিজ্ঞানের সংজ্ঞাই অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন বিষয়, যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা, জ্ঞান ও কুসংস্কারের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয়। তাই এটি কোনটি বিজ্ঞানভিত্তিক আর কোনটি বিজ্ঞানের সীমার বাইরে তা পার্থক্য করার ক্ষেত্রে তদারকি করে। অথবা বিজ্ঞানের সংজ্ঞাই হচ্ছে কোনটি বিজ্ঞানের আওতাধীন আর কোনটি অপবিজ্ঞানের আওতাধীন তা পার্থক্যকরণের মাপকাঠি। আর কেউ যখন বিজ্ঞানকেই জ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে নেয় তখন বিশ্বকে বিজ্ঞানবাদীদের মতো করে বোঝার সকল

---

১৬৯. Karl Popper, Conjectures and Refutations. The growth of scientific knowledge (New York: Basic Books, 1962), p.42

প্রচেষ্টার আগে বিজ্ঞানকে অন্য সবকিছু থেকে সুনির্ধারিত করে নেওয়াটাই তার প্রথম কর্তব্য।

বিজ্ঞানবাদী নাস্তিক ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের বিতর্কে বিজ্ঞানকে সুসংজ্ঞায়িত করার প্রশ্নে একটি বাস্তবিক বিভেদ রয়েছে। এই বিতর্কের মাঝে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি পেয়েছিল যে বিষয়টি, তা হচ্ছে ডারউইনের মতবাদ বনাম সৃষ্টিবাদী মতবাদ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে বিবর্তনবাদী মতবাদটির ওপর প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। কেননা তা সত্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। পরে ১৯২৫ সালে টেনেসির বিচার বিভাগ এটির শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করার জন্য একটি রুল জারি করে। তারপর ১৯৬৮ সালে এই রুলটি আরকানসাস[১৭০] সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাতিল করা হয়। এরপর ২০০৫ সালে আরকানসাস রাজ্যের বিচার বিভাগ ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন মতবাদের পাঠদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করে আইন প্রণয়ন করে। কেননা তা একটি ধর্মীয় মতবাদ এবং তা বিজ্ঞানের আওতাধীন নয়। অথবা বিচারক জোন্সের ভাষায়, 'এটি একটি ধর্মীয় বিকল্প, যা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে।'[১৭১]

এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণের সময় সবচেয়ে আশ্চর্জনক বিষয় হচ্ছে, বিজ্ঞান কর্তৃক দর্শনের ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিভ্রান্তি। এই বিষয়ে যারা গভীরভাবে অধ্যাপনা করেছেন তারা এমন কোনো সুনির্ধারিত জ্ঞাত বিষয়ের ওপর ঐকমত্যে আসতে পারেননি, যা বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ের একটি সীমারেখা আবিষ্কার করতে পারে। যদিও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন তার পুরো ইতিহাস জুড়েই অব্যাহতভাবে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান সৃষ্টি করেছে।

অ্যারিস্টটলের পর আর কোনো বিবেকবোধসম্পন্ন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সীমা নির্ধারণের প্রতি সচেষ্ট হয়নি। তিনি এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক সামগ্রিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করেছেন, যেই দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যৌক্তিক পজিটিভিজমের আবির্ভাব ব্যতীত। তখন এই দাবিটি পূর্ণতা পায় যে,

---

১৭০. Arkansas হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য, যা দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। এটি সাউথ সেন্ট্রাল অঞ্চলের অংশ এবং এর রাজধানী শহর হচ্ছে লিটল রক (Little Rock)।

১৭১. Christian C. Young, Mark A. Largent, Evolution and Creationism: A Documentary and Reference Guide (Westport, Conn.: Greenwood Press, 2007), p.287

শুধুমাত্র বিশ্লেষণাত্মক বা অভিজ্ঞতামূলক প্রতিবেদনগুলোই অর্থপূর্ণ। আর অন্য সকল প্রতিবেদন অর্থপূর্ণের সীমার বাইরে। তাই এটি সুস্পষ্ট অনর্থক বিষয়। একটি জিনিস যতক্ষণ না তা যাচাই করা সম্ভব, ততক্ষণ তা পরীক্ষামূলক হিসেবে গৃহীত হয় না। আর এটিই একমাত্র মানদণ্ড, যাকে বলা হয় যাচাইয়ের (Verificationism) মানদণ্ড।

যাচাইয়ের অর্থ হলো, যাচাই এমন একটি শব্দ, মানুষের নিকট যার বাস্তবসম্মত অর্থ রয়েছে। সুতরাং যা যাচাইকরণের নীতিতে আসে না, তা হয়তো দ্বিরুক্তি Tautology. যেমন বলা হয়, ত্রিভূজের তিনটি কোণ আছে। অথবা যে বিয়ে করেনি তাকে বলা হলো সে একজন অবিবাহিত। বোঝা গেল, যাচাইয়ের সংজ্ঞা দ্বারা নতুন জ্ঞান বৃদ্ধি পায় না; বরং তা জ্ঞাত বিষয়ের বিশ্লেষণমাত্র। কাজেই সাধারণ যাচাইয়ের দ্বারা ব্যাপারটি হয়তো একটি বিশ্লেষণাত্মক (Analytic) বিষয়, অথবা এমন একটি মিথ্যা অনুমানে পরিণত হবে (Pseudo-proposition), যার বৈজ্ঞানিক বৈধতা যাচাই করার কোনো উপায় নেই। যেমন অনেক ধর্মীয় দাবি।

অবশ্য অনেক বিখ্যাত লেখক যাচাইকরণের মানদণ্ড নিয়ে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। বিশেষত মার্কিন দার্শনিক উইলার্ড কুয়াইন[১৭২] তার নিবন্ধ Two Doctrines of Empiricism-এ এবং জার্মান দার্শনিক কার্ল হেম্পল[১৭৩] তার বেশ কিছু গবেষণাপত্রে এ নিয়ে আলাপ করেছেন।[১৭৪]

এরপর শুধু এই মানদণ্ডের আনুষ্ঠানিক মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া বাকি থাকে। যাচাইকরণের নীতির ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুতর যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল তা হচ্ছে, এটি একটি আদর্শিক নীতি, বিজ্ঞান যাকে সমর্থন করে না। এটি নির্ধারণ করা হয়েছে শুধু দার্শনিক মতবাদের প্রয়োজনীয়তার জন্য। এটি যাচাই করার

---

১৭২. Willard Quine (১৯০৮-২০০০) : বিংশ শতাব্দীর মার্কিন বিখ্যাত দার্শনিকদের মাঝে অন্যতম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিজ্ঞানের দর্শনে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

১৭৩. Carl Hempel (১৯০৫-১৯৯৭) : যৌক্তিক দৃষ্টবাদ মতবাদের প্রধানতম ব্যক্তি। বিজ্ঞানের দর্শন ও যুক্তির দর্শনে বিশেষ পাণ্ডিত্য রয়েছে।

১৭৪. Carl Hempel, Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning: Revue Internationale de Philosophie, 1950, 41(11):41-63, The Concept of Cognitive Significance: A Reconsideration, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, 1951, 80(1):61-77

জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও অনুপযুক্ত। তাই তাদের মতবাদ হিসেবে এটি একটি অর্থহীন বিষয়, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শর্ত পূরণে সক্ষম না হওয়ায় যাচাইকরণের নীতিকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

যাচাইকরণের নীতিটি প্রতিটি সমস্যার মূল পয়েন্ট পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিতে কোনো সার্বজনীন (Universal) দাবি/ প্রিন্সিপালকে মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষত অসীম শাখাধারী কোনো মূলকে মানা যায় না। কেননা এটি সরাসরি যাচাইকরণের জন্য উপযুক্ত নয়। এজন্য বিজ্ঞান সম্পর্কে সর্বজনীন দাবি করা অসম্ভব, যা যৌক্তিক পজিটিভিজম মেনে চলে না।

এই কথাটির ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছিল যে, লজিক্যাল পজিটিভিজমের মতবাদের ক্ষেত্রে এই ইস্যুটি বৈজ্ঞানিক নয়। যদি না এটির একটি বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে। যদিও বিজ্ঞানীরা তাদের অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাত্ত্বিক গাণিতিক আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে এমন কিছু আবিষ্কারের দিকে পৌঁছেছেন, যা আগের কোনো জ্ঞান দ্বারা যাচাই করা যাবে না। আর এই আবিষ্কারকে সমর্থন করার জন্য এক্সপেরিমেন্ট তো পরে এসেছে। অতএব তত্ত্বগুলো পরীক্ষা করার আগেও সঠিক হতে পারে।[১৭৫] এর অর্থ হচ্ছে যুক্তিবাদের মডেল হিসেবে যে বিজ্ঞানকে বিবেচনা করা হয় তা নিজেই যাচাইকরণের নীতিটি পূরণে অক্ষম।

কার্ল পপার হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যিনি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যাচাইকরণের নীতির পতনের সাথে বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের মাঝে পার্থক্য করার সমস্যায় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার আলোচনা ছিল বৈপ্লবিক। বর্তমান সময় পর্যন্ত তার প্রতিধ্বনি বিদ্যমান। তার বিকল্প ছিল মিথ্যা প্রমাণের উপযুক্ত (Falsificationism) মানদণ্ড।[১৭৬] অর্থাৎ প্রকৃতির বাস্তবিক বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে বৈজ্ঞানিক দাবির অধ্যয়ন ও তাকে অকার্যকর করার ক্ষমতা। অতএব অপবিজ্ঞান এমন একটি দাবি উপস্থাপন করে, যা সমর্থন বা খণ্ডন করা যায় না।

---

১৭৫. সালেম ইয়াফুত। সমকালীন বিজ্ঞানের দর্শন ও তার বাস্তবতার উপলব্ধি। (বৈরুত : দারুত তলিয়াতি লিত তবায়াতি ওয়ান নাশরি। ১৪০৬ হিজরি, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯

১৭৬. এই পরিভাষাটি (ফলসিফিকেশনিজম) একাধিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : বাতিল করা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, বিনষ্ট করা অথবা ধ্বংস করার সক্ষমতা।

প্রসিদ্ধ নিবন্ধগুলোতে অপনোদনের উপযুক্ত মানদণ্ডের প্রসিদ্ধি লাভ করা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের দার্শনিকরা যে গন্তব্যে পৌঁছেছেন তা শেষ বলে বিবেচনা করা যায় না। কেননা এভাবে বিচার করলে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। এই মানদণ্ডটি বিজ্ঞানের অনেক দার্শনিকের দ্বারা অনেক সমালোচনার শিকার হয়েছে। এমনকি উইলার্ড কুয়াইন বলেছিলেন, পপার বিজয় ঘোষণা করতে তাড়াহুড়া করেছে। বিশেষ করে এ ব্যাপারে যে, 'বিজ্ঞান' গবেষণা ও সরঞ্জামের একই দলভুক্ত নয়।[১৭৭]

মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উপযুক্ততার মাপকাঠির সমালোচনা পূর্ণতা পেয়েছে এমন জ্ঞাত বিষয়কে বিয়োজন করার পরিপ্রেক্ষিতে, যে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় একমত যে, এটি জ্ঞাত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিজ্ঞান, অথবা বিজ্ঞানের ছদ্মাবরণে তাতে অপবিজ্ঞান চাপিয়ে দেওয়া।[১৭৮] যেমনিভাবে পপারের মানদণ্ডেও আপত্তি তোলা হয়েছিল যে, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানবিক সমস্যাগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। ফলে তার বৈজ্ঞানিকতার মানদণ্ডটিও একের মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকতার দিক থেকে বিজ্ঞানীরা তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই মানদণ্ডটি মেনে চলেন না। যেমন শন ক্যারল[১৭৯] বলেছেন, 'ভুলের উপযুক্ত মাপকাঠি হলো একটি সাধারণ স্লোগান, যা দর্শনবিমুখ প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা আঁকড়ে ধরেন।'[১৮০]

পপারের পর বিজ্ঞানের অন্য কিছু সংজ্ঞার কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন নিশ্চিতকরণের উপযুক্ততার (Confirmability) মান, প্রগতিশীলতার মান (Progressiveness), ব্যাখ্যামূলক পর্যাপ্ততার মান (Explanatory

---

১৭৭. Massimo Pigliucci and Maarten Boudry, eds. Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem (Chicago: The University of Chicago Press, 2014), p.1.

১৭৮. Martin Mahner, Demarcating Science from Non-Science, in Handbook of the Philosophy of Science: General Philosophy of Science. Theo Kuipers, ed. (Amsterdam: Elsevier, 2007), pp.518-519

১৭৯. Sean Carroll (১৯৬১ -) : মার্কিন কসমোলজিস্ট। কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও মহাকর্ষের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। নাস্তিক পদার্থবিদদের মাঝে অন্যতম, যারা বিশ্বাস ও নাস্তিকতার কথোপকথনে অংশগ্রহণ করেছিল।

১৮০. Kate Becker, Does Science Need Falsifiability?, pbs.org, February 11, 2015 </https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/falsifiability >

adequacy) এবং বর্ণনামূলক পর্যাপ্ততার মান (Descriptive adequacy) এগুলোর কোনোটাই ব্যাপকভাবে লেখা হয়নি।

১৯৮৩ সালে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সমস্যার সমাপ্তি সম্পর্কে ল্যারি লডেনের[১৮১] ঘোষণা ছিল এটিকে 'ছদ্মসমস্যা' (Pseudoproblem) হিসেবে আখ্যা দিয়ে। এই দার্শনিক গবেষণায় একটি বড় সমস্যাকে চিহ্নিত করেছিল। লডেন দেখেন, কোনটি বৈজ্ঞানিক, তার সীমা নির্ধারণে যথেষ্ট ও সন্তোষজনক মানদণ্ড নেই। কেননা প্রস্তাবিত প্রতিটি সংজ্ঞাই বিজ্ঞানের ভুল শ্রেণিবিভাগে রূপান্তরিত হয়। আর সেটা এভাবে যে, বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় সঠিক বিজ্ঞান বের হয়ে যায় অথবা অপবিজ্ঞান অনুপ্রবেশ করে। পূর্বের অর্থটি তার এই বক্তব্যে বেশ জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়—'এটি আমাদের নিকট বেশ সুস্পষ্ট যে, দর্শন উদ্দিষ্ট কল্যাণ অর্জনে ব্যাপকভাবে ব্যর্থ। অনেকটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, জ্ঞানের সংজ্ঞা বা তার ত্রুটিগুলো নির্ধারণের যে বিখ্যাত প্রচেষ্টা, নির্বিশেষে বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের অথবা বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের মাঝে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা পাওয়া যায় না। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দার্শনিকদের দ্বারা সমর্থিত।'[১৮২]

বৈজ্ঞানিক বিষয়ের একটিমাত্র সংজ্ঞা নির্ধারণের সম্ভাবনার যে দাবি উঠেছে, তা ফায়রাব্যান্ড মেনে নেননি। তিনি বলেন, 'যুক্তিবিদ্যা ও সাধারণ দর্শন যতই গ্রহণযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার এমন একটিমাত্র নিয়ম পাওয়া যায় না, যা একসময়ে বা অন্য সময়ে লঙ্ঘিত হয় না।'[১৮৩] কোনটি বৈজ্ঞানিক আর কোনটি অবৈজ্ঞানিক তা আলাদা করার জন্য কোনো একক স্থিতিশীল বা সর্বজনীন মাপকাঠি নেই। আর এ কথা বলেই নাস্তিক পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর স্ট্রেঞ্জার[১৮৪] সতর্ক করেছিলেন যে, 'বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের মাঝে পার্থক্যকরণে বিজ্ঞানের

---

১৮১. Larry Laudan (1941-) : মার্কিন বিজ্ঞান ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দার্শনিক। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

১৮২. Larry Laudan, The Demise of the Demarcation Problem, in Physics, Philosophy and Psychoanalysis: Essays in Honor of Adolf Grünbaum, eds. Robert S. Cohen & Larry Laudan (Boston: Springer Science & Business Media, 1983), pp.111-112

১৮৩. Paul Feyerabend, Science in a Free Society, London: Verso, 1987, p.98

১৮৪. Victor Stranger (১৯৩৫-২০১৪) : মার্কিন পদার্থবিদ ও দার্শনিক। নব্য নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনের প্রধানতম ব্যক্তি। ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে চরম বিদ্বেষী।

দার্শনিকদের মাঝে কোনো ঐকমত্য নেই। উপরন্তু বিজ্ঞানীরা অপবিজ্ঞান দেখলেই চিনতে পারেন।"[১৮৫]

বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক বিষয়াদির মাঝে পার্থক্য করার জন্য একটিমাত্র মানদণ্ড নির্ধারণের প্রচেষ্টা সুস্পষ্টভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ কারণে বিজ্ঞানের অনেক দার্শনিক এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পারস্পরিক সমর্থনকারী মানদণ্ডের বেশ কিছু তালিকা প্রস্তাব করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। যেমন : Langmuir, Gruenberger, Dutch, Bunge, Rander, Kitcher, Hansson, Grove, Thagard, Derkson, vollmer, Ruse, Manher.[১৮৬]

এই মানদণ্ডগুলোর সংখ্যাধিক্য বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের মাঝে পার্থক্য করার জন্য উদ্দিষ্ট সংজ্ঞায় দুর্বোধ্যতা উন্মোচন করবে।

বর্তমান সময়ে এসেও যদি আমরা সুস্পষ্টভাবে ও ত্রুটিমুক্তভাবে বিজ্ঞানের প্রকৃত অবস্থা ও তার সংজ্ঞাকে অপবিজ্ঞান থেকে পৃথক করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম না হই, তাহলে বিজ্ঞানবাদীরা কি এর ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শিক কাঠামো তৈরি করতে পারে, যার ভিত্তিই তাদের নিকট অজ্ঞাত!

বিজ্ঞান ও তার অবৈজ্ঞানিক অনুমান

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্ম। এটি পূর্বপ্রস্তুত কিছু বিশ্বাসের সাহায্য গ্রহণ করে। তার সূচনা অনস্তিত্ব থেকে নয় অথবা শূন্যের ওপর ভিত্তি করে নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা অনেক অবৈজ্ঞানিক প্রাথমিক অনুমানের ওপর নির্ভরশীল, যা আবিষ্কার বা তৈরির ব্যাপারে বিজ্ঞানের কোনো হাত নেই। যেহেতু তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির মূল, তার অংশ নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা তা ভালোভাবে পরীক্ষা করা পর্যন্ত কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল না। আর এই অনুমানগুলো প্রতিহত করা, তার সমালোচনা করা অথবা তার বিকল্প উপস্থাপনের

---

১৮৫. Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis. How Science Shows That God Does Not Exist (Amherst, NY: Prometheus Books, 2008), p.12

১৮৬. Hansson, Sven Ove, 'Science and Pseudo-Science, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta, ed </https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/pseudo-science>

প্রতিটি প্রচেষ্টা অবৈজ্ঞানিক দার্শনিক কর্মকাণ্ড। বরং এই অনুমানগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্ক করা অনেকটা অবৈজ্ঞানিক তর্কের অনুরূপ। এজন্যই দার্শনিক আব্রাহাম কাপলান[১৮৭] বলেছেন, 'বিজ্ঞান একবারে গোড়া থেকে শুরু করার কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র একটি জায়গা আছে যেখান থেকে আমরা শুরু করতে পারি, আর সে স্থানটি হলো যেখানে আমরা আছি। জ্ঞান কোনো কিছু থেকে অলৌকিক সৃষ্টি নয়। অথবা অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভবও নয়। যখন প্রাথমিক অনুমান (Presuppositions) যৌক্তিক বৈধতা ভঙ্গ করে তখনই আমরা সন্দেহে ডুবে থাকি।'[১৮৮]

অবৈজ্ঞানিক অনুমানগুলোর তালিকা বেশ দীর্ঘ ও বিভিন্ন রকমের, যার ওপর বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত; অথচ অবৈজ্ঞানিক অনুমানগুলো তার ভিত্তি হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত তা প্রমাণ করতে পারেনি। এমন ভিত্তিমূলক অবৈজ্ঞানিক অনুমানের কয়েকটি নিম্নরূপ :

- বাহ্য বিশ্বের অস্তিত্ব, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমাদের মস্তিষ্কের বাইরে একটি জগতের অস্তিত্ব দিয়ে শুরু হয়, বিজ্ঞান তার রীতিনীতি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারা সেই বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব প্রমাণের কোনো উপায় নেই। কেননা এটা সম্ভব নয় যে, আমরা প্রমাণাদিকে অস্বীকার করে বলব যে, আমরা কল্পনায় বাস করছি কিংবা এমন কেউ আছে, যে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করছে, যাতে আমরা বুঝি আমাদের ধারণার বাইরেও কিছু আছে। অতএব বিজ্ঞান আত্মজ্ঞানবাদের (Solipsism) মতবাদকে অস্বীকার করতে পারে না। যা বলে, আমাদের চিন্তাশীল মস্তিষ্কের অস্তিত্বেই কেবল সুনিশ্চিত জ্ঞান আছে, এর বাইরে সুনিশ্চিত জ্ঞানের কোনো অস্তিত্ব নেই। অথবা শেষ বৃহস্পতিবারের মতবাদ (Last Thursdayism)[১৮৯], যা বলে, মহাবিশ্ব

---

১৮৭. Abraham Kaplan (১৯১৮-১৯৯৩) : ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত। আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। যেমন মিশিগান ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮৮. Abraham Kaplan, The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science (Routledge, 2017), p.86

১৮৯. Last Thursdayism একটি দার্শনিক ধারণা, যা এলেমেন্টারি অথবা বিপরীতবাদী দর্শনলোর মধ্যে একটি। এটি এমন একটি মতবাদ যা বলে যে, পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব আসলে গত বৃহস্পতিবার (থার্সডে) সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমরা সকলেই এক ধরনের ভুল স্মৃতি

গত বৃহস্পতিবারে এমন কিছু বিষয়ের সাথে সৃষ্ট, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে, তা বিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্ট। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিশ্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কেননা ইন্দ্রিয় হচ্ছে এই বাহ্য বিশ্বেরই একটা অংশ। কোনো কিছুর সত্তা দ্বারা তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটি একটি চক্রের মতো।

এই তথ্য আপনাকে বিস্মিত করবে যে, পশ্চিমা চিন্তাবিদদের একটি দল অধিবিদ্যাগত বাস্তববাদকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ এই মতবাদ—মানব চিন্তার বাইরেও সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাহ্য বিশ্ব রয়েছে। এই আদর্শবাদীদের একজন হিলারি পাটনাম,[১১০] যিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, আমাদের অধিবিদ্যাগত বাস্তববাদকে অভ্যন্তরীণ বাস্তববাদ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা উচিত। অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গি—অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব ধারণাটি শুধু তত্ত্বের মাঝেই বৈধ, 'বাস্তব' বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর প্রয়োগে তার কোনো বৈধ সামঞ্জস্য নেই।[১১১]

- সমগ্র মহাবিশ্ব যৌক্তিক কাঠামোতে উপলব্ধি করার জন্য অনুমতি প্রদানের দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এটি এমন একটি দাবি, যা বিজ্ঞানের নাগালের সীমার মাঝে প্রমাণ করা যেতে পারে। তবে সমগ্র বিশ্বের কাছে এটিকে সাধারণীকরণ করা বিশ্বাসের বিষয়। যা বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের পক্ষে উপলব্ধি করার কোনো উপায় নেই।

- বিশ্বকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক সৎ। তা সত্যায়ন, প্রত্যাখ্যান অথবা সন্দেহের ব্যাপারে সততার আশ্রয় নেয়। কিন্তু কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দ্বারা মস্তিষ্কের সত্যবাদিতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এটিও একটি চক্রের মতো। কীভাবে একটি জিনিস তার নিজের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে? মস্তিষ্কের সঠিকতা বিজ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা বৈজ্ঞানিক যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক কিছু ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল। যেমনিভাবে উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্ভাবন এমন কতিপয় ক্রিয়াকলাপের প্রথম উৎস হচ্ছে মস্তিষ্ক।

বা ইতিহাস ধারণ করছি। গত বৃহস্পতিবারের আগে যা কিছু ঘটেছিল, তা একটি ভ্রান্তি (illusion)। কারণ সেদিন পৃথিবীর বয়স সম্পর্কিত সমস্ত প্রমাণ, মানব স্মৃতি ও শারীরিক রেকর্ডসহ সবকিছু নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল।

১১০. Hilary Putnam (১৯২৬-২০১৬) : মার্কিন দার্শনিক ও গণিতবিদ। বিশ্লেষণমূলক দর্শনের প্রধান ব্যক্তিদের মাঝে অন্যতম।

১১১. J. P. Moreland, Scientism and Secularism, p.58

- প্রতিবন্ধকতা না থাকলে বাহ্যিক বাস্তবতা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়সমূহ সৎ। আমরা ইন্দ্রিয়ের তথ্যকে গ্রহণ করি। কেননা তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমাদের কোনো প্রমাণ নেই। তবে এটা নিশ্চিত যে, ইন্দ্রিয়সমূহ বাস্তবতাকেই উপস্থাপন করে, যেমনিভাবে তার মূল হচ্ছে বিশ্বাস।
- বাস্তবতা এই বিশ্বেই রয়েছে, আমাদের কাজ হলো তা নিয়ে অনুসন্ধান করা। বিজ্ঞান এই বাস্তবতার অস্তিত্ব থেকেই শুরু হয় এবং এর অস্তিত্বের ব্যাপারে বিজ্ঞান পর্যালোচনার শুরুতে কোনো প্রকার সন্দেহও পোষণ করে না।
- মানুষের ভাষা সত্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সক্ষম। আর এই ভাষার নির্ভরযোগ্যতা বৈজ্ঞানিক ভাষা দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা এটিও চক্রের মতো।
- মানুষকে উপকারী জ্ঞান প্রদান করে মানবতার সেবা করা একটি প্রশংসনীয় বিষয়। এবং এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সবচেয়ে বড় প্রণোদনা, যা পরে আসে না।
- বস্তুর প্রকৃতির মাঝেই তার সৌন্দর্যের প্রকৃত রূপ লুক্কায়িত। বস্তুনিষ্ঠ সৌন্দর্য বৈজ্ঞানিক পরিমাপ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

> "আমার নিজেরও একটি বিশ্বাস রয়েছে। আমার বিশ্বাস হলো মহাজাগতিক রীতির সীমারেখার অধীনে মহাবিশ্বকে উপলব্ধি করা সম্ভব। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পক্ষেও সে সকল মহাজাগতিক রীতি ও বিশ্বকে উপলব্ধি করা সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি, এমন কিছুর প্রয়োজন নেই, যা সেই মহাজাগতিক রীতিগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য এটি প্রমাণ করার মতো যুক্তি আমার হাতে নেই।"[১৯২]
>
> —বিখ্যাত নাস্তিক আইজ্যাক অ্যাসিমভ[১৯৩]

অধিবিদ্যাগত অনুমানগুলো বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবৈজ্ঞানিক অনুমান। যেহেতু বিশ্বের কিছু জিনিসের কিছু ব্যাখ্যা বোঝার জন্য

---

১৯২. Isaac Asimov, Counting the Eons (London: Grafton Books Collins, 1965), p.10

১৯৩. Isaac Asimov (১৯২০-১৯৯২) : মার্কিন লেখক। তবে তার বংশ মূলত রাশান ইহুদি। জৈব রসায়নবিদ। তার প্রচুর রচনা, বিশেষত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জন্য সে প্রসিদ্ধ।

বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা সূচনালগ্নে আবশ্যিকভাবে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বের কিছু অধিবিদ্যাগত তত্ত্বের দ্বারা সজ্জিত হওয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। কেননা আপনি জগতের কোনো সুতাকে উপলব্ধি করতে পারবেন না, যদি তার বুননের সামগ্রিক অথবা আংশিক বাস্তবতার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকেন। সুতরাং একজন বিজ্ঞানী অধিবিদ্যাগত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। কেননা যদি সে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি পরিত্যাগ করে, তাহলে অবশ্যই অন্যটি গ্রহণ করতে হবে। কারণ কোনো ক্ষেত্র ছাড়াই মানুষের পক্ষে বিশ্বকে নিয়ে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়।

গভীর পর্যবেক্ষণকারীকে অবশ্যই এই অস্তিত্বের দিকে মনোযোগ দেওয়ার আগে একটি দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে হোক, অথবা অনুকরণের মাধ্যমে, গুরুত্বপূর্ণ অধিবিদ্যাগত প্রশ্নগুলোর উত্তরের ব্যাপারে তার একটি মত থাকতে হবে। অবচেতনে এর উপস্থিতি সম্পর্কে অবহেলা থেকে অথবা সচেতনতা থেকে।

অজ্ঞেয়বাদী পদার্থবিজ্ঞানী পল ডেভিস[১৯৪] বলেছেন, 'বিজ্ঞানী যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর একটি মৌলিক ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান অগ্রসর হতে পারবে না। এমনকি অধিকাংশ নাস্তিক বিজ্ঞানীরাও এই চিন্তাকে বিশ্বাস রূপে গ্রহণ করে। কেননা প্রাকৃতিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শৃঙ্খলার অস্তিত্বের ধারণা তুলনামূলক কম বুঝি আমরা। তার আংশিকটা আমাদের কাছে বোধগম্য, পুরোটা নয়।'[১৯৫]

> "অধিবিদ্যাগত ভিত্তি ছাড়া সকল বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়।"[১৯৬]
>
> –ব্রিটিশ দার্শনিক রজার ট্রিগ

আমরা যখন এটা জানতে পারলাম যে, গবেষণার নেপথ্যে অ-পরীক্ষামূলক কিছু বিশ্বাস রয়েছে, তখন আমাদের মনকে একটি জরুরি প্রশ্ন করতে হবে—

---

১৯৪. Paul Davies (১৯৪৬-) : প্রখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী ব্রিটিশ পদার্থবিদ। বেশ কিছু প্রসিদ্ধ পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বিজ্ঞান ও বিশ্বাস নিয়ে লেখালেখি করেন এমন পশ্চিমা লেখকদের মাঝে অন্যতম চিন্তাবিদ।

১৯৫. Cited in: Mitch Stokes, A Shot of Faith (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2012), p.134

১৯৬. Roger Trigg, Beyond Matter (Templeton Press, 2015), p.148

মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি কী, যা অবিসংবাদিতভাবে সেই অনুমানগুলোর সাথে মিলিত হয়, ধর্মীয় ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গি না-কি শুধুমাত্র বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি? অথবা এভাবে বলা যায়, এই অনুমানগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য সেরা মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি কী?

প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যা পরমাণু ও তাদের তুচ্ছ গতিবিধি ছাড়া অন্য কিছুকে চিনতে বাধ্য নয়। তার পক্ষে সম্ভব নয় যে, তা ব্যাখ্যা করবে অথবা বিশ্বাসের সাথে বাস্তবতা উপলব্ধকারী আকলকে মিলিত করবে। কেননা মস্তিষ্কের যান্ত্রিক কাজে বিবেকের সত্যবাদিতা অথবা ইন্দ্রিয়ের সত্যবাদিতা বোঝানোর কোনো নিশ্চয়তা নেই। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ নৈতিকতার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে না। বা চিন্তার অভ্যন্তরীণ কাজগুলো প্রকাশ করার ভাষার ক্ষমতাও ব্যাখ্যা করতে পারে না।

বিজ্ঞানবাদ যখন তার প্রথম অপ্রমাণীয় উৎসের সাথে তার শ্রেণিগুলোকে সামঞ্জস্য করতে ব্যর্থ হয় তখন তার সম্পূর্ণ ভিত্তি ধ্বসে পড়ে। কেননা ভবনের পিলার যদি ছাদের ভার বহন করতে না পারে, তাহলে ছাদ ধ্বসে পড়বেই।

> 'কোনো অন্তর বিশ্বাসহীন হতে পারে না। আবার কারণ ছাড়া কোনো বিশ্বাসও জন্ম নিতে পারে না।[১৯৭] কেননা কারণ আর বিশ্বাস হচ্ছে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরবিরোধী দেখা যায়, যখন অন্তরকে ইতিবাচকতার সংকীর্ণ অর্থে বোঝা হয় এবং বিশ্বাসকে বিশ্বস্ততার সংকীর্ণ অর্থে বোঝা হয়।'[১৯৮]
>
> –ব্রিটিশ লেখক আলব্যান ম্যাকয়

১৯৭. সঠিক বিশ্বাস, কাল্পনিক বিশ্বাস নয়।

১৯৮. Alban McCoy, An Intelligent Person's Guide to Catholicism (London; New York: Continuum, 2005), p 3

বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে বিভ্রান্তি

> 'বহু লোক কোনো জ্ঞান ছাড়া নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো (অন্যদের) বিভ্রান্ত করে বেড়ায়।' [সুরা আনআম, আয়াত ১১৯]

> বলা হয়, বিজ্ঞানের পূর্বপরিকল্পিত কোনো ধারণা নেই। কিন্তু এর মতো কোনো ভ্রান্ত দাবি আর পাওয়া যায় না। মানুষের মাঝে এই দাবির খুব বাজে মর্ম ছড়িয়ে আছে।'[১১৯]
>
> —পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক

বিজ্ঞানবাদীদের মতে বিজ্ঞান হচ্ছে একটি বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষী, যা বিভ্রান্ত হয় না এবং এটি কোনো আবেগিক প্রবণতা কিংবা কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয় না। যা জানার সে তা জানে; আর যা তার অজানা, তা যে জানে না, এটা সে উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রাকৃতিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে একটি তুলনীয় বিষয়। কেননা বিজ্ঞান নিরপেক্ষ তুলনার সীমা অতিক্রম করে না। তা ছাড়া লক্ষ্যহীন সেই তুলনা থেকেই প্রধান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো আবিষ্কৃত হয়, যা ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারে ও প্রাকৃতিক কাজের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। উল্লিখিত বিষয়াদি থেকে বোঝা গেল, বিজ্ঞান শুধু নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও স্বয়ংক্রিয় উদঘাটনের একটি মাধ্যম বৈ কিছুই নয়। সে আবিষ্কার করে, কিন্তু কোনো কিছু সৃষ্টি করে না; বিন্যস্ত করে, কিন্তু তৈরি করে না।

---

১১৯. Max Planck, The Philosophy of Physics (W.W. Norton, Incorporated, 1936), p.121

এগুলো শুধু অতি উৎসাহী দাবি, যা বিজ্ঞানবাদী কথায় পরিপূর্ণ। যা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায় যে, বিজ্ঞান বাস্তবতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সৎ একটি পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় :

- বৈজ্ঞানিক অনুশীলন কি অভ্যন্তরীণ পক্ষপাত থেকে মুক্ত?
- বৈজ্ঞানিক অনুশীলন কি বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত?
- বিজ্ঞানীদের দল কি সবসময় বাস্তবতার নির্দেশনা মেনে চলেছে না-কি কখনো মতাদর্শগত কারণে বাস্তবতার নির্দেশনা থেকে সরে গিয়েছে?

উদ্দেশ্য ও প্রভাবক থেকে মুক্তি

বিংশ শতাব্দীতে যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো সামনে আসা শুরু হলো, যা আমাদের মহাবিশ্বকে অভূতপূর্ব কল্যাণ অর্জনে উদ্ভাবনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সাথে আরও প্রশস্ত ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে তুলে ধরল, তখনই দৃষ্টির সম্মোহনে বিজ্ঞানের আকর্ষণ শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর পুরোটা সময়েই জনপ্রিয় এই প্রত্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বিজ্ঞানের সত্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবতা বোঝার এবং এটিকে তার আসল রূপে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে সততার প্রমাণ। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নব্য নাস্তিক্যবাদের অনুসারীদের সহযোগিতায় বিজ্ঞান দৃঢ়ভাবে এই অবস্থান গ্রহণ করেছে যে, এটিই জ্ঞানের একমাত্র সত্য মাপকাঠি, অথবা জ্ঞানের বাকি উৎসগুলোকে বিচার করার মাপকাঠি। কেননা বিজ্ঞান আমাদের নতুন নতুন বিশ্বের সন্ধান দিয়েছে এবং এমন অনেক মন্দ বিষয়ের অবসান ঘটিয়েছে, যা বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

এই দুই শতাব্দীতে বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধতম জ্ঞানের প্রবেশদ্বার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। কেননা তা নিরপেক্ষ ও কার্যকর। তা মতাদর্শগত হস্তক্ষেপের বিরোধী। বিজ্ঞানী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি প্রাকৃতিক জগৎ থেকে বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করেন। তারপর সেগুলো একটি প্রাকৃতিক নিয়মে একীভূত করেন। এটা ছাড়া তার অন্য কোনো কাজ নেই। সুতরাং বিজ্ঞান একটি স্বয়ংক্রিয় কর্মপদ্ধতি, তা বক্রতা ও অসমতা ব্যতীত নিরাপদ ও সরল পথে পরিচালিত হয়।

এখানে বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতার উদ্দেশ্য হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও তার ফলগুলোকে মেজাজ বা প্রবৃত্তি, আদর্শিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক হস্তক্ষেপ

থেকে মুক্ত রাখা। বা এমন প্রতিটি প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখা, যা একটি নির্দিষ্ট চিত্রে অস্তিত্ব গঠন করে অথবা এটিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের অধীনে বিষয়টি বিদ্যমান। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সকলের জন্য তার উপলব্ধি একই। এজন্য সকল বিজ্ঞানী ও তাদের অধ্যয়নের বিষয়বস্তুর মাঝে ব্যবধানও একই। কোনো প্রতিবন্ধকতা তাতে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না অথবা দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় তা পৃথক হয় না। এভাবেই গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকের পরিচয়, তার শেকড় ও আবেগগুলো হারিয়ে যায়। অধ্যয়নরত বিষয়টি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এভাবেও বলা যায়, আদর্শিক বস্তুনিষ্ঠতার ভিত্তি তিনটি দাবির ওপরে :

১. সরাসরি পর্যবেক্ষণ ব্যতীত পর্যবেক্ষিত বস্তুর অস্তিত্ব। ২. সকল বিষয় ধারণের উপযোগী বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব। ৩. একটি বিস্তৃত বাস্তবতার অস্তিত্ব, যা উপলব্ধি করা সম্ভব।[২০০]

বিংশ শতাব্দীর সুদীর্ঘ সময় ধরে এই বস্তুনিষ্ঠতার বাস্তবতার সমালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এর দার্শনিক বিতর্কটি সেই স্বপ্নময় রূপকথার সমালোচনায় সমাপ্ত হয়েছে। 'স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোসোফি'-তে বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ যার ওপর বিজ্ঞানের দর্শনের ভিত্তি সেই বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সূক্ষ্ম অধ্যয়নে উঠে এসেছে যে, বস্তুনিষ্ঠতার আদর্শের বেশ কিছু ধারণা হয়তো সন্দেহযুক্ত অথবা বাস্তবে সেখানে কিছুতেই পৌঁছানো যাবে না।'[২০১]

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বিজ্ঞানের মহান দার্শনিকদের অধ্যয়ন যেমন : টমাস কুন, ফায়রাব্যান্ড ও নরউড হ্যানসন[২০২] তাদের 'তত্ত্ব ভার' (theory laden) নিয়ে

---

২০০. আবদুল ওয়াহহাব আল মাসিরি, ফিকহুত তাহাইয়ুয, সম্পাদনা : ইশকালিয়্যাতুত তাহাইয়ুয (আল মাহাদুল আলামিয়্যু লিল ফিকরিল ইসলামি, ১৪১৭ হিজরি, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ৯৭

২০১. Julian Reiss and Jan Sprenger, 'Scientific Objectivity: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition). Edward N. Zalta, ed </https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/scientific-objectivity>

২০২. Norwood Russell Hanson (1924-1967) : মার্কিন বিজ্ঞানের দার্শনিক। তার বিখ্যাত বই Patterns of Discovery-তে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বিশ্বকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে আমাদের মনে প্রোথিত প্রাথমিক কিছু দৃষ্টিভঙ্গির অনুগত।

আলোচনায় পজিটিভিজম মতবাদ যে কঠোর বস্তুনিষ্ঠতার চিত্র অঙ্কন করে, তার দৃঢ়তার ধোঁকা ম্লান হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো উল্লেখ করেছেন। এতে উঠে এসেছে যে, প্রত্যেক বিজ্ঞানী যখন তার গবেষণা শুরু করেন তখন তিনি তাত্ত্বিক অনুমানের এক বড় অংশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন। যেগুলোর অধীনে তিনি তার গবেষণা শুরু করেন। সাধারণত তিনি প্রথমেই সেগুলো পরীক্ষা করে দেখার সাহস করেন না। অথবা প্রাথমিকভাবে তিনি এগুলো নিয়ে চিন্তা করেন না।

বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের দিকে কেউ গভীরভাবে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিটি কাজের সকল উপসর্গ দ্বারাই প্রভাবিত হয়। কেননা এই কর্মের কর্তাও একজন মানুষ। সাধারণ মানুষের নিকট যেমন বিভিন্ন অবস্থা আসে, তার নিকট তেমনি। তা ছাড়া বিজ্ঞানীর গবেষণা এমন বেশ কিছু কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা কঠোর প্রযুক্তিগত কাজের অংশ নয়। তার 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা' তার সততা ও সত্যের প্রতি আন্তরিকতা দ্বারা, তার বুদ্ধিমত্তা ও গবেষণার সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করার দক্ষতা দ্বারা অথবা খ্যাতি অর্জন ও প্রয়োজনীয় আবিষ্কারে উপনীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, একাডেমিক জগৎ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বাণিজ্য ও বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এমনিভাবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কাজ করেন তার সুনাম দ্বারা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস দ্বারা, তার অতীত সাফল্য ও ব্যর্থতা দ্বারা এবং (তারও আগে) গবেষণার পূর্বেকার কিছু প্রত্যয় দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভাবিত।

এ ব্যাপারে স্টিফেন জে গৌল্ড এক আলোচনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন, আমি ওই সকল রূপকথার বিরোধিতা করি, যা বলে 'বিজ্ঞান একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রকল্প, বিজ্ঞানীদেরকে তাদের সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়ে, এবং মহাবিশ্বকে তার বাস্তবতা অনুযায়ী অবলোকন করে যা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।' আমি বিশ্বাস করি, বিজ্ঞানকে অবশ্যই একটি সামাজিক ঘটনা, একটি আলোড়নপূর্ণ মানব প্রকল্প হিসেবে দেখা উচিত; তা বিশুদ্ধ তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রোগ্রাম করা রোবটের কার্য নয়। প্রকৃত অবস্থা কতক বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল তথ্য নয়। কেননা আমরা যা দেখি ও যেভাবে দেখি তাতেও সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। উপরন্তু তত্ত্বগুলো বাস্তবের অপরিবর্তনীয় আরোহ নয়। সবচেয়ে সৃজনশীল তত্ত্বগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবতার ওপরে আরোপিত কল্পনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি। কল্পনার উৎসও দৃঢ়ভাবে সাংস্কৃতিক। যদিও এই কথাগুলো

অনেক বিজ্ঞান চর্চাকারী বিজ্ঞানীদের নিকট বিদ্বেষপূর্ণ মনে হয়, তবুও আমি মনে করি, এটি প্রায় সকল বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদদের নিকট শীঘ্রই গ্রহণযোগ্য হবে।[১০৩]

বিজ্ঞানবাদীদের এই পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি অস্বীকার করা অনেকটা এমন পক্ষপাত, যা দাবি করে, সংজ্ঞার এটা স্বীকার করা উচিত যে, 'অস্তিত্বের বুনন শুধুমাত্র অণুসমূহ। এটির মর্ম উদ্ধার করা ও বোঝার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক। স্থান কাল পাত্র ভেদে এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। সুতরাং পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক। এ ব্যাপারে এটি কোনো দ্বিমত গ্রহণ করে না। যে বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে তা সহজ, জটিল নয়। পর্যবেক্ষণের উপকরণগুলো গবেষণাগার।' এসবই সুস্পষ্ট পক্ষাবলম্বন। কেননা তা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অনেকগুলো পছন্দ থেকে একটি পছন্দ গ্রহণ করে।

বিজ্ঞানী তার তত্ত্বকে শূন্যের ওপর গড়ে তোলে না। তার ভিত্তি অনস্তিত্বের ওপর নয় যে, শূন্যতার ওপর তা ঝুলিয়ে রাখবে। বরং বিজ্ঞানী তার তত্ত্বকে মাটিতে স্থিতিশীল ভিত্তির ওপর স্থাপন করে। তারপর সেটিকে সৃষ্টি করার পূর্বে অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে।

দার্শনিক টমাস নেইগলের ভাষায় বিজ্ঞানে শূন্য থেকে কোনো তত্ত্বের স্থান নেই। অন্যদের মতো বিজ্ঞানীও একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে দেখে। কেননা বাস্তবে সে নিজেও ঐতিহাসিকভাবে, ভৌগলিকভাবে এবং নৈতিক ও সামাজিক বন্ধনের একটি সীমারেখায় আবদ্ধ।। তাই আবশ্যিকভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গি একটি ব্যাখ্যামূলক কাঠামোর প্রতি অনুগত হয়ে থাকে। যা তার সীমারেখা ও চলার পথ নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি তারও পূর্বে এর অনুমানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সকল দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত ও বিকৃত হচ্ছে। কেননা তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই এ কথা বলা অতিরঞ্জন হবে। তবে ধ্রুব সত্য হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রচুর। এগুলো প্রায়ই বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের বিকাশকে প্রভাবিত করে।

একজন বিজ্ঞানী তার সমসাময়িক তত্ত্বগুলোর বাইরে গিয়ে নিজের কর্তৃত্বে কাজ করে না। বরং সে সবসময় এই তত্ত্বগুলোর অধীনেই নিজ কার্যক্রম শুরু করে। এই তত্ত্বগুলো তার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়। এটিই সেই প্রশ্নগুলো

---

১০৩. Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man (W. W. Norton & Company, 1996), pp 53-54

নির্ধারণ করে দেয়, যা প্রত্যাখ্যান করা তার পক্ষে সম্ভব এবং সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট নির্ধারণ করে দেয়, যা দ্বারা সে প্রমাণ উপস্থাপন করবে। এই ফ্যাক্টগুলো অধ্যয়ন করার পন্থা এবং তা ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিও নির্ধারণ করে দেয়। অতীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর স্থায়িত্বের অনুমান থেকে বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম শুরু করতেন এবং ভূতত্ত্ববিদরা মহাদেশীয় প্লেটের স্থায়িত্বের অনুমান থেকে শুরু করতেন। আজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের সকল কিছুর গতিবিধি থেকে বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম শুরু করে ও ভূতত্ত্ববিদরা মহাদেশীয় প্লেটের গতিবিধি থেকে শুরু করে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনুমান ও ধারণায় যুগের সংস্কৃতির কর্তৃত্ব ব্যাখ্যা করার আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তর করার সম্ভাবনার বিষয়টি। বহু শতাব্দী ধরেই অনেক বিজ্ঞানীদের মাথায় এ সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা ছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায় ও পরমাণুর ধারণার বিকাশের সাথে এ সমস্যায় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছিল। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক[২০৪] বলেন, 'আমরা একটি অর্থপূর্ণ তত্ত্ব ছাড়া অর্থপূর্ণ উত্তর পাই না। এটা বিশ্বাস করা উচিত নয় যে, তত্ত্বকে উল্লেখ না করেই কোনো প্রশ্নের কোনো অর্থ আছে কি না–তা বিচার করা পদার্থবিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব। বরং প্রায়শই কোনো প্রশ্নের কোনো একটি নির্দিষ্ট তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থ থাকে এবং তারপর অন্য তত্ত্বের কাঠামোর মাঝে তা হারিয়ে যায়। এভাবেই ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তার সমর্থনে প্রশ্নটির তাৎপর্য ও অর্থ নির্ভরশীল ও সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ আমরা পারদের মতো সস্তা ধাতুকে সোনায় রূপান্তর করার বিষয়টি উল্লেখ করি। সেমিওটিক্স ছড়িয়ে পড়ার যুগে সমস্যাটি গভীর অর্থপূর্ণ ছিল। তবে পরমাণুর রাসায়নিক তত্ত্বের আবির্ভাবের সাথে এবং যা প্রতিটি পরমাণুকে একটি স্থির উপাদান দ্বারা গঠিত ও অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত হতে অক্ষম বলে মনে করে তা প্রকাশিত হলে, এখন সেই সমস্যাটি অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াটাও অর্থহীন ও অযৌক্তিক। বর্তমান সময়ে পদার্থবিজ্ঞান পরমাণুর বোর মডেল[২০৫] গ্রহণ করার

---

২০৪. Max Planck (১৮৫৮-১৯৪৭) : জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। ১৯১৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছিলেন। তাকে কোয়ান্টাম থিওরির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। 'ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সোসাইটি' নামে জার্মান বিজ্ঞানসংস্থার একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়।

২০৫. বোর মডেল (Bohr Model) হলো একটি পারমাণবিক মডেল, যা ডেনিশ বিজ্ঞানী নিলস বোর ১৯১৩ সালে প্রস্তাব করেন। এটি বিশেষত পরমাণু তত্ত্বের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং বিশেষ করে হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য এটি একটি মৌলিক মডেল হিসেবে কাজ করেছে।

পরে যা বলে, সোনার পরমাণু ও পারদের পরমাণুতে পার্থক্য শুধু একটি ইলেকট্রনের অভাব, এখন এই ইস্যুতে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে।'[২০৬]

বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিটি যুগেই বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার মাঝে বিচরণ করে অথবা তার সচেতন পথ নির্দেশ করার জন্য এই সবগুলো প্রকারের কর্তৃত্বের অধীনে থাকে। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, তা পশ্চিম থেকে পূর্বে এখন থেকে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অ্যারিস্টটল ও গ্যালানের কর্তৃত্বের কাছে তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। যেমনিভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানও বাইবেল ও টলেমিতে জেনেসিসের প্রথম দুটি অধ্যায়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাজাগতিক ধারণার কাছে বন্দি হয়ে ছিল।

বর্তমান সময়ে জীববিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গবেষণা রসায়ন ও জীবাশ্ম (fossil) বিদ্যায় ডারউইনবাদীদের কর্তৃত্বের অধীন। তার বিপক্ষের প্রতিটি মতকেই তার বৈজ্ঞানিক মূল্য বিবেচনা না করেই প্রতিহত করে চলেছে। এমনকি বিখ্যাত জৈব রসায়নবিদ জেমস ট্যুর বর্তমান সময়ে বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে আমি সে সকল বিজ্ঞানীদের প্রতি অন্যায় আচরণ দেখেছি, যারা ম্যাক্রো বিবর্তনের প্রমাণ গ্রহণ করেন না এবং ডারউইনবাদের সমালোচনা সংক্রান্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে। আমি কখনোই এটা ভাবতে পারিনি যে, এভাবে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতে পারে। স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য আমার শেষ পরামর্শ ছিল বেশ স্পষ্ট ও সরল। যদি তুমি ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের ব্যাপারে সচেতন হও এবং ডারউইনের তত্ত্বের সাথে একমত না হও, তাহলে তুমি তা থেকে নিজেকে সংযত রেখো।'[২০৭]

ডারউইনবাদীরা এখনো তাদের সেই তত্ত্ব আঁকড়ে ধরে আছে, যা যুগের অনুসন্ধানের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাবারের মতো হয়ে গেছে। এই তত্ত্বটি তাদের নিকট খুব বেশি গ্রহণীয়। কেননা ধর্মীয় ব্যাখ্যা তাদের কাছে খুব দৃঢ়ভাবে নিন্দনীয়। ডেভিড ওয়াটসনের[২০৮] বিবৃতিতে এটি বেশ দৃঢ়ভাবে উঠে এসেছে, বিবর্তন প্রাণীবিজ্ঞানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য এ কারণে নয় যে, তা

---

২০৬. সালেম ইয়াফুত, সামসময়িক বিজ্ঞানের দর্শন ও বাস্তবতার অনুধাবন, পৃষ্ঠা ১৪৪

২০৭. James M Tour, Origin of Life, Intelligent Design, Evolution, Creation and Faith </https://www.jmtour.com/personal-topics/evolution-creation>

২০৮. David Meredith Seares Watson (1886-1973) : লন্ডনে ইউনিভার্সিটি কলেজে জীববিজ্ঞান ও তুলনামূলক ব্যাখ্যার শিক্ষক।

ঘটা প্রত্যক্ষ করা গেছে অথবা এটি সুসংগত ও যৌক্তিকভাবে প্রমাণিত করা সম্ভব হয়েছে যে এটি সঠিক; বরং এজন্য যে, তার একমাত্র বিকল্প হচ্ছে ঐশী সৃষ্টির বক্তব্য, যা সত্যায়ন করা সম্ভব নয়।[২০৯]

ডারউইনবাদের অনেক অধ্যায়েই জীবজগতের নকশা বা বিকাশের যে চিত্র রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, বস্তুবাদী আদর্শের প্রতি আনুগত্যের জন্য ডারউইনবাদের এই দুঃসাহসিকতা প্রমাণহীন বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে আরেকটি হাস্যকর উদাহরণ হলো আণবিক ও রূপগত প্রমাণ বলে, 'নিউ ওয়ার্ল্ড প্লাটিরাইন' বানররা আফ্রিকান বানর 'ওল্ড ওয়ার্ল্ড প্লাটিরাইন' এর বংশধর। জীবাশ্মগুলো দেখায় যে, প্রায় ৩০ মিলিয়ন বছর আগে প্লাটিরাইনগুলো দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাস করত। কিন্তু প্লেট টেকটোনিক্স দেখায় আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রায় ১০০-১২০ মিলিয়ন বছর আগে একে অপর থেকে পৃথক হয়েছিল। যদি দক্ষিণ আমেরিকার বানরগুলো প্রায় ৩০ মিলিয়ন বছর আগে আফ্রিকান বানরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে বিবর্তনবাদীদের উচিত আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো, কীভাবে বানরগুলো আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় কমপক্ষে ২৬০০ কিলোমিটার জলপথ অতিক্রম করেছিল? বিবর্তনবাদীরা এখানে বিবর্তনীয় ব্যাখ্যার সংকটকে মেনে নিয়েছে এবং এটিকে বিভ্রান্তিকর হিসেবে বিবেচনা করেছে।[২১০]

তবে তারা কল্পনাপ্রসূত অন্য একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। তারা বানর ও সমস্ত প্রাণীর সাধারণ বংশধরের অনুমান নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস করেনি। তারা একটি হাইপোথিসিস দিয়েছে যে, বানররা নতুন বিশ্বে বসবাস করার জন্য আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে এসেছিল। এবং এখানে উল্লেখ্য যে, নতুন মহাদেশে প্রজনন চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর বানর থাকতে হবে।[২১১]

---

২০৯. John C. Lennox God's Undertaker: Has Science buried God? (Lion Hudson plc 2009), p.97

২১০. John G. Fleagle and Christopher C. Gilbert. The Biogeography of Primate Evolution: The Role of Plate Tectonics, Climate, and Chance: in Primate Biogeography: Progress and Prospects, eds. Shawn M. Lehman and John G Fleagle (New York: Springer, 2006), 393-394

২১১. Fleagle and Gilbert, 'Biogeography of Primate Evolution: 394

বিবর্তনবাদীদের সমস্যাগুলোর মাঝে আরেকটি হলো স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মাঝে দুধ উৎপাদনকারী লালাগ্রন্থির অস্তিত্বের ব্যাখ্যার সংকট। এখানে যা বলা হয়েছে তার মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত, যা বিবর্তনীয় ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা হচ্ছে, 'শীতল অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু সরীসৃপ তাদের শরীর উষ্ণ রাখার জন্য একটি পদ্ধতি ডেভেলপ করা শুরু করে। তাই তাদের খোলস চামড়ায় পরিণত হওয়া শুরু করে। তাদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য তা ঘর্মাক্ত হওয়া প্রয়োজন হয়। বাচ্চা সরীসৃপগুলো যখন পুষ্টি পাওয়ার জন্য মায়ের ঘাম চাটতে শুরু করে তখন কিছু ঘামগ্রন্থি আরও পুষ্ট খাদ্যজাতীয় বস্তু নিঃসরণ করা শুরু করে, যা শেষপর্যন্ত দুধে পরিণত হয়।[৩২]

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর মতাদর্শগত বিশ্বাসের কর্তৃত্ব স্থাপনের আরেকটি বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে, ১৯৮৩ সালে স্নায়ুবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন লিবেট (Benjamin Libet)-এর পরীক্ষা, যা এটা আবিষ্কারের দাবি করে যে, ব্যক্তি নিজ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পূর্বেই মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এটি এই কথাকে সমর্থন করে যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা একটি স্পষ্ট প্রবঞ্চনা। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য গবেষণায় বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই ফলাফলটি আরও সুনিশ্চিত হয়েছে।

অসংখ্য সমালোচনামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশ করেছে যে, ইচ্ছার স্বাধীনতার ধারণা ভুল। আদর্শগত পক্ষপাতের ওপর ভিত্তি করে এই দাবিটি আধুনিক প্রকৃতিবাদী ও নাস্তিকদের নিকট বিখ্যাত। যেহেতু লিবেট ও অন্যদের পরীক্ষা যা বলা হয়েছে তা নির্দেশ করে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যে ক্রিয়াকলাপটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করা হয়ে গিয়েছে, যদিও ব্যক্তিটি পরে সিদ্ধান্ত না নেয়। এমনকি একটি সিদ্ধান্তের পরে পরীক্ষার উপস্থিতি ছাড়াই তা হয়। লিবেটের অভিজ্ঞতা সমর্থনের দাবি করা ও নিয়তিবাদের সমর্থনে এর সমস্ত ত্রুটির (কারণ এটি ও স্বাধীন ইচ্ছার মাঝে কোনো সংযোগ নেই) পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এটি এখনো একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিজয় হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, যা ধর্মীয় লোকদের ভ্রান্তিকে বাতিল করে, যারা এই সত্যকে আঁকড়ে ধরে যে, একজন ব্যক্তি ইচ্ছার ফল অনুসারে পুরস্কৃত হবে।

---

৩২. George Gamow, Martynas Ycas, Mr. Tompkins Inside Himself, Adventures in the New Biology (New York The Viking Press, 1967). p. 149

বিজ্ঞানবাদীদের নিকট জ্ঞানীয় ইচ্ছার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এমনকি ডকিন্স এটি স্বীকার করেছেন যে, তার নাস্তিকতার মৌলিক ধারণাটি একটি অদৃশ্য বিষয়, যার কোনো প্রমাণ নেই। অনলাইন ম্যাগাজিন 'Edge The World Question Centre' ২০০৫ সালে বিপুল সংখ্যক চিন্তাবিদদের সাথে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'এমন কোন জিনিস আছে যার সঠিকতা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না, কিন্তু তবুও আপনি তা সত্য মনে করেন?' ডকিন্সের উত্তর ছিল, 'আমি বিশ্বাস করি, মহাবিশ্বের প্রতিটি স্থানে সমস্ত প্রাণ, বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা ও নকশা ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব। এই অনুসারে ডারউইনীয় বিবর্তনের একটি সময় পরে নকশাটি মহাবিশ্বে আসে। নকশা বিবর্তনের আগে হতে পারে না, তাই তা মহাবিশ্বের বাইরে গোপন থাকতে পারে না।'[১৩৩] (অথচ এ দাবির পক্ষে তার নিকট কোনো প্রমাণ নেই।)

> প্রতিটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কোনো একটি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। এটি শূন্য থেকে আগত নয়।

নাস্তিক দার্শনিক নেইগল তার ধর্মহীন বন্ধুবান্ধবদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার অধ্যবসায়ে ধর্মের ভয়ের কথা উল্লেখ করেছে। এমনকি সে নিজেই স্বীকার করেছে, তার চিন্তাচেতনার ওপর নাস্তিক্য ভাবধারার কর্তৃত্ব রয়েছে। তার ভাষ্যমতে 'আমি এখানে অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, এই ভয়ের তীব্রতায় আমি নিজেই বেশ ভীত, আমার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ বাস্তব হোক। আমি এই বাস্তবতায় উদ্বিগ্ন যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ব্যক্তিদের মাঝে অধিকাংশই ধর্মে বিশ্বাসী। ব্যাপারটা শুধু এতটুকু নয় যে, আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না। উপরন্তু আমি আশা করি আমি আমার এই বিশ্বাসের ব্যাপারে সঠিক। আমি মনে করি কোনো ইলাহ নেই। আমি চাই না পৃথিবীটা ধর্মনিষ্ঠ হোক, আমি বিশ্বাস করি মহাজাগতিক কর্তৃত্বের প্রতিটি সমস্যা একটি বিরল ঘটনা নয়। আমার মতে এটি আমাদের সময়ে বিজ্ঞানবাদ ও খণ্ডতাবাদের জন্য দায়ী।

---

১৩৩. I believe that all life, all intelligence, all creativity and all design anywhere in the universe, is the direct or indirect product of Darwinian natural selection. It follows that design comes late in the universe, after a period of Darwinian evolution. Design cannot precede evolution and therefore cannot underlie the universe.

ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের সমর্থিত আরেকটি প্রবণতা হচ্ছে, মানব মনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু এবং মানুষ ও জীবন সম্পর্কে সবকিছু ব্যাখ্যা করার জন্য বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের অত্যধিক ব্যবহার, আর এটা খুব বেশি হাস্যকর।'[২১৪]

এই নাস্তিক্য ভাবধারা নাস্তিকদের শুধু তাদের বৈজ্ঞানিক বিতর্কে পরিচালিত করে না, বরং তাদের দার্শনিক বিতর্কেও কর্তৃত্ব ফলায়। দার্শনিক মাইকেল রস অদ্ভুত সংকটের দর্শনে বলেছেন, 'তিনি নিজেই এটা দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন, যেন তা ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হতে পারে, এখন ধর্মের দর্শনে নিযুক্ত কিছু কমিটিতে বিশ্বাস করা হয় যে, আমরা নাস্তিক্য মন্দের যুক্তি খণ্ডাতে পারি। কিন্তু আমি মনে করি তা সঠিক নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমি বলি, এটা সত্য হওয়া আমি চাই না।[২১৫]

যেমনভাবে এই নাস্তিক্য ভাবধারা বিজ্ঞানবাদী চিন্তার ইচ্ছাপ্রসূত দিকটি প্রকাশ করে, যেখানে বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যাকে জীববিজ্ঞানের বাইরের ক্ষেত্রেও প্রবিষ্ট করানো হয়, যদিও ডারউইনীয় ব্যাখ্যা নিজেই জীববিজ্ঞানের জগতে জীবসংক্রান্ত ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। এটি সেই জটিলতার ঘটনাগুলোর সামনে অকার্যকর হয়ে পড়ে, যেগুলো সরলীকরণযোগ্য নয়, এবং ধারাবাহিক সৃষ্টিগত বিস্ফোরণগুলোর বিপরীতে অবস্থান করে, যা জীবের বিবর্তনের ধীরগতির পরিবর্তনের শর্ত (Gradualism)-এর বিরোধিতা করে।

জীববিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে যারা বিবর্তনীয় ব্যাখ্যাকে অযৌক্তিকভাবে সন্নিবেশিত করেছে তাদের মাঝে অন্যতম একজন হচ্ছেন বিখ্যাত পদার্থবিদ লি স্মোলিন।[২১৬] তিনি তার থিস্থি অব দ্যা প্লানেট গ্রন্থে এই কাজ করেছেন। তিনি মাল্টিভার্স মডেলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি প্রয়োগ করেছিলেন। কেননা এই দাবির সাথে ব্ল্যাক হোলগুলো নতুন মহাবিশ্ব তৈরি করে এবং মহাবিশ্বের ভৌত নিয়মগুলো এরপর নতুন ব্ল্যাক হোলের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। বর্তমান বিশ্বে জীবনের প্রকৃতি এই মহাবিশ্ব টিকে থাকা মনোনীত করার সম্ভাবনা নির্ধারণ করে দেয়। এখানে সমস্যা

---

২১৪. Thomas Nagel, The Last Word (Oxford: Oxford University Press. 2009), pp. 130-131

২১৫. Interview with Michael Ruse. Gary Gutting. Does Evolution Explain Religious Beliefs? The Stone. The New York Times. July 8, 2014

২১৬. Lee Smoline (1955-) : Perimeter Institute for Theoretical Physics এর পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক। কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও কসমোলজিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য রয়েছে।

হলো একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্ব প্রমাণ ছাড়া শুধু কল্পনা। ব্ল্যাক হোল নতুন মহাবিশ্ব তৈরি করতে পারে তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়। আর পদার্থবিজ্ঞানের জগতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পদ্ধতির কোনো যথার্থ প্রমাণ নেই।

বিজ্ঞানের ওপর আইডিওলোজির কর্তৃত্বের আরেকটি চিত্র হচ্ছে নাৎসি। জার্মানিতে সে সময়কার পদার্থবিজ্ঞানের অনেক ধারণাকে নিন্দিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, যেহেতু তার সাথে ইহুদিদের সম্পৃক্ততা ছিল। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে জীববিজ্ঞানী নিকোলাই ভ্যাভিলভকে আমৃত্যু সাজা দেওয়া হয়েছিল (তিনি অনাহারে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন)। কারণ তার জেনেটিক উত্তরাধিকারের তত্ত্ব মার্কসবাদ ও লেলিনবাদের আদর্শের বিরোধিতা করত।[২১৭]

সম্ভবত মহাবিশ্বকে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে নকল মতাদর্শের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রভাব হলো বিগ ব্যাং থিওরির ওপর পদার্থবিদদের অবস্থান। যা দ্বারা বোঝা যায়, আমাদের মহাবিশ্বের একটি সূচনা রয়েছে এবং এটি চিরন্তন নয়। মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী রবার্ট জ্যাস্ট্রো[২১৮] তার 'গড এন্ড এস্ট্রোনমারস' বইতে অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও কসমোলজিস্টের সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন, যারা বিগ ব্যাং তত্ত্বকে নিজ ধর্মতাত্ত্বিক প্রভাবের কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমনকি অ্যালেন স্যান্ডেজ, যিনি আধুনিক পর্যবেক্ষণমূলক কসমোলজির অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত, তিনি বলেছেন, এটি একটি অদ্ভুত ফলাফল, যা সঠিক হতে পারে না।[২১৯] ব্রিটিশ বস্তুবাদী কসমোলজিস্ট ও গণিতবিদ আর্থার এডিংটন এই আবিষ্কারের ফলে খুব বেশি বিস্মিত হন। তিনি বলেছিলেন, 'মহাবিশ্বের উৎপত্তি দার্শনিক দিক থেকে জটিলতাপূর্ণ।[২২০] এবং এটি প্রকাশ করে যে, তার সূচনা এমন জটিলতা

---

২১৭. Stanford Encyclopedia of Philosophy </https://plato.stanford.edu/entries/scientific-objectivity> বাহ্য বিচারে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তচরবৃত্তির অপবাদ দেওয়া হয়েছিল।

২১৮. Robert Jastrow (১৯২৫-২০০৮) : মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও বিংশ শতাব্দীতে নাসার অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী।

২১৯. Robert Jastrow, God and the Astronomers (Toronto: George J. McLeod, 1992), p.133

২২০. Arthur S. Eddington On the Instability of Einstein's Spherical World in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 90, (1930). pp. 668-678

উপস্থাপন করে, যা আনুগত্যে আনা যায় না। তবে আমরা যদি অতিপ্রাকৃত কিছুর মতো এটির দিকে পরিপূর্ণ খোলামেলাভাবে পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে একমত হই, তাহলে ভিন্ন কথা।'[২২১]

পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী নাস্তিক পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়াইনবার্গ[২২২] দোলন তত্ত্বের[২২৩] প্রতি কসমোলজিস্টদের ঝোঁক সম্পর্কে (বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দোলন তত্ত্বের দুর্বলতা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) বলেন, 'কিছু মহাজাগতিক বিজ্ঞানী দার্শনিকভাবে দোলন মডেলের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। যেহেতু এটি স্থির স্থিতিশীল মডেলের মতো, যা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসার সমস্যাকে বেশ সুন্দরভাবে উতরে যায়। তবে দোলন মডেল একটি গুরতর তাত্ত্বিক জটিলতার সম্মুখীন হয়।[২২৪]

গবেষক মারা বেলার, যিনি বিজ্ঞানের দর্শনে (পদার্থবিদ্যা) বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তিনিও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ওপর কোপেনহেগেন স্কুলের কর্তৃত্ব সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে কথা বলেছেন। অথচ বিগত কয়েক যুগ ধরে কোপেনহেগেন স্কুলের কর্তৃত্বের ফলাফল অদ্ভুত। তা ছাড়া অকাট্য প্রমাণ দ্বারা কোপেনহেগেন স্কুলের কর্তৃত্ব সমর্থিতও নয়, এমনকি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বৈধ নয়, তবুও...।[২২৫]

ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর নির্দিষ্ট আদর্শিক অবস্থানের কর্তৃত্বের প্রসঙ্গ তো আরও দূরের বিষয়। টমাস কুন তার বিপ্লবী বই 'The

---

২২১. Arthur Eddington, The Expanding Universe (New York: Macmillan, 1933), p.178

২২২. Steven Weinberg (১৯৩৩-) : মার্কিন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। মার্কিন বিজ্ঞানের জাতীয় একাডেমির সদস্য।

২২৩. দোলন তত্ত্ব বলা হয়, যা মনে করে মহাবিশ্ব চিরন্তন, প্রসারিত এবং অনন্তকাল ধরে অসীম চক্রের মাঝে হ্রাস পাচ্ছে। এই তত্ত্বের দ্বারা মূলত মানুষকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব থেকে অমুখাপেক্ষী করা হয়।

২২৪. Steven Weinberg. The First Three Minutes (Basic Books, 1977), p.154

২২৫. Mara Beller, Bohm and the "Inevitability" of acausality, in Bohmian Mechanics and Quantum Theory: An Appraisal, eds. J.T. Cushing, Arthur Fine, and S. Goldstein (Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996), p.215

Structure of Scientific Revolutions'[২২৮]-তে আমাদেরকে দেখান যে, বৈজ্ঞানিক আন্দোলনগুলো সেরকম সাবলীলভাবে চলে না। যেভাবে দেখানো হয় যে, বিজ্ঞানীদের একটি দল বিশ্বকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু প্রতিটি বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা একটি দৃষ্টান্ত (Paradigm) বা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থা অনুযায়ী চলে আসছে। এবং যখন সে প্রেক্ষাপটের বাস্তবতায় নতুন তথ্য উপস্থাপিত হয় যা প্রচলিত মডেলের বিপরীত, তখন সাধারণ বিজ্ঞানীরা ইচ্ছাকৃতভাবে নতুন তথ্যের ব্যাখ্যা করে বিদ্যমান সিস্টেমকে এমনভাবে রক্ষা করেন, যা প্রচলিত তত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। এবং বিদ্যমান সিস্টেমকে রক্ষা করার জন্য এটি এই বিবৃতিগুলোকে এক বাক্যে প্রত্যাখ্যান করার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্যাটার্নের উৎপত্তির বিরোধিতাকারী নতুন তথ্য সংগ্রহের সাথে এবং সমঝোতা বা বানোয়াট প্রচেষ্টার ব্যর্থতায়, বিজ্ঞানীদের একটি নতুন দল উপস্থিত হয়, যারা নতুন প্যাটার্নকে রক্ষা করে। পুরোনো ব্যবস্থা একটি সংকটে নিপতিত হয় ও নতুন সিস্টেমের উত্থানের সাথে বিষয়টির সমাপ্তি ঘটে। যা নতুন তথ্যের উত্থানের সাথে পরবর্তী সংকটেরও মুখোমুখি হয়। এর অর্থ হচ্ছে, বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান সিস্টেমগুলোর প্রতি অসহনশীল হওয়া বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক চরিত্র। কেননা তা পরিচিত ও প্রচলিত বিষয়গুলোর বিপরীত।

অসঙ্গতি>সমস্যা>বৈজ্ঞানিক বিপ্লব>নতুন মডেল>অসঙ্গতি>সমস্যা।

এই উদাহরণগুলো হলো মহাদেশীয় প্রবাহের ওপর আলফ্রেড ওয়েগনারের[২২৯] তত্ত্ব। ১৯১২ সালে ওয়েগনার যখন এই তত্ত্বটি উপস্থাপন করেছিলেন তখন তা অবজ্ঞা ও নিন্দার মুখোমুখি হয়েছিল। এই তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল তার মৃত্যুর বিশ বছর পর।

কোনো মতাদর্শের প্রভাবের অধীন নয় এমন গভীর পর্যবেক্ষণের অনুশীলন যার রয়েছে, তেমন একজনকে অবশ্যই এই উপসংহারে পৌঁছতে হবে যে, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশাবলি ও প্রভাবের সাথে সংযুক্ত। আর এটা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি।

---

২২৮. The Structure of Scientific Revolutions

২২৯. Alfred Wegner (1980-1930) : জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও আবহাওয়াবিদ।

তরুণ দার্শনিক ব্রায়ান আর্প যিনি বিজ্ঞানের আধুনিক দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ভাবতাম বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ। সত্য প্রকাশ ও অন্ধকার অজ্ঞতাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানে রূপান্তর করার জন্য একটি নিরাপদ যন্ত্র। আমি ভাবতাম, বিজ্ঞানীরা বাস্তবতা উন্মোচনকারী একটি বিশেষ জাতি। যেন তারা সুপারহিরো। অবশ্য তাদের প্রতি আমার বিশ্বাস এরচেয়েও অধিক ছিল। তারা প্রথাগত চিন্তা ও মানবীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত, তাদের ঘোষণা পবিত্র শব্দ।

আমি বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে যুক্ত হওয়ার আগে আমার ভাবনা এমনই ছিল। বেশ সহজ সরল চিন্তাভাবনা। এরপর আমি বুঝেছি যে, যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অথবা তার কিছু আদর্শচিন্তা এই স্বপ্নীল বিশ্বাসকে সত্য প্রতিপন্ন করে, তবু বিজ্ঞানচর্চাকে ব্যাপকভাবে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এটা তো সুস্পষ্ট যে বিজ্ঞানীরাও আমাদের মতো মানুষ। তাদের একটি সুনাম রয়েছে, যা তারা রক্ষা করতে চায়। অনিরাপত্তার অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায়।[২৩৮]

বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের বস্তুনিষ্ঠতা সর্বদিক থেকেই ত্রুটি ও অভ্যন্তরীণ স্বার্থ, পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ভীতিপ্রদর্শিত। মহাজাগতিক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিকোণ দ্বারা, বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার বিবেচনামূলক ব্যাখ্যা দ্বারা ও বিশ্বের সাথে বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতামূলক সম্পর্কের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

> 'আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়, প্রমাণ আমাদেরকে তত্ত্ব তৈরি করতে বা কখনো কখনো বিদ্যমান তত্ত্বগুলোকে খণ্ডন করতে উদ্বুদ্ধ করে; কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষার কিছু মৌলিক তথ্যকে গুরুত্ববহ হিসেবে বিবেচনা করে অন্যগুলোকে বাতিল করার সময় থিওরি নিজেই প্রমাণ তৈরি বা ধ্বংস করতে পারে।'[২৩৯] —উইলিয়াম উইলসন

---

২৩৮. Brian D. Earp, Can science tell us what's objectively true?

২৩৯. William A. Wilson, The Myth of Scientific Objectivity: First Thing Journal, November 2017.

পক্ষপাত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার চিত্র

বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা, মহাবিশ্বকে উপলব্ধি করা ও তা পরিবর্তন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত বিজ্ঞান-চর্চার প্রতিটি ধাপে পর্যালোচনার দাবি রাখে। কেননা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরির প্রতিটি ধাপে, এমনকি পূর্বে যে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে শুরু করে তত্ত্বটি পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত পক্ষপাত সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

মূলত আমাদের আলোচনা হবে পশ্চিমা বিশ্বে যে বৈজ্ঞানিক চর্চা চলছে তার বস্তুনিষ্ঠতার ভগ্নদশা নিয়ে। কেননা আমাদের আরব বিশ্ব এখনো তার সৃজনশীল অর্থে (বৈজ্ঞানিক গবেষণা) অনুশীলন থেকে অনেক দূরে। এটা আরব বিজ্ঞানীদের অজ্ঞতার কারণে নয়। বরং বিজ্ঞান-চর্চা খুব বড় পরিমাণ আর্থিক সামর্থ্যের মাঝেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দেশগুলো তার জন্য বরাদ্দ করে।

তা ছাড়া গ্রুপওয়ার্ক কাজ করা, কাজের সরঞ্জামের ব্যবস্থাপনায় পৃষ্ঠপোষকতায় করা, বিজ্ঞান-চর্চার জন্য পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরিবেশ তৈরি করা এবং এ উদ্দেশ্যে বিশেষ ডিপার্টমেন্ট রাখা—এ সবই পশ্চিমা বিশ্বে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আরব বিশ্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিভাগগুলোর প্রতি মনোযোগ মাত্রাভেদে প্রায় অনস্তিত্বের পর্যায়ে রয়েছে। এটি এমন একটি বিষয়, যার পেছনে অন্য অনেক কারণের চেয়েও বেশি রাজনৈতিক কারণ রয়েছে।

আসুন আমরা পশ্চিমা বিশ্বের আলোচনায় ফিরে যাই, যা অনেকের ধারণামতে বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার গ্যারান্টি দেয়, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় পক্ষপাত থেকে মুক্ত অথবা তার উর্ধ্বে অবস্থান করে। যেহেতু সেখানে জ্ঞান পবিত্র। পাশাপাশি মানুষের কাছে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কার্যকলাপে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠতার অপ্রতুলতার চিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

বিষয় নির্বাচন করা

বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার কর্তৃত্বের কাছে নত না হয়ে এবং তার সমর্থন না নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করে না। শুধু বিজ্ঞানীর একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পন্ন করার জন্য নিজের উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ

ল্যাবে প্রবেশ করে না।[১৬৩] সাধারণভাবে তার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা সরকার বা অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে এই বিষয়ে আগ্রহসহ জোরালো সমর্থনের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে। এ কারণেই অনেক বিজ্ঞানী তাদের আইডিয়া ও অনুমানের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার জন্য অভিযোগ করেন, যার জন্য একটি প্রায়োগিক পরীক্ষা প্রয়োজন। এবং ভালোভাবে যাচাইকৃত গবেষণার সমর্থন, কঠোর প্রচেষ্টার পর অনুমানগুলো রেফারেন্স পেশ করার পর তা প্রকাশিত হয়।

প্রায়ই বাণিজ্যিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি তাদের পণ্যের পক্ষে অথবা ভোক্তাদের ক্ষতির অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার জন্য গবেষণাগুলোর প্রতি সমর্থন পোষণ বা পরিত্যাগ করে। এমনিভাবে খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিকারক হিসেবে প্রচারিত হওয়ার পর প্রায়ই বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করে, যা ক্ষতিকর প্রভাব থেকে তাদের পণ্য মুক্ত হওয়ার দাবি করে। প্রায়ই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্বাচিত বিষয়গুলোতে পরিচালিত গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা থাকার কারণে আমরা কোনো পণ্যের ক্ষতি বা উপকারের ক্ষেত্রে প্রবল বিরোধপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ফলগুলো দেখতে পাই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানী তার সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থ বিবেচনা না করে তার গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করার ব্যাপারে চিন্তা করেন না। বৈজ্ঞানিক গৌরব, প্রচারণা লাভ ও একাডেমিক অর্জন ইত্যাদিও তার বিবেচনায় থাকে। ফলে একাডেমিক পরিবেশের বাহির ও অভ্যন্তর বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রবল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা

বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সমস্ত অপরীক্ষামূলক জ্ঞান থেকে মুক্তির ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং পরীক্ষাটি অনেক ইন্দ্রিয় বহির্ভূত ধারণার ওপর নির্ভর করে শুরু হয়; যা পরীক্ষাটিকে মতাদর্শ ও মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির নিয়মের অধীন করে তোলে। টমাস কুন, পল ফায়রাব্যান্ড ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পর্যবেক্ষণগুলো তাত্ত্বিক অনুমানের একটি সেটের ওপর নির্ভর করে, যার মাধ্যমে এই পর্যবেক্ষণগুলোকে বোঝা ও কল্পনা করা হয়।

১৬৩. দার্শনিক টমাস কুন এ ধরনের বিজ্ঞানীদের বলতেন 'Normal scientists'।

একটি স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত না থাকা অবস্থায় অর্থপূর্ণ হওয়া অসম্ভব। আবার অন্যের ওপর ভিত্তি করে তা প্রভাবশূন্যও হতে পারে না। এবং একটি বিশেষ গন্তব্যের দ্বারা নির্দেশিত তথ্য, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি সম্পূর্ণ কাঠামোর মাঝে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঝে মাঝে এই দিকটি মহাজগৎকে উপলব্ধি করার অনুসন্ধান থেকে বিচ্যুত হয়ে একটি নির্দিষ্ট রঙে বিশ্বকে রঙিন করার অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়।

পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পক্ষপাতিত্বের আরেকটি ঘটনা হচ্ছে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে জেনেটিক মিল থাকার কথা বলে মিথ্যা ও অসঙ্গতি উপস্থাপন করা। এই বিষয়বস্তুটির উৎস হলো, বিবর্তনীয় মতবাদের জন্য মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে জিনগত সম্পর্ক এমনভাবে প্রমাণ করা দরকার, যাতে বোঝা যায় মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে জেনেটিক মিল বাকি প্রাণীদের চেয়ে বেশি। যাতে করে বিবর্তনবাদীদের এই কথাকে মেনে নেওয়া হয়, জীবের ক্রমবিকাশে মানুষ ও শিম্পাঞ্জিদের পূর্বপুরুষ একই।

বহুল প্রচলিত লেখাগুলোতে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, নিরপেক্ষ ও নির্ভুল চিত্রের সাথে দুটি জিনের প্রতিটিকে তুলনা করার পর বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনগত মিল প্রায় ৯৯%।[২৩১] এই দাবিটি ডারউইনবাদের প্রচার-প্রসারের রচনায় একটি স্থিতিশীল যুক্তি হয়ে উঠেছে। অথবা বলা যায়, বিবর্তনের আইকনিক বিষয়গুলোর আইকন হয়ে উঠেছে।

তারপর অনেক পাঠক অবাক বিস্ময়ে জানতে পারল, ৯৯% এর দাবিটি ছিল এক মস্ত বড় ভুল। সামঞ্জস্য সাধনের এই উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য যে গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল, তা ছিল পক্ষপাতমূলক। অতএব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই দাবি একটি কল্পকাহিনিতে পরিণত হয়েছে।[২৩২] কেননা সমগ্র মানবের জিন ও শিম্পাঞ্জি জিনের মাঝে এই তুলনা করা হয়নি। বরং সবচেয়ে বড় অংশ উপেক্ষা করা হয়েছিল, যা আবর্জনা মনে করা হয়েছিল এবং পরীক্ষা করার সময় মানব জিনের তিন শতাংশেরও কম গ্রহণ করা হয়েছিল। আর

---

২৩১. Mary-Claire King, A.C. Wilson, (1975). "Evolution at Two Levels in Humans and Chimpanzees. Science. .188: 107-116

২৩২. Jon Cohen (২০০৭). Relative Differences: The Myth of 19 Science. 316: 1836

তুলনা করার পদ্ধতির কারণে এই দুই জিনের অনেক পার্থক্য উপেক্ষা করা হয়েছিল। এর অর্থ দাঁড়ায়, পর্যবেক্ষণের উৎস বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার উৎস থেকে বিচ্যুত।[২৩৩]

পরীক্ষা

পরীক্ষা নিজেই পক্ষপাত ও বস্তুনিষ্ঠতার সমস্যা থেকে দূরে নয়। কেননা পরীক্ষা অনুশীলন করার সময় পরিমাপ ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দোষমুক্ত নাও হতে পারে। পরীক্ষার বস্তুনিষ্ঠতা গত শতাব্দীর আশি ও নব্বই দশকে একটি গুরুতর বিতর্কে উত্থাপিত হয়েছিল। এতে বিজ্ঞানীদের মতামতও ভিন্ন ছিল। তাদের মাঝে কতিপয়ের অভিমত হচ্ছে পরীক্ষামূলক ফলাফল সঠিক কিনা তা জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে, যে উপকরণটি ফল দেয় তা নির্ভরযোগ্য কি না। কিন্তু একজন ব্যক্তি তো এই উপকরণটি নির্ভরযোগ্য কি না তা জানতে পারে না, যদি না তিনি জানেন এটি প্রথম স্থানে সঠিক ফল দেয়। তাই এটি অন্য উপকরণের সাথে পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং অবিরাম ক্রমানুসারে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।[২৩৪]

হাইপোথিসিস প্রস্তুতকরণ

হাইপোথিসিস বা তত্ত্ব তৈরি করার পর্যায়টি নব উদ্ভাবন নিশ্চিত করার জন্য অথবা একাডেমিকদের মাঝে প্রচলিত ধারণাগুলো পরিবর্তন করার জন্য বিজ্ঞানীর মনোযোগের সাথে বেষ্টিত। সেজন্য বিজ্ঞানীকে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে বা এর ফলাফল পরিবর্তন অথবা তা সরল ও আঘাতহীনভাবে উপস্থাপন করার জন্য বাধ্য করা হতে পারে। যাতে করে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সাথে এবং এর নেপথ্যের দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হয়। এটি পশ্চিমা বিশ্বে দেখা যায়, যেমন সমকামিতা সম্পর্কিত গবেষণায়, সমকামিতার ওপর একটি জেনেটিক সমীক্ষা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছিল। যা অস্বীকার করে যে এই ঘটনাটি একটি

---

২৩৩. See Fazale Rana and Hugh Ross, Who Was Adam? (Covina, CA: RTB Press, 2005), pp.199-225

২৩৪. Reiss, Julian and Sprenger, Jan. "Scientific Objectivity: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition)

একক জিনের কারণে, যা একজন ব্যক্তিকে এই পথে নিচালিত করে।[২৩৫] সংবাদপত্র নিউ ইউর্ক টাইমস এই গবেষণায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে, যেখানে এই গবেষণার দলটি যে তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল। গবেষণারত দলটি স্বীকার করেছে যে, সমকামী লবির প্রতিক্রিয়ার ভয়ে গবেষণার বাক্যাংশগুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক চিন্তাভাবনা করে তারপর গবেষণার বাক্যাংশগুলো নির্ধারণ করেছে।[২৩৬]

মনোবিজ্ঞান এবং এ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতামূলক অন্যান্য জ্ঞান (যেমন স্নায়ুবিজ্ঞান) আবির্ভাবের সময় সমকামিতা এই দাবির ওপর স্থির ছিল যে, এই সমস্যাটি একটি মানসিক রোগ। এবং এমন একটি ব্যাধি, যা স্বাভাবিকতা ও নিরাপত্তার বিরোধিতা করে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে সমকামীদের প্রবণতা বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদে তার অনুপ্রবেশ, রাজনীতি ও মিডিয়াতে তার স্পষ্ট উপস্থিতি, তার বিরোধীদেরকে আইনের খড়গ ও প্রসিদ্ধির দ্বারা কোণঠাসা করা—সবকিছু মিলে সমকামিতাকে একটি রোগ হিসেবে বর্ণনা করা সকলের নিকটেই বাদ পড়ে গিয়েছে। পরীক্ষার দিকনির্দেশনার কারণে একজন বিজ্ঞানী বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতায় পড়তে পারে। এভাবে যে হাইপোথিসিস তিনি রক্ষা করেছেন তা গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ। তখন একটি দল তত্ত্বকে জোড়াতালি দেওয়ার প্রচেষ্টা ও একগুঁয়েমি শুরু করে। যেমন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল[২৩৭] তার স্টেডি স্টেট তত্ত্বের প্রতিরক্ষায় করেছিলেন। তিনি ছাড়া অন্য সকল বিজ্ঞানী সেটাকে বাতিল হিসেবে গণ্য করেছিলেন।

আরেকটি দল ব্যর্থতার কথা শান্ত ও সৎভাবে মেনে নেয়। তখন একটি তৃতীয় পক্ষ হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া বেছে নেয়। যা কখনো কখনো আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিক ভি গর্ডন চাইল্ড[২৩৮] এর

---

২৩৫. Andrea Ganna, et al, Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior, Science 30 Aug 2019 Vol. 365, Issue 6456

২৩৬. Pam Belluck, Many Genes Influence Same-Sex Sexuality, Not a Single Gay Gene: New York Times, Aug 29, 2019.

২৩৭. Fred Hoyle (১৯১৫-২০০১) : প্রখ্যাত ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ।

২৩৮. Vere Gordon Childe (১৮৯২-১৯৫৭) : এডেনবার ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ছিলেন.

কর্ম। তিনি প্রাচীন ইউরোপের ইতিহাসের তত্ত্ব তৈরিতে সারাজীবন কাটিয়েছেন। যখন কার্বন ১৪ এর ইতিহাসের প্রযুক্তি প্রকাশিত হয় এবং অস্ট্রেলিয়ান আর্কিওলজিস্টের সকল দাবি বাতিল করে দেয়, তখন তিনি নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে আত্মহত্যা করেন। হাইপোথিসিস তৈরি করা পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ ও আরোহ অবস্থাসমূহের চেয়েও বড়। কেননা আরোহ একাই তত্ত্বের বড় চিত্র তৈরি করতে পারে না। তত্ত্বটি পূর্বজ্ঞান দ্বারা প্রদত্ত উত্তরগুলোর চেয়েও বিস্তৃত প্রশ্নের উত্তর দেয়। এ কারণেই আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'কোনো অভিজ্ঞতামূলক তত্ত্বের সেট তা যতই ব্যাপক হোক না কেন, জটিল সমীকরণ গঠনের দিকে নিয়ে যেতে পারে না। প্রায়োগিক পন্থায় তত্ত্বের পরীক্ষা সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্ব নির্মাণের কোনো সুযোগ নেই।'[২৩৯] পরীক্ষাটি শুধুমাত্র হাইপোথিসিস নির্মাণের একটি ব্লক মাত্র।

আবিষ্কার

মতাদর্শগত বা পূর্বধারণা এবং জ্ঞানীয় পক্ষপাতের কর্তৃত্ব তখন প্রদর্শিত হয় যখন বিজ্ঞানীর কাছে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সাধারণভাবে একাধিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করে। বিশেষ করে যদি এই ভিন্ন ব্যাখ্যাগুলোর একই ভবিষ্যদ্বাণী থাকে। এমনকি যদিও তা প্রাকৃতিক ঘটনার উপলব্ধিতে ভিন্ন হয়, যা বিজ্ঞানীর ওপর কিছুটা কর্তৃত্ব প্রদান করে। কারণ এটি প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধে যায় না। এবং চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়া কিছু তত্ত্বের সাথে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা ব্যাপক। এটি এমন বিষয় যা মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান, চেতনার বিষয়াদি ও ইচ্ছার স্বাধীনতায় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এবং জেন্ডার স্টাডিতেও তা দেখা যায়, যেখানে নারীবাদীরা গবেষণা পাঠের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে, যা নারীবাদী ব্যাখ্যার দিকে পরিচালিত করে।

সাধারণভাবে আবিষ্কারকে অসত্যের আড়ালে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংশ্লিষ্টতার কর্তৃত্ব খাটানোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যপট হচ্ছে গর্ভপাত সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহের ফলাফল ও তার ব্যাখ্যায় আমরা যা দেখতে

অতঃপর লন্ডনে প্রত্নতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হন।

২৩৯. Max Planck, The Philosophy of Physics, p.121

পারি। গর্ভপাতের পক্ষাবলম্বীরা বেশ জোরেসোরে আওয়াজ তোলে, একটি সচেতন জীব হওয়ার জন্য যে গুণসমূহ আবশ্যক তা ভ্রূণে থাকে না। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার ব্যথার অনুভূতি। অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণা তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

সম্প্রতি স্নায়ুবিজ্ঞানী মাইকেল এগনর গর্ভপাত লবি দ্বারা ভ্রূণ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলের বিকৃতির বাস্তবতা উন্মোচন করতে আওয়াজ তুলেছেন। তিনি বলেন, 'সম্ভবত উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতো সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল যা গর্ভপাত লবি আমাদের সমাজে করেছিল। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা ছাড়াও আদর্শের নামে বিজ্ঞানকে কলুষিত করেছিল। ভ্রূণের ব্যথা অনুভূত হওয়ার আলোচনায় স্নায়ুবিজ্ঞানকে বিকৃত করার মতো অধিক স্পষ্ট উদাহরণ এই দুর্নীতির ক্ষেত্রে আর পাওয়া যাবে না। জার্নাল অব মেডিকেল এথিক্সে একটি নতুন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম 'ভ্রূণের ব্যথা পুনরায় পর্যালোচনা'। সেখানের লেখকগণ (যাদের মাঝে একজন ছিলেন গর্ভপাতের প্রবক্তা) ভ্রূণের ব্যথার উপলব্ধি সম্পর্কিত সায়েন্টিফিক লিটারেচার রিভিউ করেছেন। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে, যা এই কথাকে সমর্থন করে—অনাগত শিশুরা গর্ভাবস্থার ১৩ সপ্তাহ পরে ব্যথা অনুভব করে।[২৪০]

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রায়োগিক উপযোগিতা প্রদান

আবিষ্কার কিংবা পরীক্ষার ফলাফল বের করার দ্বারাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজের সমাপ্তি ঘটে না; বরং তাত্ত্বিক আবিষ্কারকে বাস্তবিকভাবে উপযোগিতা প্রদান পর্যন্ত গবেষণার কাজ বিস্তৃত। তার আরেকটি স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মহাবিশ্ব ও তার নিয়মগুলোর সূক্ষ্ম সমন্বয়ের ব্যাপারে বড় বড় নাস্তিক পদার্থবিজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। তারা এটি আবিষ্কার করেছিল যে, অনেকগুলো

---

২৪০. Michael Egnor, 'The scientific community has for decades misrepresented the straightforward science of conception and fetal development for ideological reasons, Mind Matters News, January 21, 2020.

গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক ধ্রুবকের কোনো পরিবর্তন, এমনকি খুব সামান্য পরিমাণে হলেও মহাবিশ্বের পতন অথবা মহাবিশ্বে জীবের পতন হয়ে যাবে।

মহাবিশ্বের এই সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ আবিষ্কার করা নাস্তিক বিজ্ঞানীদের হতবাক করে দেয়। কেননা এটি (তাদের স্বীকারোক্তিতেই) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রমাণ। এজন্য তারা একাধিক মহাবিশ্বের তত্ত্বকে[২৪১] সমর্থন করে, যা তাদের দাবি অনুযায়ী বলে, আমাদের মহাবিশ্বের এই সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র ভাগ্যের জেরে হঠাৎ সংঘটন। কারণ মহাবিশ্বের অস্তিত্ব অসীম বা কোটি কোটি। যদিও আমাদের ছাড়া অন্য কোনো মহাবিশ্বের অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। অথচ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থেকে মুক্ত শুধুমাত্র অদৃশ্যের প্রতি তাদের মনোভাব নাস্তিক্যের প্রতি তাদের প্রাথমিক ঝোঁক সৃষ্টি করেছিল।

উদাহরণস্বরূপ অজ্ঞেয়বাদী পদার্থবিজ্ঞানী পল ডেভিস তার বক্তব্যে ঘোষণা করেছিলেন, 'একাধিক মহাবিশ্বের তত্ত্ব ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে মহাবিশ্বের নকশার দৃশ্য সঠিক করতে চায়।'[২৪২] তিনি আরও বলেছিলেন, 'সঠিকভাবেই আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব এই বলে যে, একটি তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে বর্ণনা করা যায় না, যদি তা এমন অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করে, যা সূচনা থেকেই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।'[২৪৩]

---

২৪১. Multiverse theory

২৪২. Davies, Cosmic Jackpot: Why Our Universe Is Just Right for Life (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2007), p.173

২৪৩. Ibid. pp.172-173

বিজ্ঞানের প্রান্তসীমা

> এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছে একজন মহাজ্ঞানী।'
>
> [সুরা ইউসুফ, আয়াত ৭৬]

> 'আর তোমাদের খুব সামান্য পরিমাণে জ্ঞান দান করা হয়েছে।'
>
> [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮৫]

> 'বিজ্ঞান অনেক কিছুই করতে অক্ষম। বিজ্ঞান সমস্ত সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধান বের করবে এই ধারণা বিপর্যয় ডেকে আনবে।'[৯৪৪]
>
> —পলিকার্প কুশ, পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী

পিটার এটকিন্স, একজন রসায়নবিদ ও উগ্র নাস্তিক, তিনি বলেছেন, 'ধার্মিক লোকেরা মনে করে ভৌত মহাবিশ্বে অথবা পরীক্ষার জগতে একটি অন্ধকার কোণ রয়েছে, যেদিকে বিজ্ঞান আলোকপাত করতে অক্ষম। কিন্তু বিজ্ঞান কখনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়নি। হ্রাসবাদ[৯৪৫] (Reductionism) ব্যর্থ হবে, এটা অনুমান করার একমাত্র কারণ হলো বিজ্ঞানীদের হতাশাবাদ ও ধর্মীয় লোকদের

---

২৪৪. Cited in: LS. Jaki, The Limits of the Limitless Science (Wilmington, DE: ISI Books, 2000), p.21

২৪৫. অথচ হ্রাসবাদ অনেক বিজ্ঞানীই এই ভিউকে এক্সেপ্ট করেন না। যেমন পদার্থবিদ জর্জ এলিস এর এই নিয়ে গবেষণা পত্রই রয়েছে, "Why reductionism does not work"(2021).

মনে হয়।"[২৪৬] এভাবে এটকিন্স অগাস্ট কোঁৎ[২৪৭]-এর দাবির মূলভাবকে উদ্দীপ্ত করেছে। অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সফল বিজ্ঞানকে জ্ঞানের বাকি ক্ষেত্রগুলোর বিবেচনায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। কেননা শুধু এটিই মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যোগ্য।[২৪৮]

এটকিন্সের বক্তব্যের আলোকে বিজ্ঞানবাদ হলো, এটি বিজ্ঞানের প্রতি আস্থার একটি বিভ্রান্তিমূলক বাড়াবাড়ি। এটি একটি বিভ্রম যে, ইন্দ্রিয়, স্পন্দন ও শারীরস্থানের ভাষা সমস্ত দিগন্তের বাইরে নিজ দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করার, সমস্ত রংকে আলাদা করার, সমস্ত স্বাদ ও গন্ধ বোঝার ক্ষমতা রাখে। বিজ্ঞানবাদ মূলত সচেতনতা ও উপলব্ধির জগতে ইন্দ্রিয়ের ওপর স্বেচ্ছাচারিতা। তাই আমরা কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি :

- বস্তুর সমস্ত বিষয় ও রীতিনীতিতে কি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে?
- বস্তুজগতের যে বিষয়সমূহ বিজ্ঞান নিরূপণ করে তা কি সত্যিই বিজ্ঞান আমাদের জানানোর ক্ষমতা রাখে?
- বিজ্ঞানের কি সূচনা ও শেষ পরিণতির প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আছে?
- মানুষ কি সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদের বিষয়বস্তু হতে পারে?
- নীতি-নৈতিকতা ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উক্তির মূল্যায়ন কী?
- যা সরাসরি ইন্দ্রিয়গত পর্যবেক্ষণ ও ল্যাবরেটরিকে গ্রহণ করে তার মাঝে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করা কি নিশ্চয়তার একটি উপায় না কি অজ্ঞতার প্রবেশদ্বার?

---

২৪৬. Cited in: John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science buried God? p.8

২৪৭. কোঁৎ এর অহমিকা কম ছিল। সে শুধু অধিবিদ্যার সীমা ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, বৈজ্ঞানিক দিক থেকে আধিপত্য নয়।

২৪৮. R. Aron, Les Étapes de la Pensée Sociologique (Paris: Gallimard, 1967), pp.86-87

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের সীমাবদ্ধতা

নাস্তিক বিজ্ঞানবাদীরা বলে, 'বিজ্ঞান প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করতে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরও গভীরতা আনয়নে জ্ঞানীয় ও বস্তুগত প্রক্রিয়া প্রস্তুত করতে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। সত্য ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপনে বিজ্ঞান যেমনটি বলেছে তেমনই দেখা গিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, শুধু বিজ্ঞানই প্রতিটি গবেষণার অভ্যন্তরে গমন এবং প্রতিটি সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় প্রবেশে সক্ষম। এটি অত্যন্ত সহজ বিষয়। কেননা পদার্থবিদ্যা রসায়নকে ব্যাখ্যা করে, রসায়ন জীববিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করে, আর জীববিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে মানুষকে।'

পূর্বোক্ত দলটির বিপক্ষ মত পোষণ করে স্রষ্টায় বিশ্বাসী দল এবং বিপুল সংখ্যক নাস্তিক। তাদের মতে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান জগতের অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান পৌঁছতে পারে না। এ থেকে বিজ্ঞানের নাস্তিক দার্শনিক মাইকেল রুজ বলেছিলেন, 'বাস্তবতার চারটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রাপ্তি অক্ষমতার পর্যায়ে। এর মাঝে রয়েছে অস্তিত্বের প্রকৃতি, এর অর্থ, নৈতিকতার বিষয়াবলি ও চেতনার বাস্তবিকতার প্রধান সমস্যাসমূহ।'[২৪৯]

যদি বিজ্ঞানের কৃতিত্ব থেকে এই কথার দলিল পেশ করা যায় যে, এটি জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম, তাহলে এটি এমন কিছু নয় যার কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়; বরং বিষয়টি প্রাপ্তির এই ক্ষেত্র থেকেও গভীর। বিজ্ঞান নিজেও নিজের ক্ষেত্রে এই দাবি করে না। আর দাবি করলেও তার এই দাবিকে সমর্থন করা হয় না। কেননা বাস্তবতা তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

বিজ্ঞান তার লক্ষ্য অর্জনে উচ্চাভিলাষী। তার স্বপ্নগুলো সুপ্রশস্ত ও বিস্তৃত। কিন্তু সে তার সরঞ্জামাদির হাতে বন্দি। এই উপকরণগুলো তাকে মহাজগতের এমন অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ করে তুলতে পারে, যেগুলো তার পরিধির বাইরে অবস্থান করে। উপকরণগুলো মহাজাগতিক কিছু ব্যাপারে তার জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ করে তুলতে পারে। কেননা তা প্রকৃতিগতভাবেই অপূর্ণ। কখনো কখনো বিজ্ঞানের জ্ঞান তার গবেষণার বিষয়বস্তুর কারণে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। কেননা তার অধ্যয়নের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।

---

২৪৯. Maarten Boudry and Massimo Pigliucci, eds. Science Unlimited?, pp.255-258

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রটি পর্যবেক্ষণ ও উদ্ভাবনের উপকরণের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। যে সংকীর্ণ বৃত্তে বৈজ্ঞানিক বিবেক-বুদ্ধি আবর্তন করছিল তা উপলব্ধি করার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও আধুনিক গবেষণাগারের আগে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে মানুষ শুধু কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক মানমন্দিরের আগে জ্যোতির্বিদ্যা এমনই কাল্পনিক ছিল। ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন বিজ্ঞানীরা আমাদের সময়ের উপকরণগুলোকে আদিম এবং বিশাল মহাজগতের বুনন ও প্রাণের সূক্ষ্ম কাঠামো উপলব্ধি করার জন্য খুবই নগণ্য মনে করবে।

ইন্দ্রিয় যা অনুভব করতে পারে না অথবা যার প্রভাব বুঝতে পারে না, বিজ্ঞান সেই বস্তুগত জগতের আলোচনা করতেও সক্ষম নয়। কেননা বিজ্ঞানের ভিত্তি মূলত বস্তুর অধ্যয়নের ওপরে, যেভাবে প্রাকৃতিক উপকরণ মানুষ কিংবা উদ্ভাবনী বস্তুর ক্ষেত্রে কিংবা তাদের প্রভাব থেকে যা অনুধাবন করা যায় এবং যা সামগ্রিকভাবে এই সীমা ছাড়িয়ে যায়, বিজ্ঞান সেখানে পৌঁছানোর কোনো পন্থা খুঁজে পায় না।

প্রতিটি যুগে বিজ্ঞান মনে করে, এটি সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দিগন্তের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। কেননা সে ভেবেছিল সে সময়ের শেষ সীমার পর আর কোনো দিগন্ত নেই। এটি বিজ্ঞানীদের বেশ কয়েকবার তৈরি করা ভ্রান্তি। যারা দাবি করেন, এটির চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আরেকটি চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে কানাডিয়ান আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী সাইমন নিউকম্ব ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছিলেন, 'সম্ভবত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের যতটুকু জানা সম্ভব আমরা প্রায় তার শেষ সীমায় চলে এসেছি।' ১৮৯৪ সালে আলবার্ট মাইকেলসন, যিনি পরে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন, লিখেছিলেন, 'নিত্যনতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারণ করা অসম্ভব বিষয়।' আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক উইলিয়াম থমসন ১৯০০ সালে একটি বিখ্যাত কথা বলেছিলেন, 'এখন পদার্থবিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কার করার মতো আর কিছু নেই। যা বাকি রয়ে গিয়েছে তা শুধু পরিমাপকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সামঞ্জস্য করা।'[২৫০]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও বিজ্ঞানের গন্তব্যের কথা সমাপ্ত হয়নি, বরং সেই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তা টিকে ছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিনের একজন

---

২৫০. Cited in: Peter Shave, The Rise of Science: From Prehistory to the Far Future (Cham: Springer, 2018), p.212

সিনিয়র সম্পাদক জন হর্গান ১৯৯৭ সালে 'The End of Science : Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age' নামে বই লিখেছিলেন। বিপুল সংখ্যক প্রবীণ বিজ্ঞানীর সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি বলেছেন, 'কেউ যদি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে তবে তাকে অবশ্যই সেই সম্ভাব্যতা মেনে নিতে হবে বা সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য সম্ভাবনা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনসমূহের একটি বড় যুগের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। বিজ্ঞান বলতে আমি ফলিত বিজ্ঞান বলতে চাই না। বরং বিজ্ঞান বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সর্বোৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ রূপ। অর্থাৎ মহাবিশ্ব ও এতে আমাদের অবস্থান বোঝার মৌলিক মানবিক প্রচেষ্টা।'[২৫১]

আমরা আমাদের কানের অনুভূতির সক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় বাস করি। যা কেবল নির্দিষ্ট কম্পনের মাধ্যমেই শুনতে পায়। আমরা কেবল আলোর নির্দিষ্ট বর্ণের মাঝেই দেখতে পাই। তা শুধু ৩৮০ থেকে ৭৪০ ন্যানোমিটারের মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে প্রতিক্রিয়া জানায়। আমরা যখন আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে একটির অনুভূতিশক্তি হারিয়ে ফেলি, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অস্তিত্বের একটি ক্ষেত্রের ধারণাও হারিয়ে ফেলি। যদি আমাদের চোখ না থাকত, তাহলে আমরা রঙের অস্তিত্ব ও তাদের পার্থক্যই কল্পনা করতাম না, তাদের আবিষ্কার করার চেষ্টা তো দূরের কথা। আর যদি আমাদের কান না থাকত, আমাদের ধারণাতেও আসত না যে, শব্দ বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। সংবেদনশীল অস্তিত্বের ক্ষেত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রশস্তকরণের সমর্থন জানায়। এজন্যই বিজ্ঞানবাদীদেরকে আমাদের বলতে হয়, সম্ভবত আমাদের চারপাশের বস্তুগত অস্তিত্বের মাঝে এমন কিছু রয়েছে, যা বিবেকবোধ কল্পনাও করতে পারে না। কেননা সেগুলো অনুভব করার মতো ইন্দ্রিয় আমাদের নেই।

বিজ্ঞান নিজ সত্তার মাঝেই অবস্থিত বেশ কিছু গোপনীয় অংশের জ্ঞান বুঝতে অক্ষম। তবে বিজ্ঞান তার কিছু অংশ উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ বস্তু, জীবন ও চেতনার কিছু বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে সক্ষম; কিন্তু বস্তুর বাস্তবতা, জীবনের বাস্তবতা ও চেতনার বাস্তবতা জানতে অক্ষম। সুতরাং সামগ্রিক বিষয়ের একটি দিক সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করা এটা আবশ্যক করে না যে, পুরো বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে।

---

২৫১. J. Horgan, The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age (London: Little, Brown, 1997), p.6

বিজ্ঞান হয়তো চমকপ্রদ গাণিতিক ভাষায় মহাকর্ষের নিয়ম সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে। এমনকি মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবকে আরও সূক্ষ্মভাবে হিসাব করতে পারবে, যাতে করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র পার হওয়ার জন্য রকেটের যে গতিবেগ প্রয়োজন তা নির্ধারণে সক্ষম হওয়া যায়। কিন্তু এটি আমাদেরকে মহাকর্ষের বাস্তবতা অর্থাৎ এর প্রকৃতির ব্যাপারে অবগত করে না। কেননা এটি এমন একটি প্রশ্ন যা মূল বিষয় ও পার্শ্ব বিষয়ের প্রতি গন্তব্যবান বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার গাণিতিক ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দিকটির কারণে সাব এটমিক পদার্থবিদ্যার অধ্যয়ন অনেক নব উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উপকারিতা প্রদান করেছে, যা আমাদের ঘরেও পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু সাব এটমিক জগতের বাস্তবতা এখনো অনেক রহস্যময়। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মতবাদগুলোর পর্যবেক্ষণকারী বাস্তবতা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে প্রচুর পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন। কোপেনহেগেন মত অনুযায়ী প্রিন্সিপাল অব রিজন সাব এটমিক জগতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একাধিক মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা এই মতের বিরোধিতা করে বলে, আমাদের মহাবিশ্ব সর্বদা নতুন বিশ্ব তৈরি করে। অপরদিকে ডেভিড বোমের মতবাদ তাদের বিপরীত। যা প্রিন্সিপাল অব রিজন বা নতুন বিশ্বের সৃষ্টিকে অস্বীকার করার মতো চরম ব্যাখ্যাগুলো বাদ দেয়। অপরদিকে তাদের সকলের বিরোধিতা করে অপর একটি মতবাদ বলে, পদার্থবিদদের এই বিশ্বকে বোঝার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ আমাদের বোধ এখনো তার বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণেই পদার্থবিদ জন গ্রিবিন[২২] তার বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষে (**Q is for Quantum: An Encyclopedia of Particle Physics**) লিখেছেন, আপনি সপ্তাহের শুরুতে একটি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন, শেষের দিন আরেকটি ব্যাখ্যাকে। কিন্তু আপনার এটা বিশ্বাস করা উচিত নয়, এই ব্যাখ্যাগুলোর মাঝে কোনোটি সত্যকে উপস্থাপন করে।'[২৩]

---

২২. জন গ্রিবিন (১৯৪৬-) : একজন ব্রিটিশ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের বিস্তৃতির বিষয়ে তাঁর বিশেষ মনোযোগ রয়েছে।

২৩. John Gribbin, ed. Q is for Quantum (NY: Free Press, 1998), p.320

তাহলে বিজ্ঞানবাদ কী? নাস্তিক দার্শনিক ম্যাসিমো পিগলিউশি[২২৪] বলেছেন, 'বিজ্ঞানবাদ কিছু বিজ্ঞানীর বুদ্ধিবৃত্তিক অহমিকা, যারা বিশ্বাস করেন, পর্যাপ্ত সময়, বিশেষ করে আর্থিক সংস্থান থাকলে শীঘ্রই বিজ্ঞান আমাদের জিজ্ঞাসিত যেকোনো অর্থপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে।'[২২৫]

বিজ্ঞানবাদ অসম্ভব অদৃশ্যের প্রতি একটি বিশ্বাস। ধর্মীয় অদৃশ্য থেকেও অসম্ভব অদৃশ্য। মুমিনকে তো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সে কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত দৃষ্টিতে পৌঁছাবে। অদৃশ্যকে সে নিজ চোখেই দেখবে কোনো পর্দা ছাড়া। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীদের অদৃশ্য কখনোই সামনে আসবে না। কেননা তা এমন প্রতিশ্রুতি দেয়, বিজ্ঞান যার নাগাল পায় না। যখন সম্ভাব্য জ্ঞানের সীমার ভেতর সকল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়, তখনো জীবনের বড় সমস্যাগুলো উত্তরবিহীন একই রকম থাকে।[২২৬]

বিজ্ঞান ও এই প্রশ্ন : সূচনা কোথায়? গন্তব্য কোথায়?

আমেরিকান ধর্মতাত্ত্বিক রবার্ট চার্লস স্প্রল[২২৭] বলেন, বিখ্যাত নাস্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিঃপদার্থবিদ কার্ল সেগান[২২৮]-এর সাথে তার অনেক চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয়েছে। কার্ল সেগান একটি বিখ্যাত কথা বলেছিল, 'বস্তুবাদী মহাবিশ্ব হচ্ছে যা আছে কিংবা ছিল অথবা হবে।'[২২৯] তিনি টিভি সিরিজ 'কসমসে'র মাধ্যমে আমেরিকান তরুণদের মাঝে বস্তুবাদী নাস্তিক্য বক্তব্যগুলো

---

২২৪. Massimo Pigliucci (১৯৬৪-) : ইটালিয়ান জীববিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের দার্শনিক। বিজ্ঞান অগ্রগতির মার্কিন সংগঠনের সদস্য। আমেরিকায় সৃষ্টিগত ধর্মের বিরোধী ও ডারউইনবাদের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক।

২২৫. Massimo Pigliucci, Nonsense on Stilts: How to Tell Science from Bunk (Chicago: The University of Chicago Press. 2018. p.235

২২৬. Ludwig Wittgenstein, Tractatus-Logico Philosophicus, trans. D.F. Pears and B.F. McGuiness (London: Routledge and Keegan Paul., 2001), sections 6.52-6.522. pp.88-89

২২৭. Robert Charles Sproul (১৯৩৯-২০১৭) : একজন রক্ষণশীল ব্রিটিশ মার্কিন ধর্মতাত্ত্বিক। আমেরিকায় ধর্মীয় আন্দোলনে তার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক দর্শনের সাথে বিশ্বাসগত বিতর্কে তার ব্যাপক অবদান রয়েছে।

২২৮. Carl Sagan (১৯৩৪-১৯৯৬) : বিখ্যাত মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও কসমোলজিস্ট।

২২৯. The Cosmos is all that is or was or ever will be

ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই চিঠিপত্রের মূল কারণ ছিল তারা ধর্মতত্ত্ব এবং মহাবিশ্বের সূচনার দর্শন সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

স্প্রল সেগানের বিগ ব্যাং থিওরি নিয়ে তার সাথে আলোচনা করেছিলেন। তাদের মাঝে নিম্নেবর্ণিত কথোপকথন হয়েছিল।

সেগান : 'বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আমরা এখন বিগ ব্যাং মুহূর্তের এক ন্যানোসেকেন্ডের মাঝে ফিরে যেতে পারি।'

স্প্রল : 'আচ্ছা, আসুন সেই সেকেন্ডের আগে ফিরে যাই। এই বিস্ফোরণের আগে আপনার অনুমান কী ছিল? আপনি বলেছিলেন, সমস্ত পদার্থ ও শক্তি একটি অসীম বিন্দুতে সম্পূর্ণ ঘনীভূত হয়েছে, এমন একটি বিন্দু যা চিরকাল সুশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল; কিন্তু হঠাৎ বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি জানতে চাই, কে তার পূর্বাবস্থার পরিবর্তন করল? আমি জানতে চাই, কোন বহিরাগত শক্তি তার স্থিতিকে আন্দোলিত করেছিল?'

সেগান : 'ঠিক আছে। আমরা সেই আলোচনায় যাওয়ার সামর্থ্য রাখি না। আর সেই আলোচনার প্রয়োজনও নেই।'

স্প্রল : 'হ্যাঁ, আপনার এই আলোচনার দরকার নেই। কারণ আপনি যদি ধরে নেন বিগ ব্যাংটি কোনো কারণ ছাড়াই ঘটেছে, তাহলে আপনি জাদুর কথা বলছেন। আর জাদু বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২৬০]

অনর্থক উদ্ভবের পৌরাণিক কাহিনিতে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত বিজ্ঞানের পক্ষে বস্তুগত অস্তিত্বের পূর্বে পৌঁছানোর কোনো উপায় নেই। 'মহাবিশ্ব কোনো কারণ ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে' এটা কোনো বৈজ্ঞানিক বিবৃতি নয়। কারণ বিজ্ঞান কারণের প্রভাবের সাথে তার সম্পর্ক অনুসন্ধান করে। আর জিনিসগুলোকে কারণহীন হিসেবে উল্লেখ করা বাস্তবে জাদুর চেয়েও খারাপ বিষয়। কারণ জাদু নিজেও একটি কারণ অনুসন্ধান করে, যদিও এটি একটি অতিপ্রাকৃত কারণ হয়।

প্রতিটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তার পরে যা আসে তা প্রভাবিত করার জন্য পদার্থের অস্তিত্ব ধরে নেয়। এটি তার আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে, অক্সিজেন ও

---

২৬০. Sproul, What is Faith?, kindle edition.

হাইড্রোজেন পানির আকৃতি ব্যাখ্যা করে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে বৈজ্ঞানিকভাবে আরও গভীর পর্যবেক্ষণ করা উচিত। অবশ্যই এটি কোনো এক বিন্দুতে শেষ হয়েছে, (ইতিহাসে তা যতই দূরে থাকুক না কেন) এর আগে কোনো শুরু নেই। আমরা প্রথম বস্তুটির সূচনা গবেষণা করছি এবং আবশ্যিকভাবে এর ব্যাখ্যা বস্তুবাদী মহাবিশ্বের বাইরে বিদ্যমান। এটি এমন একটি অস্তিত্ব যা বিজ্ঞানকে স্পর্শ করে না। কারণ তা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে।

আভিধানিক সংজ্ঞায় বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানীর পরিধির কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং এটি কোনো ক্ষেত্রেই এই সীমা অতিক্রম করে না, যা বিজ্ঞানের জন্য আমেরিকান ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সের সংজ্ঞায় বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'বিজ্ঞান প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যদ্বাণী তৈরি করার জন্য প্রমাণের ব্যবহার করে, যা পরীক্ষাযোগ্য। এবং বিজ্ঞান এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রাপ্ত জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করে।'[২৬১]

অস্তিত্বের ক্ষেত্রে কোনো কিছুর বিদ্যমানতায় ও তার লক্ষণগুলোতে বিজ্ঞানের যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তা বিজ্ঞানকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বা চূড়ান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে এর সীমানার বাইরে যেতে দেয় না। যা পক্ষপাতদুষ্ট বস্তুগত অস্তিত্বের বাইরে চলে যায়। যেমন এই প্রশ্নগুলো :

- কেন কিছুর অনস্তিত্বের চেয়ে অস্তিত্ব থাকাটা অধিকতর উপযুক্ত?
- কেন আমাদের মহাবিশ্বের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে? এর পরিবর্তে অন্য কোনো অস্তিত্ব ছিল না?
- কেন আমাদের মহাবিশ্ব এই লক্ষণগুলো বহন করে এবং এটি মৌলিকভাবে এর থেকে আলাদা ছিল না?
- কোথা থেকে আগমন? আর কোথায় ফিরে যাওয়া!
- এটা কি সম্ভব যে, আমাদের গন্তব্য একটি অনর্থক ভবিষ্যতের দিকে?
- এটা কি যুক্তিযুক্ত যে, এই অস্তিত্ব তার সৌন্দর্য, মহিমা ও মহত্ত্বসহ উদ্দেশ্যহীন জীবনের একটি পলক?
- আমরা কি অস্তিত্বের সীমাপ্রান্তে? না কি এই অস্তিত্বের নেপথ্যে অন্য কোনো অস্তিত্ব আছে?

---

২৬১. National Academy of Sciences, Definitions of Evolutionary Terms.

এগুলো হলো সেই প্রধানতম প্রশ্ন, যা সমস্ত দার্শনিককে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে যখন থেকে দার্শনিকরা এবং দর্শনশাস্ত্র অস্তিত্বের ব্যাপারে জানতে পেরেছে। এগুলোর মাঝে সাধারণ প্রশ্নগুলো পৃথিবীর অস্তিত্বের শুরুর আগে, পৃথিবীতে অস্তিত্বের শেষ এবং এর পরিণতিগুলোর সাথে যুক্ত। বিপরীতভাবে বিজ্ঞান বস্তুগত অস্তিত্বের সাথে শুরু হয়, এর পূর্বে থাকে না এবং অলঙ্ঘনীয় মৃত্যুতে বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সূচনার আগের ও সমাপ্তির প্রশ্নগুলোর উত্তর নেতিবাচক, এ কথাটি বিজ্ঞানবাদ নীতিগতভাবে ও আবশ্যিকভাবে মেনে নেয় যে, আমাদের অস্তিত্ব অর্থহীন, এর কোনো মূল্য নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটি পদার্থ, তার লক্ষণ, শক্তি ও এর গতিবিধিতে এই অস্তিত্বের মাঝেই সীমাবদ্ধ। এবং এটি অতিপ্রাকৃত প্রকৃতিবাদ গ্রহণের একটি প্রাকৃতিক ফল।

যখন একজন বিজ্ঞানী উত্তরের চাবিকাঠিগুলো অর্জন করার জন্য বস্তুগত সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার বিজ্ঞানের ক্ষমতা নিয়ে বড়াই করে, তখন মূলত সে নিজের সাথে ও বিজ্ঞানের সাথে ধোঁকাবাজি করে। যে ব্যক্তি নিজ শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুর কথা বলে, সে আবশ্যিকভাবে আশ্চার্যান্বিত হয়। তাই নোবেল বিজয়ী মেডাওয়ার[২৬২] লিখেছিলেন, "বিজ্ঞানীর বিশ্বাসযোগ্যতা ও তার প্রচেষ্টা নস্যাৎ করার সবচেয়ে দ্রুততম উপায় হচ্ছে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই ঘোষণা দেওয়া যে, বিজ্ঞান সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানে (বা শীঘ্রই জানবে)। আর যে প্রশ্নগুলো কোনো বৈজ্ঞানিক উত্তর গ্রহণ করে না, কখনো কখনো সেগুলো কোনো প্রশ্ন নয় বা সেগুলো সাধারণ মানুষের দ্বারা উত্থাপিত 'ছদ্ম-প্রশ্ন', নিতান্ত সহজ সরল ব্যতীত কেউ উত্তর প্রদানের সক্ষমতার ঘোষণা দেয় না। পাশাপাশি বিজ্ঞানের একটি সীমার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় শিশুদের দ্বারা উত্থাপিত প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর দিতে বিজ্ঞানের অক্ষমতার মাধ্যমে, যা প্রথম এবং শেষ বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত প্রশ্ন। যেমন : 'এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল?', 'আমরা সবাই এখানে কেন?' এবং 'জীবনের রহস্য কী'?"[২৬৩]

সৃষ্টিজগৎ কী, আমাদেরকে এই নির্দেশনা প্রদানের মাঝেই বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি লুক্কায়িত আছে। সূচনা ও সমাপ্তির প্রশ্নের কিংবা কর্তব্য ও সত্যের প্রশ্নের উত্তরে

---

২৬২. Peter Brian Medawar (১৯১৫-১৯৮৭) : একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক। জাতীয় চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

২৬৩. Peter Medawar, Advice to a Young Scientist (Basic Books, 2008), p.31

যাওয়া তার জন্য সমীচীন নয়। সে কেবল অস্তিত্বের রূপে জ্ঞানের দিকে চলে, অস্তিত্বের রূপের বাইরে বা তার আশেপাশে নয়।

> প্রকৃতিবাদ আমাদের সংস্কৃতির জন্য একটি 'সর্বসম্মত বাস্তবতা' তৈরি করেছে। এটি আমাদের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে, আমরা আর এটি দেখতে পাই না, তবে এর মাধ্যমে সবকিছু দেখতে পাই।'
>
> —দার্শনিক জন হিক[২৬৪]

বিজ্ঞান ও সংবেদনশীল সত্তার জগৎ

মাইক্রোস্কোপ অথবা ল্যাবে বিজ্ঞান যে সত্তা নিয়ে অনুসন্ধান করে তা মূলত কী?

তা কি বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, হৃদয়বান বদান্য মানুষ?

নাকি তা তরুণাস্থি, হাড় ও মাংসপিণ্ড?

প্রথম উত্তরটি সঠিক হবে যদি সৃষ্টির ঘটনায় একজন প্রভুকে স্রষ্টা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। যিনি মানুষকে একটি বিশেষ সম্মান প্রদান করেছেন। আর মানুষ যদি শুধু পদার্থের প্রাথমিক অবস্থার প্রভাবের সৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় উত্তরটি সঠিক। তাই একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব থেকেই মানবীয় প্রকৃত রূপ উপলব্ধ হয়, শারীরিক পরিমাপে নয়।

মানুষকে যখন ঐশ্বরিক প্রাপ্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়, বিপরীতে তাকে বস্তুগত বিবরণ ও ল্যাবরেটরি এনাটমির উপযোগী অবস্থানে নামিয়ে আনা হয়, তখন মানুষের শেষ পরিণতি এমন জিনিসের সাথে সাদৃশ্য রাখবে, যেগুলোকে ছোট ছোট জীবন্ত কণায় বিভক্ত করা যায়। যেমন কোষ অথবা অজীব কণায়। যেমন এনজাইম ও পরমাণু। এজন্যই ডারউইন ধর্মের ব্যাপারে মানব চিন্তাচেতনাকে অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় কুসংস্কার হিসেবে উপস্থাপন করে। আর চিকিৎসকগণ মানবীয় আচরণকে মস্তিষ্কের রাসায়নিক উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। ফলে (তাদের নিকট) ভালোবাসা শুধু একটি রাসায়নিক সামগ্রীতে বিবর্তিত হওয়ায় যখন তাকেই বিয়োগ করে দেওয়া হয়, তখন আমরা আশ্চর্য হই না।

---

২৬৪. John Hick, The Fifth Dimension: An Exploration of the Spiritual Realm (London: Oneworld, 2013), p.14

মানুষের মাঝে যা কিছু সুন্দর এমনকি উদারতা ও প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারটিও অবশ্যই রিডাকশনিজমের (Reductionism) ব্যবচ্ছেদে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে এটি বেশ প্রচলিত যে, নিজের জিনিসে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়াটাও সেই গোত্রের প্রতি একধরনের অবচেতন পক্ষপাত, যার সদস্যদের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। তারা বনে বাস করার সময় থেকেই তাদের মাঝে একতা ও সম্প্রীতির অনুভূতি বিস্তৃতি লাভ করেছে। অন্যের জন্য তারা যা করেছে তা মূলত বর্তমান সময়ে যেমন বলা হয়, 'তুমি আমার পিঠ চুলকাও, আমিও তোমার পিঠ চুলকে দেব', এই কথার প্রত্যুত্তর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না।

নিঃসন্দেহে প্রকৃতিবিজ্ঞান মানুষকে পর্যবেক্ষণ করা এবং তার গঠন ও পরিবর্তনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মানুষের পরিমাপগত সংবেদনশীল দিকটির অধ্যয়ন থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। এটি সংখ্যা, পরিমাপ ও সাধারণীকরণের ভিত্তিতে মানুষের শারীরিক গঠন বিশ্লেষণ করে। এবং তার আচরণ শারীরিক গঠনের উৎসের স্বয়ংক্রিয় প্রতিফলন ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

মানুষের প্রতি বিজ্ঞানবাদের এই কুৎসিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং যা তাকে ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও কামনায়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও কাদামাটিতে নামিয়ে আনে, তা মানুষের ভেতর থেকে আকাশের প্রতি তার মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং নৈকট্যের প্রতি তার সুবিদিত অনুরাগ, সন্তানকে আলিঙ্গন করার সময় স্নেহ ও চুম্বনের আগ্রহ সকল কিছুই বাতিল করে দেয়। এটি পশুপ্রকৃতি ছাড়া মানুষের জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ। যেহেতু বিজ্ঞানবাদ মানুষের স্বয়ংক্রিয় দিকটি বাদে সবকিছুকেই রহিত করে দেয়।

'যান্ত্রিক মানব' বা রোবট এটি সৌন্দর্য প্রদর্শন, কাব্য রুচি, প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ থেকে বর্জিত। যন্ত্রমানবের নিকটে এই বিশ্বে সুন্দর কিছুই নেই। কোনো আত্মা নেই। কেননা সবকিছু বেঁচে থাকার, পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরার এবং এর অতল গহ্বরে অনন্তকালের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে। নিঃসন্দেহে মস্তিষ্কের তরঙ্গ এবং হরমোনের মাত্রা পরিমাপ করে আমরা মাংসপিণ্ড থেকে তৈরি এই যন্ত্রের কিছু মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু হরমোনের মিথস্ক্রিয়া, সহ্যকরণ কিংবা রুচির সাথে সাইকোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট উপলব্ধি করতে পারি না। এটি মানুষকে গড়ে তোলে না, বরং এটি মানবীয় একটি প্রতিক্রিয়া। পোড়া, ক্ষত বা অঙ্গচ্ছেদ করার সময় স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা

আমাদের ব্যথার অনুভূতি নয়, উচ্চ রক্তচাপের পর স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ আশানুরূপ সাফল্য নয়। গরমের সময় পরিষ্কার আকাশের নিচে সাগর তীরে আইস্ক্রিমের গ্লুকোজের রাসায়নিক রূপ খাওয়া উপভোগ্য কিছু নয়।

কখনো কখনো মানুষ নিজের বাইরে বস্তুবাদী সত্তার প্রকৃতির প্রকাশ ঘটায়। মাঝে মাঝে দেহ একই পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

কিন্তু এখানে অস্তিত্ব পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে, তা উপলব্ধি করা ও তার ওপর বিধান আরোপ করায় একটি বড় মতভেদ রয়ে যায়। মানুষ তার জৈবিক ও রাসায়নিক প্রকৃতি থেকেও সুবিশাল ও সুগভীর। মানব-প্রকৃতি অনুধাবনে বিজ্ঞান আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। কেননা মানুষের নিজ সত্তার গভীরতা ও অন্তরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বাদ দিয়ে বিজ্ঞান শুধু তার বস্তুগত খোলস ও বৃদ্ধি এবং সক্রিয়তার মাপকাঠিতে তাকে অধ্যয়ন করে। এজন্যই একজন প্রখ্যাত পদার্থবিদ জন পকিংহর্ন[২৬৫] বলেন, 'আমরা যে জগতে বাস করি তার বেশ কিছু স্তর রয়েছে। বিজ্ঞান শুধু তার একটি ডাইমেনশনকে বর্ণনা করতে পারে। বিজ্ঞান নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক ও সাধারণের মাঝে সীমাবদ্ধ করে এবং ব্যক্তিগত ও একক বিষয়গুলোকে বন্ধনীতে[২৬৬] আবদ্ধ করে।'[২৬৭]

দার্শনিক ফ্রেডরিক হায়েক[২৬৮] তার সায়েন্টিজম এন্ড দ্যা স্টাডি অফ সোসাইটি বইতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভ্রান্তিতে মানুষকে সমর্পণের বিপদ বর্ণনা করতে বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। হায়েকের ভাষ্যমতে বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃতির সাথে নিজ আচরণের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ। তা ইন্দ্রিয় অনুভূত উপসর্গ ছাড়া অন্য কিছুই জানে না। আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেন মানুষ নিজের ব্যক্তিগত উপকারের জন্য প্রকৃতির

---

২৬৫. John Polkinghorne (1930-) একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ পদার্থবিদ। বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে সম্পর্কের গবেষণায় তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি রয়েছে। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফ্যাকাল্টি প্রধান ছিলেন।

২৬৬. (bracketing out) বন্ধনী স্থাপন। ফেনোমনোলজি পদ্ধতির একটি বিশেষ পরিভাষা। যা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলে, কোনো কিছুর বাস্তবতায় আমরা বিধান আরোপ করতে পারি না। আমরা সর্বোচ্চ এতটুকু পারি—কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত আমাদের পরীক্ষার ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব প্রদান করব।

২৬৭. J. C. Polkinghorne, Exploring Reality: The Intertwining of Science and Religion (New Haven: Yale University Press, 2007) p. ix

২৬৮. Friedrich Hayek (১৮৯৯-১৯৯২) : জার্মান বংশোদ্ভূত একজন ব্রিটিশ অর্থনীতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। ১৯৭৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী হয়েছিলেন।

কর্তা ও পরিচালক হতে পারে। এটি শুধু প্রাকৃতিক জগতের ভৌত দিকগুলোর ওপর জোর দিয়েই বাস্তবায়িত হবে। যে ভৌত দিকগুলো পরিমাণগত পরিমাপ, প্রণালি ও ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষ সত্তাগতভাবে এমন নয়। অতএব গণিতের ভাষা মানুষের রহস্য উন্মোচন ও তার বাস্তবতা বোঝার ভাষা; কিন্তু মানুষ নিজের ও চারপাশের জগতের সাথে যে গুণগত চরিত্রের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে তা আত্মসচেতনতার ওপর প্রাধান্য পায়। মানুষকে যখন সংখ্যার সংজ্ঞা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় তখন সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কেননা সে আনন্দ, স্ফূর্তি, উপভোগ, আশা, হতাশা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ওজন ও দৈর্ঘ্যের সাথে বাস করে না।

মানুষের সাথে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কার্যপ্রণালি খেয়াল করলে বিজ্ঞানের বিপত্তি প্রকাশিত হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ একজন ডিপ্রেসড রোগীর দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করার দ্বারা তার রোগ পর্যবেক্ষণ করা হয়। যাতে করে এই উপসর্গগুলো সংখ্যা কিংবা মাত্রার একটি সমষ্টিতে রূপান্তরিত হয়, যার দ্বারা রোগীর মনের ভাব পরিমাপ করা যাবে। এই সংখ্যা বা মাত্রা পরিবর্তনের দ্বারাই রোগীর অবস্থা, অসুস্থতা ও সুস্থতার পরিবর্তন পরিমাপ করা হবে। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো নিজেদের প্রোডাক্টের কার্যক্ষমতা প্রচার-প্রসারের জন্য এই বস্তুগত সংখ্যার ফলগুলো কালেক্ট করে।[২৬৯] অথচ বিষণ্ণতা অত্যন্ত গভীর একটি মানসিক অবস্থা। তা সংখ্যা কিংবা ওষুধের রসায়নের চেয়েও জটিল গুণগত বাস্তবতা।

বিজ্ঞান মানুষকে যে দৃষ্টিতে দেখে তাতে কোনো বর্ণ, রুচি কিংবা উষ্ণতা নেই। এটি একটি শীতল সত্তা, শূন্যতায় যার বিস্তৃতি। তা গতি ও স্থিতির মাঝে বাস করে। তার অস্তিত্বের সূচনা ঘটে জন্মের দ্বারা এবং মৃত্যুর কোলাহলে তার পরিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটে। বৈদ্যুতিক স্পন্দন, রক্তের প্রবাহ, দেহের জোড়া, পেশির সংকোচন, কোষের জন্ম ও মৃত্যু ব্যতীত মানুষের আর কিছুই নেই। মানুষ নিজের মাঝে আবদ্ধ একটি জগৎ। অত্যন্ত সংকীর্ণ এমন কিছু সীমায় মানুষ আত্মসচেতনতা ও

---

২৬৯. আল উলুমুত তবিয়্যাহ ওয়াত তাহাইয়ুয লিন নামুযাজিল উরুব্বিয়্যিল গরবিয়্যি, মুহাম্মাদ ইমাদ ফাদলি। আব্দুল ওয়াহহাব আল মাসিরি কর্তৃক সম্পাদিত 'ইশকালিয়্যাতুত তাহাইয়ুয' কিতাবের সূত্রে। (ভার্জিনিয়া : আল মাহাদুল আলামি লিলফিকরিল ইসলামি, ১৪১৭ হিজরি, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ৭২৮

বিশ্বের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা বিজ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধ মানুষ ও চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এক হওয়া থেকে বিরত রাখে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানব বাস্তবতা বিবেচনা করার ক্ষেত্রে 'বস্তুনিষ্ঠতার' তাৎপর্য অনুমানের দ্বারা এবং তার বাহ্য অবস্থায় সীমাবদ্ধ করার দ্বারা মানুষের থেকে তার মানসিক দিকটি (subjective) বাতিল করে দেওয়া শুরু করে। যেন প্রতিটি প্রচেষ্টা মানব বাস্তবতা থেকে দূরে থাকে। কেননা মানুষকে চেতনা ও বিশ্বের জন্য বৈষয়িক জীবন থেকে পৃথক করা যায় না।

বিজ্ঞান প্রকৃত অর্থে মানুষকে গঠন করে না, তাকে কল্যাণের অভিমুখীও করে না। মানুষ কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করে তা বোঝার জন্য বিজ্ঞান মানুষকে ব্যবচ্ছেদ করে ও তাকে ছোট ছোট কণায় বিভক্ত করে। আর কাজের সময় তার যা ক্ষয় হয় এবং স্বয়ংক্রিয় কাজের পুনরাবৃত্তি তা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ভিসেরার জন্য।

> 'প্রকৃতিবিজ্ঞান লাল ও সবুজ, তিক্ত ও মিষ্টি, ব্যথা কিংবা শারীরিক উপভোগের ব্যাপারে একটি মন্তব্যও করতে পারবে না। কেননা বিজ্ঞান সৌন্দর্য ও কদর্যতা, ভালো ও মন্দ, আল্লাহ ও অনন্তকালের কথা কিছুই জানে না। বিজ্ঞান মাঝে মাঝে দাবি করে যে, পূর্ববর্তী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তা সুন্দর উত্তর দিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উত্তরগুলো এতটাই অর্থহীন যে, এগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করারও প্রয়োজন নেই।'[২৭০] –এরউইন শ্রোডিঙ্গার[২৭১]

এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার সারাংশ হলো, মানুষ নিজ বোধ, অনুভূতি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সমন্বয়ে এক বিস্ময়কর সত্তা বা অস্তিত্ব। যেই জিনিস কোনো জীবনের মালিক নয় অথবা বোধ ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি যার প্রয়োজন অনুভব করতে পারে, মানুষ সেসব জিনিসেরও উর্ধ্বে। এজন্য তার ব্যাখ্যা আবশ্যিকভাবে এমন এক সত্তার দিকে ফেরানো উচিত, যিনি জীবনের মালিক এবং তা দানকারী।

---

২৭০. Schroedinger, Nature and the Greeks (Cambridge University press, 1954) p. 93

২৭১. Erwin Schroedinger (১৮৮৭-১৯৬১) : জার্মান বিশিষ্ট পদার্থবিদ। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে তার বিশাল অবদান রয়েছে। পদার্থবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার মালিক এবং তা দানকারী। ছোট দ্বারা বড়র ব্যাখ্যা যৌক্তিক নয়। অর্থাৎ পদার্থ (মানুষের) ব্যাখ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে খুবই নগণ্য।

নৈতিকতা ও নন্দনতত্ত্বের জটিলতা

বিজ্ঞানবাদে বিশ্বাস মানব গর্ভাশয়ে নৈতিক অনুভূতির ভ্রূণের গর্ভপাতের দিকে পরিচালিত করে। কারণ আমরা প্রকৃতিবাদের মতাদর্শকে মেনে নিলে তা দাবি করে যে, অবজেক্টিভ নীতিশাস্ত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই; বরং তার অস্তিত্বের বিভ্রমটিই বিদ্যমান। সবকিছুকেই শেষ পর্যন্ত জৈব রসায়নে ফিরে আসতে হবে। আর জৈব রসায়ন পরমাণুর নিয়মের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের পরোয়া করে না।

যদি নৈতিক কাজটি একটি ইন্দ্রিয় অনুভূত কাজ হয়, যা মূলত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, এবং উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়াশীলতাই জীবনের একমাত্র বাহ্য রূপ হয়, তাহলে বিজ্ঞানব্যবস্থার মধ্য থেকে নৈতিক জ্ঞানের অন্বেষণ করা মানে এমন কিছুর সাহায্য প্রার্থনা করা, যার সাহায্য করার বা দিকনির্দেশনা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। কারণ বিজ্ঞানের কাজের ক্ষেত্র কেবল পরমাণু ও গতি। সুতরাং এটি নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন কিংবা অনুধাবন করতে পারে না।

বিজ্ঞানের নৈতিক নিহিলিজমের দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় অনেক বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিত ব্যক্তি বস্তুবাদের পরিধি থেকেই উদ্ভূত একটি নৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রচেষ্টা করেছিলেন, যা হবে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। এ ক্ষেত্রে স্যাম হ্যারিস বলেন, নৈতিক সত্য হচ্ছে যা কল্যাণ নিশ্চিত করে। আমাদের অবশ্যই তা মেনে চলা উচিত। কিন্তু এই দাবিটি কোনো দিকনির্দেশনা প্রদান করে না। কল্যাণ একটি বিষয়গত ধারণা হয়েই থেকে যাবে, যদি এটি একটি অন্টোলজিক্যাল গ্রাউন্ড দ্বারা সমর্থিত না হয়। কেননা হালাকু খান মনে করেছিল মুসলমানদের হত্যা করা কল্যাণের উৎস। আর মুসলিমদের মতে হালাকু খানের অত্যাচারে বাধা দেওয়া হলো বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের সূচনা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ। বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী স্যাম হ্যারিস নতুন একটি সমস্যার মুখে ছিলেন, তা হচ্ছে জীবিত সত্তার কল্যাণের সমস্যা। তার মতে বর্তমানে যেটা যুক্তিবাদী সত্তার পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য বিবর্তনীয় পথ অনুসরণ করে চলেছে। তাহলে কেন সে এই কল্যাণ থেকে নিজ অংশ গ্রহণ করল না! নির্দিষ্ট কোনো বিষয় কল্যাণ বাস্তবায়ন করে—এই

ধারণা থেকে সেটাকে মেনে চলা, মহিমান্বিত করা কিংবা প্রশংসা করার বাধ্যবাধকতা প্রকৃত বস্তুবাদী অস্তিত্বে সেই বিষয়টির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে না।

কল্যাণ এবং সুখের প্রশ্নটি প্রাচীন ও আধুনিককালে দর্শনের সবচেয়ে বড় রহস্য। অ্যারিস্টটল তার বইতে উল্লেখ করে বলেছেন, 'প্রায়ই একজন ব্যক্তি বিভিন্ন জিনিস দ্বারা সুখী হয়। যখন সে অসুস্থ থাকে তখন সুস্থতা দ্বারা আর যখন সে দরিদ্র থাকে তখন সম্পদ দ্বারা সুখ লাভ করে।'[২১২] অর্থাৎ অনুগ্রহের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন, বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনশীল। আর এ কারণেই কল্যাণের বাস্তবতা উপলব্ধি করা সুকঠিন। যেহেতু তা স্থিতিশীল নয়।

তাই উগ্র নাস্তিক ও জীববিজ্ঞানী পিজি মায়ার্স[২১৩] হ্যারিসের থিসিসকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার অভিযোগ ছিল হ্যারিস এমন একটি সমাধান প্রস্তাব করছে, যা স্বতঃসিদ্ধ নয়। বরং হ্যারিস যে ন্যায়বিচার, করুণা ও সহানুভূতির ধারণাগুলোর প্রতি জোর দিচ্ছে তা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নয়। অতএব পুরো প্রকল্পটি বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে।[২১৪]

আসন্ন বৈজ্ঞানিক বিকাশ সেই সাহায্যকারী নয়, হ্যারিস যার সন্ধানে রয়েছে যে, তা অকল্যাণ থেকে কল্যাণ এবং খারাপ থেকে ভালো জানার জন্য একটি মজবুত উদ্দেশ্যমূলক মানদণ্ডে পৌঁছে দেবে। কারণ বিশ্বে ক্ষুধার কারণ, মানবজাতির পর্যাপ্ততার জন্য কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ, যাতে এই উৎপাদনকে ন্যায্যভাবে বণ্টন করা যায়, তা জানার জন্য বিজ্ঞানের ব্যাপক বিকাশ ঘটতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান নৈতিকতার পরিধির বাইরে থাকবে। কারণ সম্পদ সমানভাবে বা ন্যায়সংগতভাবে বণ্টন করার জন্য নৈতিক কর্তব্যের জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের অন্তর্গত নয়। প্রায়ই আপনার এই পরিমাণ সম্পদ থাকে যা আপনার নিজের এবং আপনার প্রতিবেশীর জন্য যথেষ্ট; কিন্তু আপনি তাকে খাওয়ানো থেকে বিরত। কখনো কখনো দেখা যায় (যেমনটি আজ বিদ্যমান), একটি দেশের স্বার্থ হলো খাদ্যঘাটতির অস্ত্র দিয়ে অন্য দেশের জনগণকে বশ্যতা ও শাসনের জন্য ক্ষুধার্ত করা। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বর্ণনা নৈতিক কর্তব্য নয়।

---

২১২. Aristotle, The Nicomachean Ethics

২১৩. PZ Myers (১৯৫৭-) : নাস্তিক মার্কিন জীববিজ্ঞানী। মিনিসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমেরিকায় ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন থিওরি ও ধর্মের উগ্র বিরোধী।

২১৪. P. Z. Myers, Sam Harris v. Sean Carroll

সাধারণভাবে নৈতিক মানদণ্ডের সমস্যার জন্য হ্যারিসের প্রস্তাবিত সমাধান হলো উপযোগবাদের (Utilitarianism) সকল সমস্যার মাঝে, যা তার বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইতিবাচক মূল্যবোধ হলো, যা মানুষের বা সচেতন সত্তার জন্য আরও বেশি কল্যাণ বয়ে আনে। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে উপযোগবাদী মানদণ্ডগুলোর (সম্পদ, প্রজ্ঞা, প্রশান্তি) সংঘর্ষ, ন্যায়বিচার অর্জনের সমস্যা, যা প্রায়ই উপযোগবাদী প্রকৃতির স্বার্থপরতার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। মানুষের পক্ষে কী উপকারী তা নির্ধারণের অক্ষমতা, যেহেতু সে তার কর্মের নিকটবর্তী বা দূরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ, এবং সুবিধা অর্জনে ব্যক্তিগত সমতার প্রকৃতি, যা হয়তো সমাজের জন্য অবিচারসুলভ হতে পারে বা পরিশ্রমী ব্যক্তির তুলনায় অলস ব্যক্তিকে সুবিধা দিতে পারে।

এজন্য অধিকাংশ বিজ্ঞানবাদী ডারউইনীয় সমাধান গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, নৈতিকতা একটি সম্পূর্ণরূপে জৈবিক কাজ। ডারউইনবাদী বিজ্ঞানের দার্শনিক মাইকেল রুজ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তার 'টেকিং ডারউইন সিরিয়াসলি'[২৬২] বইতে দাবি করেন, মানুষের নৈতিক চরিত্রের জীববিজ্ঞান সম্পর্কে অনুধাবন পাঁচটি তথ্য দ্বারা সমর্থিত। যার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, 'জটিল নৈতিক চরিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়।'

দ্বিতীয়টি হলো, 'নৈতিক আচরণের একটি গঠনগত রূপ রয়েছে, যা পিতামাতা থেকে সন্তানের মাঝে জেনেটিক সংক্রমণের বড় একটি অংশ নির্ধারণ করে।'

তৃতীয়টি হলো, 'নৈতিক অনুভূতির বিষয়গত কর্তৃত্ব (জ্ঞানের বিষয় থেকে বাধ্যতামূলক স্তর পর্যন্ত) মানুষের জিনগত উত্তরাধিকারের মধ্যে নিহিত।'

চতুর্থটি হলো, জিনগুলো যা প্রকাশ করে তা সাধারণ মানুষ যে নৈতিক ব্যবস্থার ওপর রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।'

পঞ্চমটি হলো, 'জৈবিক বিবর্তনের আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য আমাদের অবশ্যই নৈতিক দায়িত্ব বজায় রাখতে হবে।'

রুজের বক্তব্য কোনোভাবেই বিজ্ঞান সমর্থিত নয়। এবং শারীরবৃত্তীয় বা অণুবীক্ষণিক পরীক্ষার মাধ্যমে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি; বরং এটি

---

২৬২. Taking Darwin Seriously: A Naturalistic Approach to Philosophy.

ডারউইনের নীতি অনুসারে একটি কাল্পনিক গল্প, যা মূলত একটি আদর্শিক বিশ্বাসকে সমর্থন প্রদানের জন্য রটানো হয়েছে।

তদুপরি যদি আমরা মেনে নিই, জীববিজ্ঞান নৈতিক উন্মেষ এবং এর বিষয়বস্তু তৈরি করে; তবে একটি কথা রয়ে যায়, আমরা নাস্তিক বিজ্ঞানীদের থেকে যা অস্বীকার করি তা হলো, নৈতিক সত্য জানা থেকে তা মেনে চলার বাধ্যবাধকতায় উত্তরণ। অর্থাৎ বাস্তবসম্মত সাহায্য বা যৌক্তিক বাধ্যবাধকতা ছাড়াই জ্ঞানতত্ত্ব থেকে অন্টোলজিতে চলে যাওয়া।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট দার্শনিক মাইকেল রুজ ঘোষণা করেছেন, নৈতিকতা হলো একটি বিভ্রম, যার কোনো বাস্তবতা নেই।'[২৭৬] তার মতবাদ মূলত একজন বিজ্ঞানীকে ল্যাবে স্বভাবজাত জীববিজ্ঞানের কার্যকারণের বিপরীতে কাজ করার বৈধতা দেয়। কারণ সেক্স ড্রাইভ স্বাভাবিক উপস্থিতি দ্বারা আবশ্যকতার মর্যাদা অর্জন করে না। ডকিন্স তার অনেক বক্তৃতা ও বিতর্কে এটির ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একজন ব্যক্তি যে গর্ভনিরোধক পিল ব্যবহার করে সে স্বাভাবিক প্রজননের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যায়, তা মূলত বিবর্তনই আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অতঃপর 'আমরা আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের উত্তরসূরি, যারা বন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন', এই কথাটি এমন ধারণা করতে বাধ্য করে যে, আমাদের নৈতিকতা উত্তরসূরিদের থেকে প্রোগ্রাম করা, যা মূলত আমাদের অন্তরের স্বাভাবিকতার সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা এটি আমাদের বন্য সভ্যতাকে (যা আমরা বর্তমান সময়ে দিনরাত অস্বীকার করে চলেছি) তার নিন্দা করতে বাধা দেয়। পাশাপাশি বাস্তবে আমাদের শিষ্টাচারসম্পন্ন হওয়ার সমস্ত আশা বিনষ্ট করে দেয়। যেহেতু আমাদের প্রেরণা ও উদ্দীপনা সবই অন্ধ এবং যান্ত্রিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব মাত্র।

পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানবাদ বস্তুনিষ্ঠ নৈতিকতার অস্তিত্বের বাস্তবতাকে ধ্বংস করে, যা সকলের মাঝে বিদ্যমান এবং সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। যা সরাসরি বিজ্ঞানকেই বিকৃত করে। কারণ বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি

---

২৭৬. Michael Ruse, Evolutionary Naturalism (Routledge, London, 1995) p. 250

পর্যায়ে নৈতিক সততার মুখাপেক্ষী : বিষয় নির্বাচন করা, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার স্থান ও উপায় নির্বাচন করা, উপাত্ত বিন্যস্তকরণ, সংগ্রহ করা, এটি থেকে অনুমান করা, বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের কাছে এটি পৌঁছে দেওয়া এবং পরে এটি বৈজ্ঞানিক কাজের ক্ষেত্রে বা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা।

বিংশ শতাব্দী এই ব্যাপারটির সাক্ষ্য প্রদান করে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বড় বড় পরিবেশগত সমস্যাগুলো দেখা দেয়। যেমন : পানিদূষণ, মাটিদূষণ, বায়ুদূষণ, ওজন স্তরে ক্ষয়, আমাজন রেইন ফরেস্ট ধ্বংস এবং রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্রের বিস্তার। এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্টিন রিজ অনুমান করেছিলেন, মানবসভ্যতা একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে থাকার মাত্র ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে, যদি না কোনো বড় বিপর্যয় জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করে।[২৭৭]

আবদুল ওয়াহহাব আল-মাসিরি উল্লেখ করেছেন, তিনি পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক আমেরিকান বিজ্ঞানীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিরাট আবিষ্কার সম্পন্ন করে তার অনুভূতি কেমন? প্রত্যুত্তরে বিজ্ঞানী তার ভেতরের গোপন কথা বলে দিয়েছিলেন। এবং হিরোশিমা ঘটনার পর আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'যদি আমি জানতাম তারা এটি করতে চলেছে, তাহলে আমি একজন জুতা প্রস্তুতকারক হিসেবে কাজ করতাম।'[২৭৮] যদি বিজ্ঞান আবিষ্কারের পথ অনুসরণ করে এবং মানুষের সামনে নৈতিকতার বাধ্যবাধকতা ছাড়া সভ্যতা বিনির্মাণের ইট এবং ধ্বংসের বেলচা রাখে, তাহলে এটি অবশ্যই মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের কাছে পৌঁছে দেবে। কারণ সত্যের মূল্যবোধ মানুষকে বিরত না রাখলে মানুষের হিংস্রতা তার কল্যাণের ওপর জয়লাভ করবে।

> 'নৈতিকতা কী? তা নির্ধারণ করার মতো বিজ্ঞানের কোনো পদ্ধতি নেই।'[২৭৯] —রিচার্ড ডকিন্স

---

২৭৭. রিচার্ড কুক ও ক্রিস স্যামিস, ইনতিহারুল গারবি, আরবি অনুবাদক : মাহমুদ তাওবাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল আবিকান, ১৪৩০ হিজরি, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা ১৪০

২৭৮. প্রাগুক্ত।

২৭৯. Richard Dawkins, A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love (Boston: Mariner Books 2004) p.34

'ডারউইনীয় জীববিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞান'-এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করলে তা একটি ঐচ্ছিক বিষয়, প্রশংসা ও অবমাননার বিষয় এবং বিচার ও অগ্রগতির একটি মাপকাঠি হিসেবে বিলুপ্ত করতে হবে। কেননা তা জৈবিক বা স্নায়বিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়, যেখানে পছন্দ ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কোনো বিষয় থাকতে পারে না। বিষয়টির বাস্তবতা হলো, বিজ্ঞান বর্ণনামূলক, বাধ্যতার উৎস হতে অক্ষম। বিজ্ঞান মানুষের ক্রিয়াকলাপের বাস্তবতা এবং এর প্রভাব বর্ণনা করে, তবে এটি বাধ্যবাধকতার ভিত্তি হতে পারে না। এই কারণেই পিগলিউশি স্যাম হ্যারিসের বই 'দ্য মোরাল ল্যান্ডস্কেপ : হাউ সায়েন্স ক্যান ডিটারমাইন হিউম্যান ভ্যালুস'-এ মন্তব্য করে বলেছেন, 'হ্যারিস আশা করে বিজ্ঞান (বিশেষ করে নিউরোসায়েন্স) আমাদের নৈতিক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের যে নতুন নৈতিক ধারণা প্রদান করে, তার একটি উদাহরণ খুঁজতে পাঠক বইয়ের পাতায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করবে তবুও বিজ্ঞানের নতুন নৈতিক ধারণামতে কোনো উদাহরণ খুঁজে পাবে না।'[২৮০]

পিগলিউশি স্যাম হ্যারিসের বইয়ে প্রমাণ উপস্থাপনের যুক্তিকেও উপহাস করেছেন। বিশেষ করে হ্যারিসের এই আবিষ্কার, যেখানে বলা হচ্ছে, যখন মানুষকে তাদের গাণিতিক ও নৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন মস্তিষ্কের প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স কার্যকলাপ দেখায় যে, বিশ্বের বর্ণনা এবং মূল্যবোধের বিষয়গুলোর মধ্যে আমাদের পার্থক্য করা উচিত নয়! পিগলিউশি বলেন, এই যুক্তিটি কোনো নব্য নাস্তিকের লেখা সবচেয়ে হাস্যকর জিনিস।[২৮১] এটির সাথে শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া এবং নৈতিক কর্তব্যের প্রকারের মধ্যে কোনো আবশ্যক সম্পর্ক নেই।

> 'নৈতিকতাকে বৈজ্ঞানিক সূত্রে আবদ্ধ করার প্রতিটি প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।'[২৮২] —আইনস্টাইন

---

২৮০. Richard Dawkins, A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love (Boston: Mariner Books, 2004), p. 34.

২৮১. Massimo Pigliucci, 'New Atheism and the Scientistic Turn in the Atheism Movement', Midwest Studies in Philosophy, XXXVII (2013), p.150.

২৮২. Ibid., pp. 150-151

নন্দনতত্ত্বও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের বাইরে অবস্থিত। বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তিও মহাবিশ্বের সৌন্দর্যের প্রকৃতিকে স্বীকার করতে পারেন। যেমন ডকিন্স বলেছেন, 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা সঠিকভাবে জানা যায় বাস্তব জগৎটি খুব সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।'[৯৩] কিন্তু এই সৌন্দর্যকে মর্গ ও পরীক্ষাগারের ভাষায় ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তার নেই। সৌন্দর্য যদিও আকৃতির প্রতি সাম্য, রঙের সামঞ্জস্য এবং আকার ও ফাংশনের সাথে আকৃতির সামঞ্জস্যের মধ্যে স্পষ্ট, তবে এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হতে পারে না। বিজ্ঞান কদর্যতাকে চিনতে, সংজ্ঞায়িত করতে বা নিন্দা করতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা ও বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়বাদের মাঝে পার্থক্য

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানবাদের গৌরব, বিজ্ঞানের মাধ্যমে অন্য প্রতিটি দাবিকে (হোক তা বস্তুগত বা অধিবিদ্যাগত) বিচার করার ক্ষমতায়ন এই ভুল ধারণা জন্ম দেয় যে, বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞানের অর্জন সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী, তারা সকলেই বাস্তববাদী মতবাদে বিশ্বাস করেন। আর বিজ্ঞান সরাসরি ও নিশ্চিতভাবে বিশ্বের রহস্য উন্মোচনের সাথে সম্পর্কিত।

বিজ্ঞানবাদী নামে পরিচিত কতিপয়ের লেখা পাঠ করলে বিস্ময়ের সাথে দেখা যায়, তারা সাধারণভাবে বিজ্ঞানের নিশ্চয়তা প্রত্যাখ্যান করে এবং অস্বীকার করে যে, বিজ্ঞান বাস্তববাদী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধি করতে চায়। তাই বিশ্বের বাস্তবতা বোঝার জন্য বিজ্ঞানের যথার্থতা সম্পর্কে বিজ্ঞানবাদী বক্তব্য খুব ছোট দলিল প্রমাণও খুঁজে পায় না।

'বিজ্ঞান নিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করে না' এই কথাটি পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদীদের নির্দিষ্ট কোনো মতবাদ নয়; বরং এটি বিজ্ঞানের অনেক অনুশীলনকারী এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞানের দার্শনিকদের বক্তব্য।[৯৪] তাদের মতে, বিজ্ঞান বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় অনুসন্ধান করছে। তাদের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের আকর্ষণ এই সত্যের মধ্যে রয়েছে

৯৩. Max Jammer, Einstein and Religion (Princeton : Princeton University Press, 1999), p.69.

৯৪. Richard Dawkins, A Devil's Chaplain, p. 42.

যে, এটি কোনো ব্যক্তিকে নিশ্চিত করে না। কারণ এটি একটি অনুসন্ধান, একটি খণ্ডন, একটি প্রতিষ্ঠা এবং তারপর একটি পুনঃপরীক্ষা, একটি খণ্ডন ও মহাবিশ্বের নতুন চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা। বৈজ্ঞানিক ধারণা বিশ্বাসযোগ্য এই জন্য নয় যে তা অকাট্য; বরং তার মূল কারণ হচ্ছে এই ধারণাগুলো অতীতের সমস্ত সম্ভাব্য সমালোচনার মাঝেও টিকে আছে।[২৮৫]

তাদের মতে বিজ্ঞান কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারে না। 'এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত' কথাটিই অপ্রমাণিত। কারণ বিজ্ঞান অস্তিত্বের যেকোনো কিছুরই কোনো চূড়ান্ত শব্দকে মেনে নিতে অপারগ।[২৮৬] প্রতিটি দাবিতেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সন্দেহ তৈরি হয়। একটি স্বীকৃত তত্ত্বের অস্তিত্ব মূলত মূল বিষয়টির সত্যতায় নয়, বরং অন্য তত্ত্বগুলোর ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক 'সত্য' হলো পরিস্থিতিগত প্রয়োজনীয়তা। অতএব শুধু বিশ্বাসগত বক্তব্যের প্রতি বা দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রতি বৈজ্ঞানিক দাবির ভিত্তিতে আপত্তি উত্থাপন করা যে, 'বিজ্ঞান এগুলো খণ্ডন করেছে' যৌক্তিকভাবে সঠিক নয়। কারণ বাস্তবতা ছাড়া অন্য কিছু দাবিকে বাতিল করে না।

সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতিবিজ্ঞানও অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আরোহ[২৮৭] স্বল্পতার জটিলতার মুখোমুখি হয়, যা মহাবিশ্বের ধ্রুব নিয়মগুলো

---

২৮৫. Carlo Rovelli, "Science Is Not About Certainty," The New Republic, July 11, 2014.
https://newrepublic.com/article/118655/theoretical-physicist-explains-why-science-not-about-certainty

২৮৬. এটা অনেক বিজ্ঞানবাদীর বক্তব্য। এ ক্ষেত্রে আমার মত হচ্ছে তা বাড়াবাড়ি। কেননা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এমন কিছু বিষয় রয়েছে, ইন্দ্রিয় বা হিসাবের মাধ্যমে যার সঠিকতার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি।

২৮৭. Induction : একটি সামগ্রিক বিধান লাভ করার জন্য তার অংশবিশেষ পরীক্ষা করা। তা দুই প্রকার : সামগ্রিক ও আংশিক। আংশিক আরোহ : একটি সামগ্রিক বিষয়ের অন্তর্গত অংশবিশেষ নিয়ে পরীক্ষা করা। যদি এই অংশের ওপর কোনো বিধান পাওয়া যায়, তাহলে সমগ্রের ওপরেও এই বিধান কার্যকর হবে। (গাজালি, মি'ইয়ারুল ইলমি ফি ফান্নিল মানতিক। আহমদ শামস উদ্দিন কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত, বৈরুত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ। প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ। পৃষ্ঠা ১৪৮।) অর্থাৎ অংশের ওপর পরীক্ষা করে আমরা যে ফল পেয়েছি তার সমগ্রের ওপরেও একই বিধান আসবে। যেমন আমরা যত কাক দেখেছি সব কালো। এজন্য আমরা বলি সকল কাক কালো। আমাদের এই কথায় যেসব কাক আমরা দেখিনি সেগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

উন্মোচনের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করতে অক্ষম। যেহেতু সম্পূর্ণ আরোহ অনুমান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। কারণ আমরা বিশ্বের সকল একই রকম জিনিস পরীক্ষা করে বিচার করতে পারি না যে, তারা একই আইনের অধীন। তাই সীমিত সংখ্যক লোহার টুকরা পরীক্ষা করে আমরা বলি, লোহা তাপের কারণে প্রসারিত হয়। সকল বিজ্ঞানীও একমত যে, সমস্ত লোহা তাপে প্রসারিত হয়।

বিজ্ঞানের দার্শনিক কার্ল পপার বলেছেন, আরোহ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। তিনি এটি স্বীকার করেছেন, বিজ্ঞানীরা সকল কিছুর বাস্তবতা উন্মোচন করতে পারবে না। সর্বোচ্চ তারা যা করতে পারে তা হলো এমন অনুমান উপস্থাপন করা, যা একটি ঘটনা আবিষ্কার করার সময় বিপরীত হতে পারে, যেমন হওয়ার কথা তেমন নাও হতে পারে। এটি প্রায়োগিকভাবে অসম্পূর্ণ আরোহ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। এভাবে বলা যাবে না যে, অসম্পূর্ণ প্রস্তাবনা দক্ষ এবং উপকারী। অতএব আমাদের অবশ্যই এর বিধানগুলোকে সাধারণীকরণ করতে হবে। যেহেতু বিষয়টি কার্যকারিতা এবং সাধারণীকরণের মাঝে এক নয়।

একই সমস্যায় রাসেল লিখেছেন, 'যারা বৈজ্ঞানিক আরোহ আঁকড়ে ধরে এবং এর সংজ্ঞায় অটল থাকে, তারা নিশ্চিত করতে চায় সমস্ত যুক্তিই অভিজ্ঞতামূলক। তাই তাদের থেকে এটা প্রত্যাশা করা যায় না যে, তারা এটি মেনে নেবে, আরোহ অনুমান (যা তাদের অতি প্রিয় পছন্দনীয়) এর নিজের জন্য একটি যৌক্তিক নীতি আবশ্যক, যা প্রমাণ করা যায় না এবং যা নিজেই একটি আরোহী অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রয়েছে। কারণ এর জন্যও একটি পূর্বনীতি আবশ্যক।'[২৮৮]

সামগ্রিক আরোহ : সব অংশ দ্বারাই প্রমাণ উপস্থাপন এবং সমগ্রের ওপর বিধান আরোপ। (থানভি, মাওসুআতু কাশশাফিল ইস্তিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলুম, ১/১৭২) যেমন আমরা জানতে চাইলাম দ্বীপের অধিবাসীরা কি তিউনিসীয় ছিল না-কি ছিল না? এখন আমরা প্রত্যেক অধিবাসীর পূর্বপুরুষের সন্ধান করব, যাতে করে একটি সামগ্রিক বিধান আরোপ করা যায়।

২৮৮. যাকি নাগিব মাহমুদ। আল মানতিকুল ওয়াদ'ইয়, ২/২৯৮

'বিভিন্ন নিয়মের রহস্য উন্মোচন করা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ লক্ষ্য' এই বক্তব্যটি বিজ্ঞানকে প্রতিটি অধ্যায় অনুসন্ধান করার এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বিবেচনাকে একচেটিয়া করার যোগ্যতা প্রদান করে। বিজ্ঞান এখানে মুখোমুখি এভাবে যে, বিভিন্ন নিয়মনীতির রহস্য উন্মোচন এই স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে আছে—বোধগম্য বিষয় ও দুর্বোধ্য বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এই স্বীকৃত বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা করলে এভাবে বলা যায়, অসম্পূর্ণ আরোহ 'নিঃসন্দেহে' বিজ্ঞানবাদের জন্য একটি সমস্যা সৃষ্টি করে। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ বৈধ নয়। তবে আমরা এটাও বলি, অসম্পূর্ণ আরোহ সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী নয়। আমরা যদি সাধারণীকরণের সময় পর্যবেক্ষণকে গ্রহণ করি এবং কোনো জিনিসের ব্যাপারে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের হুকুম প্রয়োগ করি, তবে যখন এই বৈশিষ্ট্যটি উক্ত জিনিসের অন্যান্য প্রকারের মধ্যেও পাওয়া যাবে, তখন আংশিক আরোহ থেকে সাধারণ বিধানের দিকে যাওয়া সঠিক। যেমন আমরা বলি, একটি উদ্ভিদের তিক্ততার কারণ হলো এতে একটি রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি। এটি কোনো কিছুতে রাখার সাথে সাথে তা তিক্ত হয়ে যায়। এখানে আমরা বলতে পারি, এই এই উদ্ভিদের বংশের সমস্ত সদস্যই তিক্ত; এমনকি যদি আমরা পরীক্ষা না করেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এই বিষয়টি বাস্তবে কার্যকারণের জন্য, আংশিক আরোহের জন্য নয়।

আমরা আরও বলি, একটি পরীক্ষার সমর্থনকারী যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা আরোহের ফলাফলগুলোকে সাধারণীকরণ করা সম্ভব। তা হলো সাধারণ কার্যকারণের নীতিকে মেনে চলার মাধ্যমে, যা বলে, প্রতিটি ঘটনার একটি কারণ রয়েছে। আর কারণের বহুল প্রচলিত নীতি হচ্ছে প্রতিটি ঘটনা অবশ্যই একটি প্রাকৃতিক ফলাফল তৈরি করে এবং কারণ ও ফলাফলের মধ্যে আনুপাতিকতার নীতি রয়েছে, যা বলে, প্রতিটি দল যারা নিজ বাস্তবতা ও বৈশিষ্ট্যগুলোতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, আবশ্যিকভাবে এগুলো কারণ ও ফলাফলের ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।[২৮১] যদি বিষয়গুলো উল্লেখিত নীতির মতো না হয়,

২৮১. আবদুল্লাহ দায়াজানি, ইবনে তাইমিয়ার জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতি : তাইমীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির বিশ্লেষণমূলক পাঠ। (লন্ডন : মারকাযু তাকভিন, ১৪৩৫ হিজরি, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৫৩২

তবে আমরা বিশ্বকে বিশৃঙ্খল দেখব এবং সমস্ত নিরীক্ষার ফলাফল অসামঞ্জস্য হয়ে যাবে।

সুতরাং বিজ্ঞানবাদ কিছুতেই তার বক্তব্যগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করতে পারবে না। কারণ যুক্তি ও তার রীতিনীতির মাঝে পর্যবেক্ষণের সাহায্য চাওয়া ব্যতীত পরিপূর্ণ আরোহ অসম্ভব।[৯০]

৯০. ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এমনিভাবে অভিজ্ঞতার বিষয়সমূহ। সাধারণ মানুষের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, পানি পান করলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়। গর্দান উড়িয়ে দিলে মৃত্যু ঘটে। কঠোর প্রহারে ব্যথা অনুভূত হয়। এই সামগ্রিক বিষয়গুলোর জ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক। কেননা ইন্দ্রিয় শুধু নির্দিষ্ট তৃষ্ণা নিবারণ বোঝে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু বোঝে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যথা বোঝে। এখানে যার ওপর কর্ম সম্পাদিত হয়েছে সেও এমনটাই বোঝে। এই সামগ্রিক বিষয়গুলো অনুভবের দ্বারা জানা যায় না, বরং ইন্দ্রিয়ের সাথে আকলের সংযোগের মাধ্যমে জানা যায়।' (আর রদ্দু আলাল মানতিকিইয়্যিন, বৈরুত : দারুল মারেফা, পৃষ্ঠা ১২-১৩)

বিজ্ঞানবাদের আত্মহনন

> 'যে নারী মজবুত করে সুতা পাকানোর পর তার পাক খুলে সুতাগুলো আলাদা করে ফেলে, তোমরা তার মতো হয়ো না।' [সুরা নাহল, আয়াত ৯২]

> সভ্যতার পরিসমাপ্তি ঘটে আত্মহত্যার মাধ্যমে, স্বাভাবিক মৃত্যুতে নয়।'[২৯১]
>
> —ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়নবি[২৯২]

বিজ্ঞানবাদ বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে আদর্শের ক্ষেত্রে নিজেকে অত্যন্ত দৃঢ় হিসেবে উপস্থাপন করে; অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কার, পরস্পরবিরোধী, ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুকে বিজ্ঞানবাদ সত্য হিসেবে গ্রহণ করার স্বীকৃতি প্রদান করে না। অস্পষ্ট বা মিথ্যা থেকে সত্যকে নিরাপদ রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং যা অন্যদের সামনে কোনো দাবি প্রমাণ করার চেষ্টা করে তার দায়িত্ব হচ্ছে প্রশ্নের জন্য একটি সঠিক উত্তর প্রস্তুত করে রাখা।

এর মাধ্যমে বাস্তবতার সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য বিজ্ঞানবাদ নিজ শর্তের আলোকে নিজেকে কিছু জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি করে ফেলে। ফলে অনিবার্যভাবে এমন কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয় :

- বিজ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে তার বৈজ্ঞানিক রূপ কী?

---

২৯১. Cited in: Paul Starobin, After America: Narratives for the Next Global Age (New York: Penguin, 2009), p.23

২৯২. Arnold Toynbee (১৮৮৯-১৯৭৫) একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক।

- বিজ্ঞানবাদের নির্ধারিত শর্তানুযায়ী তা কি সঠিকতার মাপকাঠিতে সফলতা লাভ করে? বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তির দাবিকৃত প্রতিটি দাবির কি প্রমাণ রয়েছে?
- বস্তুবাদী বিজ্ঞানবাদীদের জগতে একটি মন ও বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কি সম্ভব?

নিজ মানদণ্ডে বিজ্ঞানবাদের স্বরূপ

বিজ্ঞানবাদীদের নিকট বিজ্ঞান সত্যের অনুসন্ধানে সুদৃঢ়। তা কোনো আবেগিক বিষয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন করে না, প্রথাগত কোনো বিষয়ের তোষামোদি করে না, বহুল প্রচলিত কিছুর ওপর নির্ভর করে না। এটি নিজ পদ্ধতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে একটি অদমনীয় মতবাদ। সুতরাং যা সায়েন্টিফিক সিলেকশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না, তা আবশ্যিকভাবে সত্যের মাপকাঠি থেকে ছিটকে যায়।

বিজ্ঞানবাদের সঠিকতা যাচাই করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমস্যা হলো, বিজ্ঞানবাদ গবেষণা নীতির সাথে স্ববিরোধী। কোনো দাবি স্ববিরোধী হওয়া মানে হচ্ছে দাবিটি বাস্তবতা অনুযায়ী হওয়ার জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করে এবং তারপর এই মানদণ্ডের শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

উদাহরণস্বরূপ :

১. একটি দাবি বলে, বাস্তবতা বলতে কিছু নেই।
২. যদি বাস্তবতা বলতে কিছু না থাকে, তাহলে পূর্ববর্তী দাবিটি বাতিল। কারণ এটি বাস্তবতার অস্তিত্বের কথা বলে। আর তা হচ্ছে বাস্তবতা অস্তিত্বহীন।

= দাবিটি বাস্তবতার অনস্তিত্বের কথা বলায় শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ :

১. শব্দ কোনো অর্থ নির্দেশ করতে পারে না।
২. শব্দ যদি অর্থ নির্দেশ না করে, তাহলে আগের বাক্যটি অর্থহীন।

= অর্থ নির্দেশ করার জন্য শব্দের পূর্ণাঙ্গ ত্রুটির দাবির জন্য তা শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

তৃতীয় উদাহরণ :

১. নিশ্চিতভাবে কিছু জানা সম্ভব নয়।

২. কোনো কিছুর সুনিশ্চিত জ্ঞান অসম্ভব হওয়া দাবিটি নিজেকেই নিশ্চিত হিসেবে উপস্থাপন করছে।

= দাবিটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়তা উপলব্ধির অক্ষমতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞানবাদের বক্তব্য বিবেচনা করলে এটা জানা যায় যে, বিজ্ঞানবাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবতা হলো এমন প্রতিটি দাবি, যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপযুক্ত এবং তারপর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জ্ঞানতত্ত্বের একটি মতবাদ হিসেবে বিজ্ঞানবাদ কোনো বস্তুগত বাস্তবতা নয়, যা ল্যাবের পরীক্ষা, আকৃতিগত পরিমাপ বা জৈবিক বিশ্লেষণের আওতাধীন হতে পারে। এটি একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা পরিমাপ করা যায় না। এটির একটি আকৃতিগত বিবরণ বের করার জন্য পরিমাণগত কার্যক্রম সম্ভব নয়, বা এটি অনুসন্ধানী পরীক্ষার বিষয় নয়। অতএব বিজ্ঞানবাদকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা অসম্ভব। তাই সত্যের পরীক্ষায় বিজ্ঞানবাদ অপরিহার্যভাবে ব্যর্থ।

ভিন্ন ভাষায় বলা যায় : বিজ্ঞানবাদ হলো বিজ্ঞানের দর্শনের একটি বিবৃতি যা বলে, কোনো প্রক্রিয়া যদি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রাখার দাবি করে, তাহলে অবশ্যই তা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যাতে করে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার মাঝে যা আমাদের মস্তিষ্ক বহির্ভূত, তার সাথে প্রক্রিয়াটির সামঞ্জস্য পরীক্ষা করা যায়। বিজ্ঞানবাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানতাত্ত্বিক দাবি হচ্ছে সেগুলো, যা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব।' এই বক্তব্য অনুযায়ী বিজ্ঞানবাদ নিজেই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকে না। বিজ্ঞানবাদ শুধু দার্শনিক বিবৃতি, যা পরিমাপ করা যায় না কিংবা ল্যাবে পরীক্ষা করা যায় না। মূলত এমন কিছুকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা যায় না। আর যা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা যায় না তা সত্য হিসেবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তা মূলত বিজ্ঞানবাদীদের দাবিকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ধর্মীয় অদৃশ্যে বিশ্বাসীদের মিথের মতো একই ধরনের একটি মিথ।

বিষয়টিকে বেশ আকর্ষণীয়ভাবে আমেরিকান দার্শনিক জে.পি. মোরল্যান্ড[৯৩] (বিজ্ঞানবাদ সম্পর্কিত তার বইতে) উপস্থাপন করেছিলেন। মোরল্যান্ড বক্তৃতা

---

৯৩. J. P. Moreland (১৯৪৮-) : মার্কিন দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক। আমেরিকায় নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যারা কলম ধরেছেন তাদের মাঝে অন্যতম, স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণে তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি রয়েছে।

…ছিলেন এমন একটি সভায়, যেখানে পদার্থবিজ্ঞানের একজন পিএইচডি ছাত্র উপস্থিত হয়েছিলেন। এই যুবকটি জ্ঞান অর্জনের জন্য তার জীবনের প্রথম ধাপ সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন কীভাবে তিনি দর্শন অধ্যয়নে আগ্রহী ছিলেন। তারপর তিনি অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। এরপর তিনি শুধু সেসব দাবিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করতেন, যা পরিমাপ ও ল্যাবের পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ছিল।

মোরল্যান্ড বলেন, আমি তাকে দুই বা তিন মিনিটের জন্য কথা বলতে দিলাম, তারপর এমনভাবে তার কথাকে খণ্ডন করলাম যে, সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। আমি বললাম, জনাব, আপনি গত কয়েক মিনিটে ত্রিশ বা চল্লিশটি দাবি করেছেন, এবং আমি যতদূর বলতে পারি সেগুলোর একটিও পরিমাপ করা বা বৈজ্ঞানিকভাবে ল্যাবে পরীক্ষা করা যাবে না। কিন্তু এটি আমাকে একটি সমস্যায় ফেলে দেয়। আপনার নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ী, আপনি এই আলোচনায় যা উল্লেখ করেছেন তা হলো আপনার ব্যক্তিগত মতামত এবং অনুমান। অতএব এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, কেন আমি বা অন্য কেউ আপনাকে আলোচনার সুযোগ দেবে অথবা আপনি যা বলেছেন তা সত্য হিসেবে বিশ্বাস করবে?

তারপর লজ্জায় লোকটির মুখ লাল হয়ে গেল এবং তিনি দ্রুত আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করলেন!

মোরল্যান্ড এই ক্ষেত্রে মন্তব্য করে বলেছেন, 'এখানে অস্বস্তিকর বিষয় হচ্ছে কেউ একজন উল্লেখ করে যে, আপনি এইমাত্র একটি বিবৃতি দিয়েছেন। যদি এটি সত্য হয় তবে সে তৎক্ষণাৎ নিজেকে ভুল হিসেবে মেনে নেবে। যারা দৃঢ় বিজ্ঞানবাদে বিশ্বাস করেন তারা নিশ্চিতভাবেই সেই দ্বিধায় পতিত হয়।'[২৩৪]

> যখন বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞানবাদকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, তারা মূলত সক্রিয়ভাবে এটিকে খণ্ডন করছেন। কারণ বিজ্ঞানবাদ নিজেই একটি অধিবিদ্যাগত অবস্থানে রয়েছে, যাকে শুধু অধিবিদ্যাগত যুক্তি ব্যবহার করে যৌক্তিক হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।[২৩৫]
>
> —দার্শনিক এডওয়ার্ড ফিসার

২৩৪. J. P. Moreland, Scientism and Secularism, pp.52-53

২৩৫. Edward Feser, The Last Superstition: A refutation of the new atheism, p.84

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যুক্তিসমূহ ধারাবাহিকভাবে হওয়ার অসম্ভাব্যতা

গঠনগতভাবে বিজ্ঞানবাদ এমন জ্ঞান যা মহাবিশ্বের বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানবাদ জ্ঞানের একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করার দাবি করে, যা এটির বাস্তবতা এবং বক্তব্যসমূহের মাঝে সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয়। পাশাপাশি এই বক্তব্যের সাথে মহাবিশ্বের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে। সুতরাং তা প্রধান জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলো অর্থাৎ Foundationalism,[২৯৬] Coherentism,[২৯৭] Pragmatism[২৯৮] এর মাঝে নিজ অবস্থান নির্ধারণ করার দাবি করে।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই এমন প্রতিটি দাবিকে বিজ্ঞানবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে; অর্থাৎ পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক সমর্থন ব্যতীত কোনো বক্তব্য গ্রহণ করা যাবে না। (এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী) বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়া কোনো গ্রহণযোগ্য দাবি থাকতে পারে না। যা একটি পরম প্রাথমিক দাবি নির্মাণের অসম্ভাব্যতাকে আবশ্যক করে। কারণ (এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী) এমন সব ভূমিকা আবশ্যক হয়ে যায়, যার কোনো ইতি নেই।[২৯৯] বিজ্ঞানবাদ শেকড় থেকে ফল পর্যন্ত পথ প্রদর্শন করে। এবং আপনি যদি প্রতিটি দাবির সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানবাদ অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি এটিকে সমর্থন করার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হবেন। যার মানে এই যে, বিতর্কের ধারাবাহিকতার কোনো সূচনা নেই। কারণ প্রতিটি যুক্তির সমর্থন প্রয়োজন। প্রতিটি 'কেননা' একটি প্রশ্ন 'কেন?'-এর অনুসরণ করে।

---

২৯৬. জ্ঞানতত্ত্বের একটি পরিভাষা বলে, জ্ঞানের ভিত্তি কিছু প্রাথমিক নীতির ওপরে, যা এর পূর্বের কোনো রেফারেন্স দেয় না। কারণ প্রত্যেক দাবির ব্যাপারে দলিল পেশ করা তাসালসুল তথা অন্তহীন ধারবাহিকতা বা চক্রকে আবশ্যক করে।

২৯৭. জ্ঞানতত্ত্বের একটি পরিভাষা বলে, একটি দাবি তখনই সঠিক হিসেবে ধর্তব্য হবে যখন তা একই নীতির অন্যান্য দাবির সাথে বিরোধপূর্ণ না হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

২৯৮. এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দাবি যদি এমন পন্থায় কাজ করে যা কল্যাণকর হয়, তাহলেই সেই দাবি সঠিক।

২৯৯. অর্থাৎ প্রত্যেক দাবির পেছনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুঁজতে খুঁজতে দিনশেষে এমন কোনো দাবির অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না, যেটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হতে পারে। কারণ বিজ্ঞানবাদ সেই নীতির দাবিটা করেছে, সেটার পেছনেও বৈজ্ঞানিক কোনো প্রমাণ আদতে নেই।

উদাহরণস্বরূপ :

ওমর : আমার বাড়ির সামনে রাস্তায় বৃষ্টি হয়েছে।

খালেদ : আপনি কীভাবে জানলেন?

ওমর : কারণ আমি বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ শুনেছি।

খালেদ : আপনি কি আকাশ থেকে বৃষ্টি নামতে দেখেছেন?

ওমর : হ্যাঁ, বাসা থেকে বের হয়ে দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে।

খালেদ : আপনি যা শোনেন এবং দেখেন তা বিশ্বাস করেন কেন?

ওমর : কারণ আমার আকল আমার ইন্দ্রিয়ের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে।[৩০০]

খালেদ : আপনি আপনার আকলকে বিশ্বাস করেন কেন?

ওমর : কারণ আমি দেখেছি আকলের সিদ্ধান্ত সঠিক।

খালেদ : এটি মূলত চক্রের ওপর ভিত্তি করে প্রমাণ উপস্থাপন। আপনি আপনার আকল দিয়েই আকলের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করছেন। আপনি আমাকে বলুন, আপনার আকল ছাড়া আপনার আকলের সঠিকতার প্রমাণ কী?

ওমর...!

মানবীয় প্রতিটি বিশ্বাসের পেছনে যুক্তি অন্বেষণ করা অথবা তার পক্ষাবলম্বন করা প্রতিটি যুক্তির নেপথ্যে অপর একটি যুক্তি খোঁজার দিকে পরিচালিত করে। এটি মূলত সূচনাবিহীন যুক্তির ধারাবাহিকতায় প্রবেশ করে, যার অর্থ চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

রয় ক্লাউজার[৩০১] এই সমস্যাটির কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন : এটা অসম্ভব যে, আমরা যে বিশ্বাসগুলো প্রমাণ করেছি, শুধু সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। প্রথমত যদি প্রতিটি বস্তুর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রতিটি প্রমাণের ভিত্তিকে প্রমাণ করার প্রয়োজন হবে।

৩০০. এই ধারণা মূলত আসে ফ্রান্সিস বেকন থেকে, যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতন্ত্রের জনক ধরা হয়। তার মতে, ফিজিকাল ওয়ার্ল্ডকে বুঝতে হলে পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয় ছাড়া উপায় নেই।

৩০১. Roy Clouser (১৯৩৭-) : মার্কিন দার্শনিক। ধর্মের দর্শন ও বিজ্ঞানের দর্শন এবং ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্কে তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

কিন্তু আপনি যদি প্রতিটি প্রমাণের ভিত্তি প্রমাণ করতে চান, তাহলে আপনার যুক্তির জন্য একটি যুক্তি এবং আপনার যুক্তির যুক্তির জন্য আরেকটি যুক্তির প্রয়োজন পড়বে। এভাবেই চিরকাল চলতে থাকবে। এজন্য সবকিছুর প্রমাণ দাবি করা অযৌক্তিক। কারণ কোনো সূচনা ব্যতীত যুক্তির ধারাবাহিকতা অসম্ভব। তাই যদি প্রমাণের মূলনীতিরও একটি প্রমাণ প্রয়োজন হয়, তাহলে মূলনীতি প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তিগুলোর ধারাবাহিকতা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত এমন একটি যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে, যার সবগুলো মূলনীতি মৌলিক (basic)। অর্থাৎ যা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি বিশ্বাস প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না এবং কোনো কিছু প্রমাণ করা নির্ভর করে এমন বিশ্বাসের অস্তিত্বের ওপর, যার প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

'প্রতিটি বিশ্বাস প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না' এ কথা বলার দ্বিতীয় কারণ হলো সঠিকভাবে প্রমাণ উপস্থাপনের নিয়ম, যেমন যুক্তিবিদ্যা এবং গণিতের তথ্য নিজেকে প্রমাণ করার মতো দলিল উপস্থাপন করতে পারে না। কারণ এগুলোই মূলনীতি যা আমাদের যেকোনো কিছু প্রমাণ করতে ব্যবহার করতে হয়। আমরা যদি এটিকে তার নিজের পক্ষে প্রমাণ তৈরি করার জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করি, তাহলে এই প্রমাণগুলো সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হবে, যা আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। সুতরাং যুক্তিগুলোকে অপ্রমাণিত নিয়ম দ্বারা বিশ্বাস করতে হবে, সেই সাথে এমন অনুমানগুলোও, যা আমরা প্রমাণ ছাড়াই জানতে পারি।[৩০২]

সূচনাবিহীন বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানের ধারাবাহিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে প্রমাণহীন কিছু প্রাথমিক আরোহ অনুমানকে 'basic beliefs' মেনে নিতে হবে। আর এর ওপরেই চিন্তাধারার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে। এগুলোই আমাদের বিবেকবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ সত্যায়নের মৌলিক ভিত্তি। কেননা বিবেকবোধের মাধ্যমে বিবেকবোধ কিংবা ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়ের সত্যায়ন করা অসম্ভব। এটি হচ্ছে কোনো কিছুর বৈধতার জন্য সেই জিনিস দিয়েই যুক্তি উপস্থাপন। এবং আমরা এটি করি, কারণ আমরা আমাদের চিন্তাভাবনাকে এই নীতির ওপর স্থাপন করি যে, বৈপরীত্য পাওয়ার আগপর্যন্ত সকল কিছুকে তার বাহ্যিক রূপেই গ্রহণ করা হবে। এজন্য ইবনে হাজম বলেছেন, আমরা যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, যা দ্বারা শরয়ি আহকাম ও প্রাকৃতিক কার্যাবলি সঠিক হয়, তার

৩০২. Roy Clouser, Knowing with the Heart (VP, 1999) pp. 68-71

স্তরের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এর মাঝে শুধু তাই উপস্থাপিত হয়, অনুরূপ বিষয় থেকে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা যা নির্ধারণ করে, যতক্ষণ না এটি বিবেকবোধ ও ইন্দ্রিয়ের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পৌঁছায়।[৩০৩]

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে প্রাগমেটিক। তবে এটি দালিলিক ও প্রমাণসিদ্ধ বিষয় নয়, যেমনটা বিজ্ঞানবাদ দাবি করে কিংবা যেমনটি তা হওয়া উচিত। কারণ বিজ্ঞানবাদ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে শর্ত দেয় যে, এটি উপকারী হতে হবে। যদিও এর তত্ত্ব অপ্রমাণিত প্রাথমিক কিছু ভূমিকা বা অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বাস্তববাদের প্রতি বিজ্ঞানের পক্ষপাতিত্ব তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। কেননা বিজ্ঞানবাদ নিজ মিশনারি বক্তব্যে এই কথার ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে যে, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য হলো পরীক্ষা এবং গণনার মাধ্যমে মহাবিশ্বের স্বরূপ উন্মোচন। অন্যদিকে বাস্তববাদ মানে এটা নয় যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বাহ্যিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য করা হবে। বরং তত্ত্বটি সঠিক হওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক কাজ থেকে একটি উপকারিতা বা কল্যাণ অর্জন করাই তার জন্য যথেষ্ট।

বিজ্ঞানবাদ ও বিবেকবোধের বিনাশ

নাস্তিকদের বিজ্ঞানবাদের ভিত্তি মূলত অধিবিদ্যাগত প্রকৃতিবাদকে গ্রহণ করে নেওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ 'বস্তু ও শক্তি' এই দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। জ্ঞানীয় গবেষণার লক্ষ্য হলো জীববিজ্ঞান ও রসায়নের পরিভাষায় সমস্ত অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা।[৩০৪] সুতরাং মানুষের মধ্যে এমন বিশেষ কিছু নেই, বরং এটি একটি জৈবিক গঠন বা একটি অন্ধ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার যান্ত্রিক প্রভাব।

বিজ্ঞানবাদের প্রতি বিজ্ঞানবাদীদের যে পক্ষপাতিত্ব তা অপরিহার্যভাবে তাদেরকে ডারউইনের মতবাদকে গ্রহণ করতে পরিচালিত করেছিল, যা মস্তিষ্ক সহ সমগ্র জৈবিক জগতের এলোমেলো বিবর্তনের কথা বলে। এটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিত্তিতে টিকে থাকার সংগ্রামের জন্য লড়াই করেছিল।

---

৩০৩. রসাইলু ইবনি হাজম, তাহকিক : ইহসান আব্বাস (বৈরুত : আল মুআসসাসাতুল আরাবিয়্যাতু লিদ দিরাসাতি ওয়ান নাশরি, ১৯৮৭) ৪/৩০৮

৩০৪. Francis Crick, Of Molecules and Man (Washington, University of Washington Press, 1966), p.10

ডোনাল্ড হফম্যান 'The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes' নামে একটি বই লিখেছেন।[৩০৫] তাতে তিনি বর্ণনা করেছেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদের বক্তব্য দাবি করে, "এটি মেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, আমরা বস্তুজগতের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সম্মিলিত বিভ্রম দ্বারা প্রভাবিত। কেননা আমাদের জাতি 'হোমো সেপিয়েন্স' আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক নির্বাচন এমন উপলব্ধিগুলোর পক্ষে ছিল, যা সত্যকে আড়াল করে আমাদেরকে উপকারী কাজের দিকে পরিচালিত করে এবং আমাদের জীবিত রাখতে ও সংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে আকৃতি প্রদান করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছে। এটি মানুষকে অনেক বিভ্রম প্রদান করে ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণগুলোকে প্রতিহত করছে, যা তাকে বাস্তবতার সাথে ইতিবাচক ও নিরাপদ মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করে।"

'Evolved to be irrational? Evolutionary and cognitive foundations of pseudosciences' গ্রন্থের লেখকদ্বয় এ কথা বলে তাদের বক্তব্য শেষ করেছিল যে, মানুষ বায়োলজিক্যালি বিবর্তিত হওয়ার কারণে কখনো কখনো যুক্তিহীন হয়ে ওঠে। যদিও এটি সম্ভব যে আমরা যেন যুক্তিহীন না হই সেজন্য আমরা বিবর্তিত হব না।[৩০৬] তাই ডারউইনীয় বোধের সামঞ্জস্য অনুযায়ী মানুষের কল্পকাহিনির ভান্ডারের প্রয়োজন হবে, যা তাকে পরিবেশের সাথে একাত্মতার নিশ্চয়তা দেবে।

> মস্তিষ্ক যেহেতু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মাধ্যম, প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিকট বন্দি, তাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিপূর্ণভাবেই মস্তিষ্কের নিকট একটি বিভ্রম। কেননা জ্ঞানের চাহিদা হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বকে প্রমাণিত করার ব্যাপারে পরিতুষ্ট করা, আবশ্যিকভাবে বাস্তবতার জ্ঞানকে নিশ্চিত করা তার উদ্দেশ্য নয়।

---

৩০৫. The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes, New York: W.W. Norton & Company, 2019

৩০৬. Stefaan Blancke & Johan De Smedt, Evolved to be irrational? Evolutionary and cognitive foundations of pseudosciences, Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem, eds. Massimo Pigliucci and Maarten Boudry, p.375

এ ছাড়াও অধিবিদ্যাগত প্রকৃতিবাদ গ্রহণ করা মানুষকে এমন একটি যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে, যা মস্তিষ্কের স্পন্দন এবং রসায়নের মিথস্ক্রিয়া অনুসারে সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এটি সত্য জানার ব্যাপারে সত্তার প্রচেষ্টাকে বাতিল করে দেয়, যাতে মস্তিষ্ক এমন একটি যন্ত্রে পরিণত হয়, যা অন্ধভাবে কার্য সম্পাদন করে। কারণ এটি এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যা নিজের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং অনিবার্যভাবে বাহ্যিক ঘটনার বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না। মানুষকে প্রকৃতির অন্ধ শক্তির একটি নিদর্শনে রূপান্তরিত করা এবং তাকে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যান্ত্রিক কাজে নামিয়ে আনার মাধ্যমে বিজ্ঞান মানুষকে ও তার বিবেকবোধকে বাতিল করে দেয়।

তাই ব্রিটিশ মস্তিষ্ক বিজ্ঞানী প্যাট্রিক হ্যাগার্ড[৫০৭] বলেছেন, “একজন স্নায়ুবিজ্ঞানী হিসেবে আপনাকে অদৃষ্টবাদী হতে হবে। মস্তিষ্কের এখানে ভৌত নিয়মগুলোর অধীনে বৈদ্যুতিক এবং রাসায়নিক ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তিষ্কে আপনি একই পরিস্থিতিতে ভিন্ন হতে পারবেন না। এমন কোনো ‘আমি’ নেই যা বলতে পারে, ‘আমি এর বিপরীত করতে চাই।”[৫০৮]

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় দুই বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী জন টুবি[৫০৯] এবং লিডা কসমেডিস[৫১০] বলেছেন, ‘মস্তিষ্ক হলো একটি বস্তুগত সিস্টেম, যার কার্যক্রম শুধুমাত্র রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের আইনের অধীন। এটার মানে কী? অর্থ হচ্ছে আপনার সমস্ত চিন্তাভাবনা, আশা, স্বপ্ন ও অনুভূতি যা আপনার মাথায় চলছে সবই রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত হয়।’[৫১১]

---

৫০৭. Patrick Haggard: University College London-এ কগনিটিভ নিউরো সায়েন্সের শিক্ষক।

৫০৮. Cited in: Rupert Sheldrake, Science Set Free: 10 Paths to New Discovery (Deepak Chopra Books, 2013), p.17

৫০৯. John Tooby (১৯৩৮-) : মার্কিন জীববিজ্ঞানী, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানে বিশেষ আগ্রহী।

৫১০. Leda Cosmides (১৯৫৭-) : মার্কিন মনোবিজ্ঞানী, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির শিক্ষক।

৫১১. John Tooby and Leda Cosmides, ‘Evolutionary Psychology: A Primer: in Visions of Culture: An Annotated Reader, ed. Jerry D. Moore (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2019), p.420

আমরা এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, আমাদের কোনো ইচ্ছা নেই, যদি এই মহাবিশ্বের পরমাণুর সমষ্টি এবং তাদের মধ্যে বস্তুগত সম্পর্ক থেকে অস্তিত্ব বিচ্যুত না হয়। কারণ যদি সমীকরণের উপাদানগুলো বস্তুগত হয় (বিজ্ঞানের কাছে পরিচিত পদার্থের বিন্যাস অনুযায়ী), তাহলে বিজ্ঞান যে চিত্রের সাথে পরিচিত, সেখানে অপদার্থগত সম্পর্কের কোনো সুযোগ থাকবে না। ডকিন্সের বক্তব্যের দাবি এটাই, মহাবিশ্ব গতিশীল পরমাণুর একটি সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। মানুষ শুধুমাত্র ডিএনএ উৎপাদনের একটি যন্ত্র। আর ডিএনএ ছড়িয়ে যাওয়া একটি স্বনির্ভর প্রক্রিয়া।[৩১২]

মস্তিষ্ক যদি শুধু পরমাণু এবং বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের একটি সমষ্টি হয়, তাহলে আমাদের চিন্তাভাবনা মস্তিষ্কের নিকট পর্যবেক্ষণহীন মিথস্ক্রিয়াগুলোর একটি গুচ্ছ মাত্র। তা শুধু নিজেদের সাক্ষাতে স্বাধীন সক্রিয়তা প্রতিফলিত করে, যে সক্রিয়তা সাক্ষাতের আগে ও পরে একই মানুষের মেধায় হয়। আর আমাদের এই কথা—শ্রবণশক্তিহীন পদার্থটি নিজেই একটি যুক্তিসংগত ধারণা তৈরি করার ক্ষমতা রাখে—তা হলো একটি বাক্সের ভেতর আরবি ভাষার অক্ষরগুলো কাষ্ঠফলকের ওপর সক্রিয় হয়ে একটি কবিতা তৈরি করার সক্ষমতাকে ধরে নেওয়ার মতো। বাইরে থেকে পরিচালিত না হয়ে নিজ থেকে সক্রিয় হওয়া সক্রিয়তা ব্যতীত কিছুই তৈরি করে না—এটি সঠিক অর্থ নয়।

বিজ্ঞান যদি এমন একটি দাবি হয়, যা বলে যে আমরা বস্তুজগতের প্রকৃত অবস্থা জানি, তাহলে এই বিজ্ঞান অবশ্যই ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত হবে, বলপ্রয়োগ বা বাধ্যতামূলক অবস্থা থেকে নয়। এবং যেহেতু এর ফলে বিজ্ঞান এমন একটি বন্দী, যা জ্ঞানের বোধশক্তিকে অতিক্রম করে, যা বস্তুর সীমার বাইরে কার্যকর নয়, তাই এটি অবশ্যই বলা উচিত, বিজ্ঞানের বাইরে কিছু না থাকলে বিজ্ঞান কীভাবে বিদ্যমান ছিল তা কল্পনা করা অসম্ভব।[৩১৩]

পরিশেষে বিজ্ঞানবাদের হ্রাসবাদ পরমাণু ও মস্তিষ্কের বাক্সে শুধু বস্তুগত চালিকাশক্তি ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করে না। অতএব এটি বাস্তবতা উপলব্ধি

---

৩১২. BBC Christmas Lectures Study Guide, London, BBC 1991 (Cited in: John C. Lennox, God's Undertaker: Has (Science buried God?, p.56

৩১৩. Austin Hughes, Blinded by Science.

করার বিবেকবোধকে অস্বীকার করে। আর যদি বিবেকবোধকে বিশ্বাস করা সম্ভব না হয়, তাহলে তা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করতেও বাধা প্রদান করবে। মূলত বিজ্ঞান চর্চার পথ শুরু হয় বিবেকবোধকে সত্যায়ন করার মাধ্যমে। কারণ আকল ব্যতীত বিজ্ঞান অর্থহীন। আর অস্তিত্ব যদি পরমাণু ও সক্রিয়তা হয়, তাহলে বিবেকবোধ বলতে কিছু থাকে না।

তিক্ত ফসল

> 'যে ভূমি উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে (প্রচুর পরিমাণে) উৎপন্ন হয় এবং যে ভূমি মন্দ তাতে খারাপ ফসলই উৎপন্ন হয়।' [সুরা আরাফ, আয়াত ৫৮]

> 'যখন আমি 'Defending Science - within Reason' বইটি লিখেছিলাম তখন আমি মনে করতাম, মূল সমস্যা ওই লোকদের মাঝে, যারা বিজ্ঞানকে সম্মান করে না এবং এর অর্জনকে অবজ্ঞা করার প্রয়াসে লিপ্ত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এমন কিছু লোক আছে যারা মনে করে, বিজ্ঞান ছাড়া কোথাও কোনো সত্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।'
>
> —বিজ্ঞানের দার্শনিক সুজান হ্যাক[৩১৪]

বিজ্ঞানবাদের যাজকগণ বিজ্ঞানবাদকে এভাবে উপস্থাপন করে যে, জ্ঞানতত্ত্বে বিজ্ঞানবাদ কেবল একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং বিজ্ঞানবাদ বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিভ্রম ও কুসংস্কার থেকে পরিত্রাণের সুসংবাদও বটে। বিভিন্ন স্টেজে বিজ্ঞানবাদকে উপস্থাপন করার সময় তারা এভাবেই এটিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলে ধরে। বিজ্ঞানবাদ প্রকৃত সর্বোচ্চ সুখময় স্থান, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কখনো শেষ হবে না। একমাত্র বিজ্ঞানবাদই সম্ভাব্য বাস্তব সুখের ওয়াদা করে। তা ছাড়া বিজ্ঞানবাদেই

---

৩১৪. The Irish Times এ তার একটি সাক্ষাৎকার : <https://www.irishtimes.com/culture/does-science-have-all-the-answers-1.2833077>

দুনিয়ার প্রকৃত সুখ। কেননা দুনিয়াতে ও দুনিয়া ছাড়া আর কোনো আনন্দ নেই। আর পার্থিব জীবনের পরে যদি আনন্দ থাকে, তবে তা ভাবার সময় নেই। কারণ বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত তা প্রমাণ করেনি।

কিন্তু বিজ্ঞানবাদের কি অন্য একটি চেহারা রয়েছে? ভিন্ন একটি বাস্তবতা রয়েছে? যাতে না আছে প্রথম স্বপ্নের আর্দ্রতা, আর না আছে উদঘাটন ও বস্তুবাদী জ্ঞানের গর্বিত হাসি। এটাই সেই প্রশ্ন, যা তৈরি করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা :

১. বিজ্ঞানবাদী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মানুষের আসল রূপ কী?

২. বিজ্ঞানবাদ কি বিশ্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধ করার জন্য একটি সার্বক্ষণিক অনুঘটক?

বিচ্ছিন্ন মানব

মানবজাতির উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রতিশ্রুতির জাদুর মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে বিজ্ঞানবাদের মোহ, যা তার অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাতে মানুষ মহাবিশ্বের কর্তা ও তা পরিচালনার মূলশক্তি হয়ে ওঠে। মানুষই যেন হয় মহাবিশ্বের পরিত্রাণ ও খুঁটি। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিজ্ঞানবাদ নিজ প্রাথমিক মৌলিক আলোচনা থেকেই 'মানুষের' বাস্তবতাকে অস্বীকার করা শুরু করে। বিজ্ঞানবাদের মতে অস্তিত্ব শুধু একটি পদার্থ, 'মানুষ' একদম প্রাথমিক পর্যায়ে এতে প্রবেশ করে। মানুষ এই বস্তুগত জগতেরই একটি অংশ, অন্যান্য বস্তুর মতো একটি বস্তু। পরিমাপগত হিসেবে এটির ভিন্নতা হয়। কিন্তু এর বিষয়ের সারমর্ম হলো, গুণগত মানে তার কোনো ভিন্নতা নেই। এটি পরমাণু থেকে গঠিত, শক্তির সাথে নড়াচড়া করে। মানুষ গতি এবং পরিবর্তনের আইনের কর্তৃত্বের অধীনে সূচনার পর্যায় থেকে ধ্বংসের পর্যায়ে চলতে থাকে।

বিজ্ঞানবাদ প্রকৃতি বা মানুষের দ্বৈততা বাতিল করে বিজ্ঞানের একত্ববাদের দাবির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিজ্ঞানবাদ অস্তিত্বকে প্রাকৃতিক একটি শারীরিক মাত্রায় নামিয়ে আনে, যার ওপর বস্তুগত প্রকৃতির আইন প্রযোজ্য। এই প্রকৃতিবাদী অদ্বৈতবাদ থেকেই বিশেষ হিসেবের ওপর জনসাধারণের প্রতি পক্ষপাত পূর্ণতা পায়, এবং সাধারণীকরণের স্তরে পৌঁছানোর জন্য ব্যক্তিদের থেকে তাদের বৈশিষ্ট্য কেড়ে নেওয়া হয়। যা ব্যবচ্ছেদ প্রক্রিয়া, শারীরবৃত্তীয় ও পরিমাপগত গাণিতিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। এভাবে মানুষের থেকে তার অ-পরিমাপগত মাত্রা,

যেমন নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যাতে পরিমাপ ও সাধারণীকরণের উপযুক্ত ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব না থাকে; যা অবস্তুগত গভীরতা ও সরলীকরণ নাকচকারী বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে।[৩৮]

বিজ্ঞানবাদ হ্রাসবাদের নীতির ওপর ভিত্তি করে সংকীর্ণ, পরিসংখ্যানগত ও বর্জনীয় শব্দগুলোতে অভ্যস্ত। যেমন : 'শুধু', 'কিছুই না' ও 'কিছুই ব্যতীত'। এটা (বিজ্ঞানবাদ) অবস্তুগত যেকোনো মানব-প্রকৃতি নাকচ করে। অতএব বিজ্ঞানবাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যবর্তী প্রাচীরগুলো ভেঙে দেয় এবং কেবল অভিজ্ঞতামূলক বৈজ্ঞানিক বস্তুগত গবেষণার জন্যই সুবিস্তৃত প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রদান করে।

বিজ্ঞানবাদের সারমর্ম হলো মহাবিশ্ব এবং মানুষকে বোঝার জন্য বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য প্রতিটি পদ্ধতিকে অস্বীকার করা। আর মানুষকে বোঝার পদ্ধতি হচ্ছে তাকে বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদের উপযুক্ত একটি সত্তায় রূপান্তরিত করা। শেষপর্যন্ত যা মানুষকে বস্তুগত পর্যায়ে নিয়ে আসে, অতঃপর নৈতিকভাবে হত্যা করে। এই অস্তিত্ব থেকে তাকে পরিপূর্ণভাবে ছাটাই করে দেয়। অথবা প্রখ্যাত ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী সি. এস. লুইসের ভাষ্যে 'মানুষের বিলুপ্তি' (The abolition of man)। এটি তার একটি বইয়েরও শিরোনাম।

বিজ্ঞানবাদীদের মতো যদি আমরাও বলি, "বৈজ্ঞানিকভাবে যা পরীক্ষা করা সম্ভব কেবল তা 'বিদ্যমান', শুধু পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও স্নায়ুবিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত পরিভাষাগুলোই মানুষকে বর্ণনা করতে এবং তার সারাংশ ও মাত্রা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম," তাহলে 'চিন্তা', 'বিশ্বাস', 'আকাঙ্ক্ষা', 'অর্থ' ইত্যাদির মতো কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

মানুষের মাঝে স্নায়ুকোষ, হরমোন নিঃসরণ, পেশি সংকোচন ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ছাড়া কিছুই নেই। মানুষকে তার অংশের সমষ্টিতে হ্রাস করার জন্য বিজ্ঞানবাদের বলপ্রয়োগ করাই মানুষের বিলুপ্তির ঘোষণা।

নিশ্চয় মানুষ অন্তহীন ছুটে চলা পরমাণুর সমষ্টি হিসেবে নিজেকে দেখতে অস্বীকার করে নিজের ভেতর থেকেই বাধ্য হয়ে। মানুষ নিজেকে তার ক্ষুদ্রতম অংশে

---

৩৮. আবদুল ওয়াহহাব আল মাসিরি, ফিকহুত তাহাইয়ুয, আবদুল ওয়াহহাব আল মাসিরি কর্তৃক সম্পাদিত, ইশকালিয়্যাতুত তাহাইয়ুয, (ভার্জিনিয়া : আল মাহাদুল আলামি লিল ফিকরিল ইসলামি, ১৪১৭ হিজরি, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪

মুষ্টিমেয় পরমাণুর সমষ্টির চেয়েও বড় এবং তার শারীরিক দৈর্ঘ্য-প্রস্থের চেয়েও গভীর হিসেবে দেখতে সত্যিকারভাবে ও সঠিকভাবেই বাধ্য। এই যে যারা প্রচণ্ড উদ্দীপনার সাথে লিখে চলেছে এবং ঔদ্ধত্যের সাথে বারবার প্রমাণ করতে চাইছে, 'বিজ্ঞান এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে, মানুষ অর্থহীন ও স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন একগাদা স্নায়ু, যা রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিকভাবে যোগাযোগ করে', তারা নিজেরাই উৎসাহ ও রূঢ়তার সাথে লেখে, যা তাদের দাবির সাথে মেলে না—'মানুষ এই সব জিনিস ছাড়া কিছুই নয়, যা তার গঠন তৈরি করে'।

বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তি একটি স্বেচ্ছাচারী মন নিয়ে জীবনযাপন করে, যা মানুষের মানবতাকে অস্বীকার করে। কিন্তু সে অক্ষম–সম্পূর্ণরূপে অক্ষম–তার নিজের ব্যতীত অন্য একটি হৃদয় নিয়ে বাঁচতে, একটি যান্ত্রিক হৃদয় যা তার কঠোরতায় অনমনীয়, যেন একটি পাথর, নিশ্চিত সংঘাতের আর্তনাদ, লড়াইয়ের তীব্রতা, অন্যদেরকে ঈমান পরিত্যাগের আহ্বানের উদ্দীপনা, কুসংস্কারকে প্রত্যাখ্যান, নির্বুদ্ধিতার বাক্য—এই সবকিছুই বিজ্ঞানবাদীদের হিসাব অনুযায়ী একজন ব্যক্তির থেকে সত্যের সাথে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়।

কোনো ব্যক্তিকে বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করার চেষ্টা, তাকে তার রসায়নে নামিয়ে আনা, অনেকটা কম্পিউটারকে অংশে অংশে ভাগ করে বা পিষে, এবং এটা যা দ্বারা গঠিত সেই উপাদানগুলো, যেমন তামা, প্লাস্টিক ও সিলিকন বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করার মতো। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি আপনাকে কম্পিউটার তৈরির ভৌত উপাদানগুলো জানতে সক্ষম করবে, কিন্তু আপনাকে কম্পিউটারের কাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেবে না। কারণ আপনি এখনো প্রোগ্রামিং থেকে অনেক দূরে আছেন, যা কম্পিউটার যে ধাতুতে গড়া সেখানে প্রদর্শিত হয় না।

মানুষকে গতি এবং স্থিরতার মাধ্যমে প্রকাশ্যে নামিয়ে আনার প্রবণতার কারণে বিজ্ঞানবাদ মানুষকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যায়। তবে তা মানুষের গঠন নতুনভাবে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়। যাতে করে মানুষ এমন সম্মানিত সত্তা হয়ে উঠবে, যার দুই পায়ের নিচে সকল ভোগ-বিলাসের সামগ্রী রাখা হবে। বিজ্ঞানবাদ যখন মানুষের স্বরূপ গবেষণায় তাকে ব্যবচ্ছেদ করে, তখন তাকে ধ্বংস করে ফেলে। তারপর তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে রাখে। কেননা বিজ্ঞানবাদ মানুষের বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে অর্থপূর্ণ কিছুতে একত্রিত করতে অক্ষম।

বিজ্ঞানবাদের রক্তাক্ত মর্গে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মাধ্যমে বিখণ্ডিত মানুষটি আত্মা ছাড়াই মৃত। তার ভেতরে ধ্বংসের অর্থটিই প্রবল। গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যায়, আনন্দ-উৎফুল্লের সামান্যতম অনুভূতিও সেই মানুষের মাঝে সঞ্চালিত হয় না। সে এমন মৃত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উন্মোচনের উদ্বেলতা তাকে জীবন দান করে না। যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উন্মোচন প্রস্তুতকৃত এবং কৌটায় সংরক্ষিত উৎকৃষ্ট মধু তার ঠোঁটের সামনে নিয়ে আসে। বিজ্ঞানবাদ মনকে ধ্বংসকারী। কোনো উদ্দীপক বস্তুর উদ্দীপনা থেকে তার অঙ্গসমূহ নেশাগ্রস্ত হয়।

একজন বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তির বর্তমান স্বপ্ন অনেকটা এমন ফোঁড়ার মতো, প্রতিটি মুহূর্তে যা চুলকে মজা পাওয়া যায়, তারপর চুলকানি কমে যায়। যাতে আবার চুলকানোর ইচ্ছা ফিরে আসে। অপরদিকে উদর হচ্ছে,এমনকিছু যাকে স্পর্শ করা কিংবা দীর্ঘায়িত করা সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ শুধুমাত্র এমন পৃষ্ঠ, যা দ্রুত আনন্দের সন্ধান করে, যাকে অন্তহীন নবায়ন করা হয়।

> বিজ্ঞানবাদ মানুষের গঠন থেকে তাকে নতুনভাবে বিনির্মাণ করতে ব্যস্ত।

বিজ্ঞানবাদ মানুষের পরিমাপগত নৈর্ব্যক্তিক (quantitative-objective) দিকটি নিয়েই ব্যস্ত। অপরদিকে তার গুণাত্মক ব্যক্তিগত (qualitative-subjective) দিকটি জোরপূর্বক অবহেলা করে। এটি শুধু এই কারণেই নয় যে, বিজ্ঞানবাদী দর্শনে বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে যা অবস্তুগত সত্তা তা জানতে অক্ষম; বরং তার মূল কারণ হচ্ছে বিজ্ঞান যা উপলব্ধি করতে পারে না তা বিজ্ঞানবাদীদের নিকট অস্তিত্বহীন।

নাস্তিক বিজ্ঞানবাদীরা এই দাবির কেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেয় যে, ধর্ম হলো জাতিসমূহের মধ্যে স্থায়ী যুদ্ধের মৌলিক কারণ। আর জাতির মধ্যে সাধারণ শান্তির জন্য একটি শর্ত হলো ধর্মগুলোকে নির্মূল করা। 'এনলাইটেনমেন্টের যুগ' থেকে বিশ্ব ইতিহাসের পর্যবেক্ষক বুঝতে পারেন, নিরশ্বরবাদী, অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিকদের কর্তৃত্বের নিয়মনীতিই জাতিগুলোকে রক্তপাত ও গণহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ফ্রিডরিক নিটশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বুঝতে পেরেছিলেন, ঈশ্বরের মৃত্যু এবং নাস্তিকতার বিজয় ও রাজনীতিতে তার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রক্তাক্ত শতাব্দীর

জন্ম দেবো। তিনি সঠিক উপলব্ধি করেছিলেন। মানবজাতি বিংশ শতাব্দীর মতো রক্তাক্ত অন্য কোনো শতাব্দী প্রত্যক্ষ করেনি। আর এখানে সকলেই নাস্তিক্য ব্যবস্থার শাসক ছিল। বিশেষ করে যারা সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিজ্ঞানের বিজ্ঞানবাদ দ্বারা প্রভাবিত মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেছিল। এটি নিছক ক্ষমতার কর্তৃত্বের যুক্তির অধীনে বিশ্বের কয়েক মিলিয়ন মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিল। যেখানে জাতিসমূহ ও ধারণাসমূহ বিলুপ্তকারী জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহৃত করা হয়েছিল।

বিজ্ঞানের লাগাম ও তা বিকৃতকরণ

বিজ্ঞানবাদ একটি নীতিবাক্য, যা বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা, আস্থা এবং বিজ্ঞানের পবিত্রতায় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়। বিজ্ঞানবাদীরা সর্বদা জোর দিয়ে আসছেন, নিশ্চয় প্রতিটি জ্ঞানীয় অর্জনে মানবতা খুশি হবে এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের সাথে সাথে মানবীয় বিকাশের রেখা ঊর্ধ্বে আরোহণ করছে। বিজ্ঞান প্রতিটি অ-বস্তুগত ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে মানুষকে মিথ থেকে বাস্তবের দিকে পরিচালিত করছে।

এটা বিজ্ঞানবাদীদের দাবি, কিন্তু বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী স্টিভ ফুলার[৩১৯] এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নাস্তিকতা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়নি। বিষয়টি এজন্য নয় যে এটিকে দমন করা হয়েছিল; বরং যখনই এটিকে নিজস্বভাবে প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষভাবে অভিমুখী ছিল না। সমগ্র ইতিহাসজুড়ে 'নীতিগতভাবে নিরপেক্ষ প্রকৃতি বিভিন্ন জৈব সম্ভাবনার মধ্যে নির্বাচন করে' ডারউইনবাদে অন্তর্নিহিত এই সাধারণ অধিবিদ্যামূলক ধারণার একাধিক সেকুলার এবং ধর্মীয় নজির রয়েছে। এটি প্রতিবার একটি স্থিরতা, এমনকি নীতিশাস্ত্র পরিত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। নিশ্চয় এটি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রহ বা মহাবিশ্বকে পরিবর্তন করার প্রণোদনা নয়।'[৩২০]

---

৩১৯. Steve Fuller (১৯৫৯-) : মার্কিন দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী। বিজ্ঞান ও আধুনিক টেকনোলজি এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বে তার বিশেষ অবদান রয়েছে।

৩২০. Steve Fuller, Science (Routledge, 2014) p. 111

মানুষ এবং জ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানবাদের ভয়াবহতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে আমেরিকান নাস্তিক গবেষক কার্টিস হোয়াইট 'দ্য ইলিউশন অফ নলেজ' নামে একটি বই লিখেছেন। বিজ্ঞানবাদ 'মানুষ' এবং 'জ্ঞান' ধারণাকে সমান করে এবং 'সমস্ত কিছুর তত্ত্ব' প্রচার করে। একটি জিনিস দিয়ে সবকিছুর বিভিন্ন ধরন ও প্রকারভেদসহ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দাবি করে, নতুন নাস্তিকতার প্রতীকগুলোর নিন্দার ওপর জোর দেয়। জনপ্রিয় মনোবিজ্ঞান এবং সোশ্যাল মিডিয়ার তারকাদের প্রচার করে। তারাই মানুষকে মাংস, স্নায়ুতন্ত্রের এবং অন্ধ রাসায়নিক বিক্রিয়ার যন্ত্রে পরিণত করে। কিছু বৈজ্ঞানিক একাগ্রতা এবং আর্থিক ব্যয়ের সাথে মানুষের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষায় পৌঁছানোর জন্য আমরা তার বিকাশে পৌঁছাতে পারি।

হোয়াইট তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট বৈপরীত্য দেখিয়েছিলেন, যারা মানুষের বিকাশ এবং টিকে থাকার নিশ্চয়তা দাবি করে। তারা মানুষকে ভূমিতে একটি পরজীবী প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করে, যা তার জন্য তৈরি করা হয়নি। অর্থহীন জীবনের অর্থ তাহলে কী?

পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ গ্রহণ বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে, মহাবিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রগুলোকে বস্তুবাদী পাঠের সীমার মধ্যে সংকীর্ণ করেছে, এমনকি যদিও সেগুলো অত্যন্ত নিন্দনীয় হয়। এই বিষয়ে নাস্তিক জেনেটিক সায়েন্টিস্ট রিচার্ড লুয়েন্টিন[৩১৮] বলেছেন, 'আমাদের একটি পূর্ব অঙ্গীকার রয়েছে, বস্তুবাদের প্রতি অঙ্গীকার। এটি এমন নয় যে, বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদেরকে এই আশ্চর্যজনক বিশ্বের জন্য একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে বাধ্য করে। বিপরীতে আমরা গবেষণার মাধ্যম এবং ধারণার একটি সেট (যা বস্তুগত ব্যাখ্যা তৈরি করে, তা যতই স্বাভাবিকতা বিরুদ্ধ হোক না কেন) তৈরি করার জন্য বস্তুগত কারণগুলোর প্রতি আমাদের আনুগত্য দ্বারা আগে থেকেই আবদ্ধ।'[৩১৯]

বিজ্ঞানবাদীরা প্রায়ই আস্তিকদের প্রতি অভিযোগ করে বলে, আল্লাহর প্রতি

---

৩১৮. Richard Lewontin (১৯২৯-) : মার্কিন জীববিজ্ঞানী ও গণিতবিদ। মলিকিউলার ইভ্যুলেশন গবেষণায় তার বিশেষ অবদান রয়েছে।

৩১৯. Richard C. Lewontin, Billions and Billions of Demons; in The New York Review of Books, January 9, 1997, p.28.

ঘটনার ব্যাখ্যা' এ কথা বলা বৈজ্ঞানিক কাজকে অর্থহীন করে তোলে। এই অভিযোগটি তাদের প্রাচীন পৌত্তলিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম, যারা মহাবিশ্বকে এমন কতিপয় ঈশ্বরের নিদর্শন হিসেবে মনে করে, যে ঈশ্বর অল্পতেই রাগান্বিত কিংবা খুশি হয়ে যায়। তাদের মনমর্জি বিশ্ব নিয়ে খেলা করে। তাই এই মেজাজ অনুযায়ী প্রকৃতির কাজ পরিবর্তিত হয়, যা প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট রীতি এবং তার মৌলিক বিষয় অনুসন্ধান অসম্ভব করে তোলে এবং ইসলামিক ইলাহি ধারণা, যা মহাবিশ্বে চাষাবাদ, বংশবৃদ্ধি, পৃথিবী ও অপার্থিব বস্তু প্রকৃতির বিন্যাসে প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্বের একটি নিদর্শন তৈরি করে। অলৌকিক ঘটনা ব্যতীত প্রাকৃতিক আইনে ব্যত্যয় না ঘটা আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং তার অনাবিল সৃষ্টির নিদর্শন।

বিশ্বকে উপলব্ধি করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিকাশ এবং তা থেকে যে কল্যাণ অর্জন করা হয় তার ওপর বিজ্ঞানবাদের নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি জীববিজ্ঞানের গবেষণায় অপরিকল্পিত উপলব্ধি গ্রহণ করার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। যা বলে যে, উদ্দেশ্যহীন মিউটেশনগুলো সমস্ত জেনেটিক উপাদানের উৎস, যা বিবর্তনের দীর্ঘ ও অন্ধ প্রক্রিয়ায় জীবের জগতে ঘটে থাকে।

এর একটি বহিঃপ্রকাশ হলো ডারউইনবাদের প্রতিশ্রুতি। আমরা ক্রোমোজোমাল ডিএনএ-এর যে কার্যকারিতা জানি না তা হলো, জাঙ্ক ডিএনএ-এর একটি স্টক যা অন্ধ বিবর্তনের অবশিষ্টাংশ। ডারউইনবাদ এই ডিএনএ-এর জাঙ্ক প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছিল; এর বিপরীত বলা বিবর্তন কিচ্ছার সত্যতাকে অস্বীকার করে। এমনকি বিখ্যাত নাস্তিক বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী ড্যান গ্রাউর[৩২০] 'এনকোড' প্রকল্পের কথা বলেছেন। যা প্রমাণ করেছে সাধারণ কার্যকরী ডিএনএ নিষ্ক্রিয় নয়। তিনি বলেছেন, 'যদি এই এনকোড প্রকল্পের ফলাফল সঠিক হয়, তাহলে বিবর্তন একটি ভুল।'[৩২১]

আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কথিত আবর্জনার মধ্যে 'গুপ্তসম্পদ' আবিষ্কার করে, যা বিবর্তনে বিশ্বাসী 'Scientific American' কর্তৃক প্রকাশিত একটি নিবন্ধের

---

৩২০. Dan Graur (১৯৫৩-) : মলিকিউলার ইভ্যুলেশনে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী। তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানের শিক্ষক।

৩২১. Dan Graur, 'How to Assemble a Human Genome?' (December 2013)

শিরোনামে প্রকাশিত বাক্যাংশ : 'জাঙ্ক ডিএনএ-তে লুকানো ধনভান্ডার' (Hidden Treasures in Junk DNA)।[৩২২]

পরবর্তী জেনেটিক অধ্যয়ন ডারউইনবাদী জিনতত্ত্ববিদ কলিন্সকে[৩২৩] সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে বাধ্য করেছিল : 'জাঙ্ক ডিএনএ-এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই শব্দটি আর ব্যবহার করি না। কারণ আমার মনে হয় এটা খুব বড় ধরনের ঔদ্ধত্য ছিল যে, আমরা ধারণা করতাম আমরা জিনের যেকোনো অংশ ত্যাগ করতে পারি। যেন আমরা এমনটা বলার মতো যথেষ্ট জ্ঞান রাখি, এটির কোনো কার্যকারিতা নেই। অধিকাংশ জিনোম এমন কাজ করে, যে কাজগুলোর কিছু দায়িত্ব রয়েছে।'[৩২৪]

জিন বোঝার এবং নিরীক্ষণ করার সরঞ্জামাদির বিকাশের সাথে সাথে 'আবর্জনা' তালিকা ছোট হয়ে আসছে। এমনকি বিবর্তনবাদী জেনেটিক সায়েন্টিস্ট জেমস শাপিরো[৩২৫] এবং বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী রিচার্ড স্টার্নবার্গ[৩২৬] বলেছেন, 'কোনো একদিন আজ যেটিকে 'ক্রোমোজোমাল জাঙ্ক ডিএনএ' বলা হচ্ছে, আমরা সেটিকে সেলুলার কন্ট্রোল সিস্টেমের সত্যিকার বিশেষজ্ঞের জন্য অপরিহার্য একটি উপাদান হিসেবে গণ্য করব।'[৩২৭]

জাঙ্ক ডিএনএ-এর বিভ্রান্তি পরবর্তী জেনেটিক্স বিজ্ঞানকে এমন তথ্য প্রকাশ করতে পরিচালিত করেছে, যা মেডিকেল সায়েন্সের আবিষ্কারে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যা অনেক রোগকে প্রতিহত করে। এসবই হয়েছিল অপরিকল্পিত নাস্তিক্য

---

৩২২. Scientific American, October 1, 2012 </https://www.scientificamerican.com/article/hidden-treasures-in-junk-dna>

৩২৩. Francis Collins (১৯৫০-) : প্রখ্যাত মার্কিন জেনেটিক বিজ্ঞানী, আমেরিকায় মানব জিন প্রকল্পের পরিচালক। ন্যাশনাল হেলথ একাডেমির পরিচালক।

৩২৪. ২০১৫ সালে J.P. Morgan Healthcare Conference- এর সম্মেলনে এ কথা উল্লেখ করেছেন। </https://evolutionnews.org/2016/07/on_junk_dna_fra>

৩২৫. James Shapiro (১৯৪৩-) : মার্কিন জীববিজ্ঞানী। ব্যাকটেরিয়া জিনে বিশেষ অভিজ্ঞ।

৩২৬. Richard Sternberg : মার্কিন জীববিজ্ঞানী। মলিকিউলার ইভ্যুল্যুশনে ডক্টরেট ডিগ্রি এবং সিস্টেমিক সায়েন্সে (তাত্ত্বিক জীববিজ্ঞানে) আরেকটি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

৩২৭. Richard Sternberg and James A. Shapiro, How Repeated Retroelements format genome function, (Cytogenetic and Genome Research, Vol. 110.108-116 (2005)

বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রতিশ্রুতির কারণে।

নাস্তিকতাবাদী বস্তুবাদী আদর্শের কারণে বিজ্ঞানকে বিকৃত করার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে কসমোলজির যে মডেলগুলো আমরা দেখতে পাই। মহাবিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার মতো এ মডেলগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তার অনেক বিবরণ এবং জটিলতা থাকা সত্ত্বেও। 'সমস্ত বস্তুগত অস্তিত্বের প্রথম সূচনা আছে' এই স্বীকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই মডেলগুলো উপস্থাপিত। অর্থাৎ প্রতিটি কল্পনার বাস্তবসম্মত সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও বৈধ, যাতে ধর্মের নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই।

আমি মনে করি বিজ্ঞানবাদ অন্তত দুটি উপায়ে বিজ্ঞানের ক্ষতি করে :

১. অভ্যন্তরীণভাবে। কারণ এটি বিজ্ঞান কী এবং তা কীভাবে কাজ করে তার একটি ভুল ধারণা উপস্থাপন করে, যা বিজ্ঞান অনুশীলনকারী বিজ্ঞানীদের বা স্নাতকোত্তর ছাত্রদের (প্রশিক্ষণার্থী বিজ্ঞানীদের) নতুন পন্থায় উপকৃত হওয়া থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়।

২. বাহ্যিকভাবে। কারণ এটি বিজ্ঞান সম্পর্কে জনসাধারণের উপলব্ধিকে ধ্বংস করার এবং এর সুনামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সম্ভাবনা রাখে।[২২৮]

—নাস্তিক দার্শনিক ম্যাসিমো পিগলিউচি।

২২৮. Massimo Pigliucci, 'New Atheism and the Scientistic Turn in the Atheism Movement, Midwest Studies in Philosophy, XXXVII (2013), p.152

একটি ভ্রান্ত ধারণা : মহামহিম আল্লাহ না-কি বিজ্ঞান?

> 'আপনি বলুন, তোমরা দেখো তো আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে কত কী রয়েছে! আর নিদর্শনাদি ও সতর্ককারীগণ অবিশ্বাসী লোকদের কোনো উপকারে আসে না।' [সুরা ইউনুস, আয়াত ১০১]

> 'আল্লাহর অস্তিত্ব থেকেই বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম বৈধতা লাভ করে।'[৩২৯]
>
> —ব্রিটিশ গণিতবিদ জন লেনাক্স[৩৩০]

নাস্তিক রসায়নবিদ পিটার অ্যাটকিনস বলেছেন, 'নিশ্চয় মানব সভ্যতাকে এটি মেনে নিতে হবে, বিজ্ঞান মহাজাগতিক উদ্দেশ্যের মাধ্যমে বিশ্বাসের ন্যায্যতা খণ্ডন করেছে, এবং এই লক্ষ্যের যতটুকু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে তা কেবল আবেগের ওপর ভিত্তি করেই টিকে আছে।'[৩৩১]

অ্যাটকিনসের দাবি মূলত বিজ্ঞানবাদী বক্তব্য, যা সবকিছু ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সামর্থ্য এবং ভিন্ন ব্যাখ্যা অন্বেষণে মানব সভ্যতা অমুখাপেক্ষী হওয়ার আলোচনার সমাপ্তি প্রতিফলিত করে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানে

---

৩২৯. John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God? P. 210

৩৩০. John Lennox (১৯৪৩-) : উত্তর আইরিশ গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানের দার্শনিক। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে ঈশ্বর নিয়ে আলোচনাকারীদের মাঝে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। দুইবার ডকিন্সের সাথে বিতর্ক করেছেন।

৩৩১. P. Atkins: Will Science ever fail? New Scientist, 8 August, 1992. pp 32-35

বিশ্বাসের মধ্যে বৈপরীত্য নির্ধারণ করার এই দাবিটির মূলেই রয়েছে আসল বিভ্রান্তি। যাতে করে পরবর্তী সময়ে অনিবার্যভাবে মহাবিশ্বের ব্যাখ্যায় এই দুটি মতবাদের মধ্যে বৈপরীত্যে যেকোনো একটি সমাধানে উপনীত হওয়া যায়। তবে যদি বৈপরীত্যের সম্মুখীন ব্যক্তিটি তড়িঘড়ি করে বৈপরীত্যের সমাধানে না এসে কিছুটা সময় চিন্তাভাবনা করে, তাহলে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, দুটি ব্যাখ্যাই পরিপূরক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয় ধর্মীয় ব্যাখ্যার দিকেই নিয়ে চলে।

আর সাধারণভাবে যদি আমরা বিজ্ঞানবাদীদের বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করতে চাই—আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসের ব্যাপারে—তাহলে আমরা দেখতে পাব, এটি আমাদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পরিচালিত করে :

- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ কী?
- এই সম্পর্কটি কি একটি পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক, যা বলতে বাধ্য করে যে তাদের একটিতে বিশ্বাস অন্যটির অস্তিত্বে বিশ্বাসকে সুনিশ্চিতভাবেই প্রত্যাখ্যান করে?
- না-কি এটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক, যা তাদের অনৈক্য ছাড়াই একীভূত করে, অন্তত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে?
- বিজ্ঞান যাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব? অন্যদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করে?

বিভ্রান্তিকর দ্বৈততা

বিজ্ঞানবাদী বক্তব্যে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই বিষয়টি উপস্থাপন করা হয় যে, মহাবিশ্বের কার্যক্রমের বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য এই মহাবিশ্বে মানুষের সামনে দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে এবং তৃতীয় কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। হয়তো এই অস্তিত্ব (বস্তুসমূহ ও তার উপাদান) এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং সবকিছু তার প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় পরিচালিত; বৃষ্টিপাত, গাছের বৃদ্ধি, সমুদ্রে ঢেউয়ের চলাচল সবই আল্লাহর প্রত্যক্ষ বস্তুগত নির্দেশনার কারণে ঘটে চলেছে, নয়তো এই কথা মেনে নেওয়া যে মহাবিশ্ব নির্দিষ্ট নিয়মনীতির পদ্ধতিতে পরিচালিত। এই নিয়মনীতি

মহাবিশ্বের রাডার নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার বিভিন্ন অংশের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে।

একজন নাস্তিক ব্যক্তি তার এই বক্তব্যে বিশেষ আকর্ষণ ও আনন্দ খুঁজে পান যে, মহাবিশ্বের কাজ ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের আল্লাহকে নয়, বরং বিজ্ঞানকে বেছে নেওয়া উচিত। কারণ বিজ্ঞান প্রকৃতির ভৌত নিয়মনীতি আবিষ্কারের মাধ্যমে তাকে উপলব্ধ করার ক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের সাথে প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষতি এড়ানোর ক্ষেত্রে নিজ উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। বিজ্ঞান মানুষের সেবা করার জন্য প্রাকৃতিক বিষয়সমূহকে বশীভূত করে এবং ভবিষ্যতে প্রকৃতিতে কী ঘটবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করে। যদি মহাবিশ্বের কাজ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়, তাহলে নিশ্চয় প্রকৃতির কাজ ব্যাখ্যা করার জন্য মানুষকে আর আল্লাহর মুখাপেক্ষী হতে হবে না!

হারিকেনের 'ক্রোধ', বন্যার ভয়াবহতা, খরার তীব্রতা নিয়ে যে আদিম মন সদা শঙ্কিত থাকত, মূলত সেই আদিম মনের কুসংস্কার থেকেই নাস্তিকতাবাদী এই বক্তব্যটি শক্তি সঞ্চার করেছে। কুসংস্কারের ফলে আদিম মনকে এই ভয়ানক প্রাকৃতিক অবস্থার ভ্রুকুটি ভাঙ্গার জন্য নৈবেদ্য দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। (আমরা বলি না এই ভয়টি ধর্মীয় আশ্রয় গ্রহণের কারণ; এটি একটি ভ্রান্ত দাবি।[৩৩২] বরং আমরা পৌত্তলিক ধর্মতত্ত্বের কারণে প্রকৃতির নিয়ম অস্বীকার করার জন্য আদিম মনের অঙ্গীকারের কথা বলছি।) অতএব ধর্ম (প্রতিটি ধর্ম) বিভিন্ন কাজের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নীতিগত ব্যাখ্যা গ্রহণ করে না।

পূর্ববর্তী নাস্তিক্য প্রস্তাবনার বিভ্রান্তির ফলে এটি একটি একচেটিয়া দ্বৈততা উপস্থাপন করে, যা ঘটনার তৃতীয় পাঠকে রহিত করে দেয়। বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তি বাধ্যতামূলকভাবে আমাদেরকে দুটি বিষয় থেকে একটি বেছে নিতে হবে বলে, যেখানে তৃতীয় কোনো বিষয় নেই :

- প্রাকৃতিক কার্যকারণ মেনে নেওয়া এবং উচ্চতর ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করা।
- ধর্মীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ এবং প্রাকৃতিক কার্যকারণ প্রত্যাখ্যান।

---

৩৩২. দেখুন সামি আমেরি, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ, পৃষ্ঠা ২০৮-২১৩

এ ক্ষেত্রে আমরা বলি, প্রাকৃতিক কার্যকারণ সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে না। তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ভ্রান্তিতে পড়ে থাকার প্রয়োজন নেই। প্রাকৃতিক কার্যকারণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের কাজের ব্যাখ্যা মূলত এর বস্তুগত প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য তার সক্রিয়তার সময় মহাবিশ্বের কাজের ব্যাখ্যা। অপরদিকে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পূর্বেই ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিদ্যমান। এটি এই নিয়মনীতিগুলোর অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে মহামহিম প্রভুর ইচ্ছার পরিপূর্ণতার দিকে পরিচালিত করার জন্য তাদের কাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে।

ইউরোপের ইতিহাসে চার্চ এবং বিজ্ঞানের মাঝে বিরোধের দীর্ঘ আলোচনায় যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, তা এমন দাবি যার বিবরণ অতিরঞ্জিত; যদিও এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনায় বিশেষ করে চিকিৎসা গ্রহণ ও চিকিৎসাজগতে চার্চের পৌরাণিক কাহিনি সম্পর্কে কিছু প্রকৃত সত্য ও ঘটনাসমূহ উপস্থাপিত হয়। এই বাস্তব ঘটনাগুলো ব্যতীত অধিকাংশ বিষয়গুলোই ভীতিপ্রদ এবং অতিরঞ্জিত।[৩৩৩]

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাজাগতিক নিয়মগুলো হলো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির নিপুণতা এবং তাঁর প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতার প্রকাশ। অতএব আল্লাহর গুণাবলির পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করার জন্য মহাবিশ্বের নিয়মগুলো নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও ইসলাম বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের জন্য এই মহাবিশ্বের নিয়মনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার প্রতিষেধক সৃষ্টি করেননি।'[৩৩৪]

প্রতিষেধক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক চিকিৎসা শাস্ত্রীয় কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিমগণ অনেক উন্নতি সাধন করেছে। এমনকি মধ্যযুগে ইসলামি চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল খ্রিষ্টীয় ইউরোপীয়দের প্রধান তথ্যসূত্র। অথচ খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল যে চিকিৎসা গ্রহণ এমন একটি কাজ, যা সরাসরি

---

৩৩৩. C. A. Russell, 'The Conflict Metaphor and its Social Origins, Science and Chistian Belief, 1 (1989) pp. 3-26

৩৩৪. তিরমিজি শরিফ, হাদিস নং ২০৩৮; আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৮৩; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৪৩৬; ইমাম তিরমিজি এই হাদিসকে হাসান সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রভুর কাছ থেকে নিরাময় চাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। প্রাচ্যবিদ গুস্তাভ লে বন[৩৩৫] আরবি ভাষায় লিখিত ইসলামি চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস বইতে বলেছেন, 'মেডিকেল সায়েন্স হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র, যা নিয়ে আরবগণ বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তারা এই বিজ্ঞানে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলো সম্পন্ন করেছেন। তাদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত লেখাগুলো সমগ্র ইউরোপজুড়ে অনূদিত হয়েছিল।'[৩৩৬]

পূর্বোক্ত বিষয়ের অর্থ এই নয় যে আল্লাহ (ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে) প্রাকৃতিক কার্যক্রমের প্রভাব সৃষ্টি করে সুবিন্যস্ত করার পরে এখন মানবীয় জগৎ থেকে উদাসীন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ শাশ্বত, অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং তিনি দৃশ্যত অলৌকিকতার সাথে এবং তাঁর কোমল দয়ার সাথে–যা চোখ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারে না–নিয়মানুগ কার্যক্রম পরিবর্তন করেন; যেমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এমন ব্যক্তিকে তিনি সুস্থতা দান করেন, যে নিজ সুস্থতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। আবার তিনি তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যারা দুর্ভিক্ষের সময় আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে। যন্ত্রণা ও দুর্দশার পরে স্বস্তির দুআয় লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি তাঁর সাড়াপ্রদান, সবই তাঁর মহিমা।

মহাবিশ্বের সুবিস্তৃত কার্যক্রম প্রাকৃতিক মহাজাগতিকতার নিয়মনীতির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। শরিয়া এই নিয়মগুলোর ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে নির্দেশনা প্রদান করেছে। এটি প্রাকৃতিক নিয়ম যা নবিগণকে অলৌকিকতা প্রদর্শনে বাধ্য করে। তাদের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল মহাজাগতিক রীতি থেকে উদ্ভূত কষ্টের মুখোমুখি হওয়া, এমন প্রচেষ্টা দ্বারা, যা তাদের কাজের নিয়মিত হওয়া বিবেচনা করে। ফলে ধৈর্য, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাদের আহ্বান ফলপ্রসূ হয়। আর প্রত্যেক মানুষই আনুগত্য অনুসন্ধানে এই মহাজাগতিক নিয়মগুলোকে অবলম্বন করে উপাসনা করে। তার বিপরীত করা শরীয়তে নিন্দনীয়, কারণ এটি শরিয়তের নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তার নিয়মানুযায়ী চলার নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করে।

---

৩৩৫. Gustave Le Bon (১৮৪১-১৯৩১) : ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক। প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতায় তার বিশেষ বুৎপত্তি রয়েছে।

৩৩৬. গুস্তাভ লে বন, হাযারাতুল আরব, পৃষ্ঠা ৪৮৮

তাই আমরা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী নাস্তিক্যবাদী ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করি, যে ব্যাখ্যার মূল কারণ হচ্ছে প্রকৃতির কার্যক্রমকে আমরা প্রাকৃতিক মহাজাগতিক নিয়ম অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে পারি। এবং আমরা ঈশ্বরবাদীদের ব্যাখ্যাও গ্রহণ করতে অপারগ, যাদের মতে আমাদের অস্তিত্বের অর্থ ও গতির প্রতিটি দিক ব্যাখ্যায় শুধু মহাজাগতিক রীতিই সক্ষম। তা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কহীন, তবে এই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারের প্রয়োজন নেই।

আমরা সে সকল আদিম লোকদের ব্যাখ্যাও অস্বীকার করি, যাদের মতে প্রাকৃতিক কারণ সম্পর্কে অজ্ঞতাই তা (প্রাকৃতিক কারণ) প্রত্যাখ্যানের কারণ।

আমরা বলি, এই মহাজাগতিক রীতিতে মৌলিকভাবে মহাবিশ্বে প্রভুর প্রজ্ঞার প্রভাব বিদ্যমান। এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলার দান ও ন্যায়সংগত নিষেধাজ্ঞার যা কিছু প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত হয় সেখানেও প্রজ্ঞার প্রভাব বিদ্যমান।

আমরা এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করি, যেমন আমরা মানুষের শিল্পকর্মের কাজ ব্যাখ্যা করি। আমরা এতে কোনো বৈপরীত্য দেখি না যে আমরা বলি বৃষ্টিপাত জলের বাষ্পীভবনের ফলে হয়, যা পরবর্তীতে তা নেমে আসার আগে আকাশে পুঞ্জীভূত হয়, এ কথা বলার দ্বারা আমরা এ কথা থেকে সরে আসি না যে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। কেননা তিনিই বৃষ্টি বর্ষণের এই ব্যবস্থা তৈরি করেছেন। তাই তিনি এটির জন্য যে অবস্থাটি নির্ধারণ করেছেন সে অনুসারে কাজ করতে দেন এবং তিনি চাইলে মাঝে মাঝে এই ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় করেন। এবং এটি আমাদের এই কথার অনুরূপ যে, রাস্তায় চলার জন্য গাড়ির ইঞ্জিনের কাজ এবং একজন উদ্ভাবক—যিনি এই বিশেষ ব্যবস্থার সাথে কাজ করার জন্য গাড়িটি আবিষ্কার করেছিলেন—এর অস্তিত্বের মাঝে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। আমরা এখানে পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার মুখোমুখি হই না; বরং এগুলো যৌগিক ব্যাখ্যা। সুতরাং গাড়ির ইঞ্জিনের কাজ একজন উদ্ভাবকের জ্ঞানের প্রভাব ও একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। আর প্রাকৃতিক আইনের ক্রিয়া একজন সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানের প্রভাব। আল্লাহর দৃষ্টান্ত মহান।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, পদার্থবিজ্ঞানী ল্যাপলাস যখন নিউটনীয় ধারণার ওপর ভিত্তি করে তার যান্ত্রিক মহাজাগতিক মডেলটির কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, যা মহাবিশ্বকে অভ্যন্তরীণ বিন্যাস অনুযায়ী কাজ করে এমন একটি বিশাল যন্ত্র হিসেবে দেখে, তখন তিনি এটি নেপোলিয়নের কাছে উপস্থাপন

করেছিলেন। নেপোলিয়ন তার মত প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, আপনার মহাজাগতিক মডেলের কাজে আপনি ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করেননি। ল্যাপলাস তাকে প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, এই (ঈশ্বরের) অনুমানের প্রয়োজন নেই। 'Je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là.' এই বর্ণনাটি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খণ্ডন করার কোনো যুক্তি নয়। কারণ এই বিশাল, সমন্বিত মহাজাগতিক যন্ত্র, এটির অস্তিত্ব ও কার্যকারিতার জন্য একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এবং ল্যাপলাস মডেল অনুযায়ী মহাবিশ্বের কার্যকারিতার জন্য ঈশ্বর গাণিতিক সমীকরণের অংশ নয় এবং তা হওয়া সমীচীনও নয়। কারণ এই সমীকরণগুলো পূর্ববর্তী বাস্তবতার কাছে দায়বদ্ধ, তা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও ক্ষমতা।

একটি অস্তিত্ব যেখানে জীবন ও চেতনা আছে, তা এমন একটি কারণ থেকে উদ্ভূত হতে পারে না, যেখানে জীবন ও জ্ঞানের শূন্যতা রয়েছে। কোনো কিছুর শূন্যতা সেই জিনিস দিতে পারে না। শূন্যতা থেকে কেবল শূন্যতাই হবে, আর মৃত্যু প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না। অনর্থক বিষয় থেকে অস্তিত্ব আসে না। আর যে জীবন ও বোধ সম্পন্ন অস্তিত্বের ব্যাখ্যা তার অভ্যন্তরীণ স্বয়ংক্রিয়তা দিয়ে করতে চায়, সে মূলত অনস্তিত্ব থেকে, যা তার নেই, সেই বিষয়কে অস্তিত্বে নিয়ে আসার দাবি করে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নিয়মনীতির অস্তিত্ব যখন এক হয় তখন তা নিয়মনীতির অস্তিত্বের ওপর অতিরিক্ত বর্ধিতকরণ নয়। শায়খ মুস্তফা সাবরি[৩৩৭] বলেছেন, "তাদের বক্তব্য : 'এমন একটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করে লাভ কী, যার ইচ্ছা প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার সাথে মিশ্রিত এবং মৌলিক কোনো বিরোধিতা নেই?' তাদের প্রতি উত্তর এই, এর প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে তারা যেটাকে প্রাকৃতিক রীতিনীতি বলে সেই কাজগুলো যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই অস্তিত্বের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। এগুলো সেই আল্লাহর নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম নয়। আল্লাহ নিষ্ক্রিয় নন। যেমনটা তারা আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা করে যে, এই নিয়মনীতির অস্তিত্ব থাকলে আল্লাহর কাজের প্রয়োজন নেই। কারণ নীতিগুলো নিজেই প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাজ। সুতরাং তার

---

৩৩৭. মুস্তাফা সাবরি (১৮৬৯-১৯৫৪) : একজন তুর্কি আলেম, যিনি অটোমান সাম্রাজ্যে শাইখুল ইসলাম পদে ছিলেন। তিনি নাস্তিকতা, জাতীয়তাবাদ ও পাশ্চাত্য মতবাদের বিপক্ষে তাঁর লেখার জন্য ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ইচ্ছা এই নিয়মনীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া আপত্তির বিষয় নয়। কারণ তারা নীতিগুলো এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে যে সামঞ্জস্য দেখে, তা নীতিগুলো নীতি প্রণেতার ইচ্ছার সাথে একমত হওয়ার আবশ্যকীয়তা প্রকাশ করে। এমন নয় যে নীতি প্রণেতার ইচ্ছা নীতির অনুগত হবে, কারণ এটি অসম্ভব বিষয় যা নিজেই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দাবি করে।[৩৩৮] সুতরাং এই নীতিগুলো হলো আল্লাহর সর্বজনীন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, তা প্রভুত্বের পরিপূর্ণতাকে বাধাগ্রস্ত করে না। আল্লাহ যখন এই ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় করতে চান তখন নিষ্ক্রিয় করে দেন।

এখানে মৌলিক ত্রুটি হলো, কোনটি পদ্ধতিগত (আইন) আর কোনটি অন্টোলজিক্যাল (বাস্তবতা), তার মাঝে গুলিয়ে ফেলা। কারণ বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তি মনে করে, কোনো ঘটনার স্বয়ংক্রিয় কাজের জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে সিস্টেমিক অ্যাপ্রোচের সাফল্যের ফলে মহাবিশ্বের কাজকর্মের যান্ত্রিক প্রকৃতির বাইরে অন্য ব্যাখ্যা অন্বেষণ নিষ্প্রয়োজন। যেমন দেখা যায়, সৈকতে মেটাল ডিটেক্টরগুলো সাক্ষ্য দেয়, সেই সৈকতে কোনো পাথর নেই। কারণ মেটাল ডিটেক্টর তাদের মালিকদের পাথরের উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে না। বিজ্ঞান এবং রীতিনীতিগুলোর দিকে তার পথ দেখানোও অনুরূপ; রীতিনীতিগুলো অস্তিত্বের শুধু যান্ত্রিক দিক নিরীক্ষণ করে। অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না, তাই এটি এই অস্তিত্বের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একচেটিয়াকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সবের মধ্যে নীতি এবং সঠিক জিনিসটি হলো পদ্ধতি বাস্তবতার সীমা তৈরির ওপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রক হতে পারে না।

> 'আল্লাহ তাআলা উপায় ও সূত্রের মাধ্যমে সমস্ত কারণ ও প্রাণ সৃষ্টি করেছেন।'[৩৩৯]
>
> —ইবনে তাইমিয়া

উপরি মহাবিশ্বের নিয়মগুলো মহাবিশ্বের কাজের জন্য চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হতে পারে না। এটি মহাবিশ্বের কাজের একটি বর্ণনা মাত্র, কোনো কিছু নড়ানোর বা এক

---

৩৩৮. মুস্তফা সাবরি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের নিকট যুক্তি, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর অবস্থান (বৈরুত : দার ইহইয়াত তুরাসিল আরাবিয়্যি, ১৪০১ হিজরি, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ), ২/৩১১

৩৩৯. ইবনে তাইমিয়া, ফতোয়া সমগ্র, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের তত্ত্বাবধানে সংকলিত, মদিনা, মাজমাউল মালিক ফাহদ লি তবাযাতিল মুসহাফ শরিফ, ১৪১৬ হিজরি, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) ৮/৩৮৯

অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করার ক্ষমতা নেই তার। বর্ণনা ইচ্ছাশক্তির অধিকারী বিষয় নয়। কাজেই এর মধ্যে যোগ্যতা, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের গুণাবলি যুক্ত করে দেওয়া কারও জন্য বৈধ নয়। বিজ্ঞানবাদীদের এই দাবিটি মূলত বাস্তবে পরিণত করার ভ্রান্তি; The fallacy of reification; অর্থাৎ কোনো কিছুর বৈশিষ্ট্যকে শুধু তার অর্থের ওপর আরোপ করা।

বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন না যে, সূত্রের অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বাতিল করে দেয়—যতক্ষণ না তিনি এই বিশেষ দাবি থেকে শুরু করেন যখন তিনি পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ গ্রহণ করেন, যা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথম সূচনার বিন্দুতে সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতি ছাড়া অন্য কেউ নেই। যখন ফলাফল সূচনাতেই গুটিয়ে রাখা হয়, তখন গবেষকের জন্য তিনি যা থেকে শুরু করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে সমাপ্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

> 'একটি বিরোধ রয়েছে, যথার্থ বিরোধ। কিন্তু এটি বিজ্ঞান বনাম ধর্মের বিরোধ নয়। কারণ যদি তাই হয়, তাহলে যুক্তির দাবি হচ্ছে, লোকেরা অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করবে, সকল বিজ্ঞানী নাস্তিক ছিলেন এবং শুধুমাত্র অ-বিজ্ঞানীরাই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে বিষয়টি এমন নয়। বরং প্রকৃত দ্বন্দ্ব দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে : প্রকৃতিবাদ ও ধর্মতত্ত্ব। এ দুটি অনিবার্যভাবে সাংঘর্ষিক হয়।'[৩৪০]
>
> —ব্রিটিশ গণিতবিদ জন লেনাক্স

ধর্মীয় বিশ্বাস মহাবিশ্বের নীতিবদ্ধ কাজকে প্রত্যাখ্যান করে না, বরং এটিকে অস্তিত্বে একটি সর্বশেষ স্তর হিসেবে দেখে এবং প্রতিটি ব্যাখ্যার জন্য সর্বোচ্চ ব্যাখ্যা হলো অতীন্দ্রিয় শক্তি ও জ্ঞানের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ অস্তিত্বের সকল কিছু আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, যিনি সৃষ্টি করেছেন ও অভিনব কিছু তৈরি করেছেন। যেহেতু আমরা অস্তিত্বের ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি এবং প্রতিটি ব্যাখ্যার জন্য প্রথম ব্যাখ্যার সন্ধান করছি, আমরা দুটি, অ-বস্তুগত জ্ঞান বা অযৌক্তিক বস্তুগত অস্তিত্বের সমাধান থেকে সরে আসতে পারি না। যেমন জীবনের ঘটনা এবং এর বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাস্তিক ড্যানিয়েল ড্যানেট বলেন, 'দৃঢ় প্রত্যয়ী ডারউইনবাদী

---

৩৪০. John C. Lennox, God's Undertaker: Has Science Buried God? P. 28-29

সেই ব্যক্তি, যিনি বুঝতে পারেন যে আপনাকে দুটি থেকে যেকোনো একটি বিষয় বেছে নিতে হবে—হয় আপনি নিজেকে ডারউইনীয় বিবর্তন থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রাখেন, অথবা আপনি প্রচলিত মহাবিশ্বকে উল্টে দেন এবং স্বীকার করেন যে, কারণটি যুক্তি, অর্থ কিংবা উদ্দেশ্য নয়। অনেকেই এর মাঝামাঝি একটি সমাধান সন্ধানের প্রচেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা অসম্ভব।'[৩৪১]

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকেই বিজ্ঞানে বিশ্বাস

ইসলামের ইতিহাসে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করা হতো না এবং মহাজাগতিক সূত্রগুলো বোঝার দ্বারাও স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হতো না। যে স্রষ্টা আকৃতি প্রদানকারী, নবউদ্ভাবক। বরং এই মহাজাগতিক সূত্রাবলির কার্যক্রমের প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করা ছিল ঈমান পাকাপোক্ত করার অন্যতম বড় উদ্দীপক। ইসলামের ইতিহাসে অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক, ডাক্তার প্রমুখ জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনী পড়লে দেখা যায়, তারা ধর্মীয় বিষয়েও বড় জ্ঞানী ছিলেন। (যেমন আল-কাজওয়িনি বিচারক, আইনবিদ, ভূগোলবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন এবং আবহাওয়াবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আল-মাজিরি ছিলেন মালিকি মাজহাবের ফকিহ ও চিকিৎসক। ইবনে কুনফুজ ছিলেন কনস্টানটাইনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী)। তাদের মাঝে এই দুটি বিষয়ই অনায়াসেই একত্রে ছিল : মৌলিক স্রষ্টা প্রভুর প্রতি বিশ্বাস এবং মহাবিশ্বের কাজের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মের গভীর পর্যবেক্ষণ। অথবা এভাবে বলা যায় যে, এই দুটি বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটা কোনো অতিরিক্ত বিষয় ছিল না। বরং তারা কুরআনের ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং তাতে পৃথিবীতে পরিভ্রমণের ও মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করার যে আহ্বান ছিল তা নিয়ে কাজ করেছিলেন। যখন তারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করলেন এবং তাদের দৃষ্টি দিগন্তপানে প্রসারিত করলেন, মহান আল্লাহ ও একমাত্র উপাস্যের প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন আরও বৃদ্ধি পেল।[৩৪২]

---

৩৪১. ১৬ মার্চ ২০০৬ সালে ড্যানিয়েল ড্যানেটের টকশো।

৩৪২. আওয়াদ আল-খালফ ও কাসিম সাদ। الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية (দুবাই : দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন অ্যাওয়ার্ড, ১৪৩৬ হিজরি, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ) এই বইতে হাজারের ওপর মুসলিম বিজ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা একই সাথে শরিয়তের আলেম ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী ছিলেন।

ধর্মীয় ধ্যানধারণার সাথে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সংযোগ অতীতে ইসলামি পণ্ডিতদের অনেক রচনায় পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ আল খাওয়ারিজমি (মৃত্যু : ৮৫০) তার বইয়ে লেনদেন ও ওসিয়তের জন্য শেষ অধ্যায়টি নির্ধারণ করেছিলেন, তার নাম ছিল 'আল জাবর ওয়াল মুকাবালাহ'। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ সময়ের বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখেছেন এবং সূর্যোদয়ের পর থেকে সময় নির্দেশ করার জন্য সময়সূচি নির্ধারণ করেছেন এবং কিবলা নির্ধারণের বিষয়ে লিখেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাধ্যম ছাড়াই সময় এবং কিবলার দিকটি সহজে জানার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যেমন শিহাব উদ্দিন আল-কালয়ুবি, যিনি 'الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة وما يتعلق بهما من غير آلة' পুস্তিকার লেখক।

গবেষকরা প্রায় ১১০০ হি/১৭০০ ইং সালের দিকের একটি মেশিন খুঁজে পান, যাতে ২২.৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি ছোট বৃত্ত রয়েছে, যার ওপর মক্কা মুকাররমাকে কেন্দ্র করে চীন থেকে আন্দালুসিয়া পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বের একটি মানচিত্র অঙ্কিত রয়েছে। কিবলা অভিমুখী হওয়া ও তা থেকে দূরত্ব হিসেবে অন্যান্য দেশের অবস্থানও চিত্রিত রয়েছে। এটিকে কিবলার প্রথম মানচিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়, যা দিকনির্দেশ ও দূরত্ব একসাথে প্রদর্শন করে। এটি ১৯২০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক কার্ল শয়-এর মানচিত্র প্রকাশের আগের ঘটনা।[৩৪৩] অতএব একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, ইসলামি ধারণায় বিজ্ঞান হলো ধর্মীয় মতবাদের শিষ্য ও তার অনুগত।

জন ড্র্যাপার[৩৪৪] 'History of the Conflict Between Religion and Science' নামে একটি বিখ্যাত বই লিখেছেন। যেখানে তিনি বিজ্ঞানকে ধর্মের, বিশেষ করে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ধর্মীয় কর্তৃত্বের তিক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এমনকি বেশিরভাগ গবেষক বইটিকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চিত্রিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উগ্র বইগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং ধর্মের বিরোধিতাকারী পাশ্চাত্য মানসিকতায় সবচেয়ে প্রভাবশালী হিসেবে বিবেচনা করেন। লেখক যখন ইসলাম সম্পর্কে কথা বলেছেন তখন ইসলামকে ঐশ্বরিক হিসেবে দেখেননি,

---

৩৪৩. আহমেদ ফুয়াদ আকারিয়া, মুকারাবাতুন ইলমিয়্যাতুন লিল মাকাসিদিস শারইয়্যাহ (রিয়াদ : আরব জার্নাল ১৪৩৭ হি), পৃষ্ঠা ২০

৩৪৪. John Draper (১৮১১-১৮৮২) : ইংরেজ পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, ইতিহাসবিদ এবং দার্শনিক।

এবং তিনি ইসলামকে 'আরবীয় সংস্কার' নাম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : নবি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণের পর 'The cultivation of science was restored' তথা, বিজ্ঞানচর্চা পুনরায় শুরু করা হয়েছিল।[৩৮৪]

কুরআনের আহবানে বিশ্বজগৎকে পর্যবেক্ষণ করলে ঈমানের বিকাশ বৃদ্ধি পায় এবং এর শিকড় গভীর হয়। এ ব্যাপারে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

'যিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। ফের দৃষ্টিপাত করে দেখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর বারবার দৃষ্টিপাত করো। তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।' [সুরা মুলক, আয়াত ৩-৪]

সুতরাং সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখও (ত্রুটি দেখতে না পেয়ে) ফিরে আসে এবং দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে মহাবিশ্ব সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্ট, যার প্রতিটি অংশ সুবিন্যস্ত। এটিই প্রমাণ করে যে নিশ্চয় একজন স্রষ্টা রয়েছেন। যিনি জ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। এটি অবস্তুগত প্রথম ব্যাখ্যা থেকে তার অমুখাপেক্ষী হওয়ার দলিল নয়।

যখন আল্লাহ তাআলার বাণী অবতীর্ণ হলো :

'নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে বহু নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। সুতরাং তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো।' [সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯০-১৯১]

তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত কাঁদলেন এবং বললেন, 'আজ রাতে আমার ওপর এমন একটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে ব্যক্তি আয়াতটি পড়ে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা না করবে, তার জন্য অকল্যাণ অবধারিত।'[৩৮৫]

---

৩৮৪. John William Draper, History of the Conflict Between Religion and Science (New York: D. Appleton and Company, 1878) p. 68

৩৮৫. ইবনে হিব্বানের বর্ণনা, কিতাবুর রকাহিক, বাবুত তাওবাহ। হাদিস নং ৬২৬। শায়খ আলবানি এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন।

সুতরাং প্রকৃতির ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ মহাবিশ্বের এত চমৎকার বিন্যাসের কারণ সম্পর্কে চিন্তা করতে অন্তরকে আকৃষ্ট করে।

এই অবস্থায় আল্লাহর প্রতি ঈমানের কারণ হলো, এটি প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপের একমাত্র যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা, যা বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট গাণিতিক কাঠামো এবং অভিনব পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণের মাধ্যমে বুঝতে পারে। বিজ্ঞান প্রকৃতির কার্যক্রমের একটি বর্ণনামূলক চিত্র। বিজ্ঞান অস্তিত্বের গতিবিধি তৈরি করে না, বরং এই ঘটনাগুলোকে সুবিন্যস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক বক্তব্যে রূপান্তরিত করে, যা মানুষ একটি ধারাক্রম অনুযায়ী বুঝতে পারে, যার মাধ্যমে সে মহাবিশ্বের বর্তমান কাজ, এর অতীত বা এর কিছু অংশ এবং এর ভবিষ্যৎ বা এর কিছু অংশ উপলব্ধি করে।

বিজ্ঞানের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সূত্রের অস্তিত্ব, তার ধারাবাহিকতা এবং সমগ্র বস্তুজগতের ওপর তার আধিপত্য মেনে নেওয়ার ওপর নির্ভরশীল। যদি সূত্রটি পদার্থের কাজকে পরিচালনা করে, তাহলে বিজ্ঞানের কোনো ভূমিকা নেই, এমনকি যদি মহাবিশ্বের শৃঙ্খলা প্রতি মুহূর্তে হঠাৎ, অস্থির ও এলোমেলোভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহলে বিজ্ঞান নিজে নিজেই বাতিল হয়ে যাবে। একইসাথে বৈজ্ঞানিক বর্ণনার ভিত্তিতে মহাবিশ্বকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাটি একটি অনর্থক বিষয়ে পরিণত হবে। এই সমস্ত কিছু বিজ্ঞানকে এমন রহস্যময় এবং বিভ্রান্তিকর করে তোলে, যার একটি উচ্চতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

যেমন দার্শনিক রিচার্ড সুইনবার্ন[৩৪৭] সর্বদা বলেন, 'আমি এটা দাবি করি না যে, একজন শূন্যতার ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। এমন ঈশ্বর যার একমাত্র কাজ হলো সে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা, যা বিজ্ঞান এখনো ব্যাখ্যা করতে পারেনি। আমি মনে করি বিজ্ঞান কেন মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য একজন ঈশ্বর আছেন। আমি অস্বীকার করি না যে বিজ্ঞান মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করে। তবে বিজ্ঞান কেন মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছি। প্রাকৃতিক জগতের বিস্ময় সুস্পষ্টকরণে বিজ্ঞানের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে তা এমন শক্তিশালী কারণ প্রদান করে, যার ফলে এই শৃঙ্খলার আরও গভীর একটি কারণের অস্তিত্বের দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়।[৩৪৮]

---

৩৪৭. Richard Swinburne (১৯৩৪-) : ব্রিটেনে ধর্ম দর্শনের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। অক্সফোর্ডে শিক্ষকতা করেছেন।

৩৪৮. Richard Swinburne, Is there a God? (Oxford, Oxford University Press, 1996) p.68

এবং আমাদের উপলব্ধি হলো, সূত্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে বস্তু এবং শক্তির অংশগুলোর জটিল, যৌগিক, সুন্দর ও চমৎকার বিন্যাসের অস্তিত্বের ওপর। এবং যে ব্যবস্থাপনাটি প্রাথমিক বিশৃঙ্খলার একটি বৈশিষ্ট্য হওয়ার সামর্থ্য রাখে না। বরং এটি প্রজ্ঞা, অভিপ্রায় ও পরিকল্পনার একটি নিদর্শন। এ সবকিছুই প্রাকৃতিক সূত্রাবলিকে আল্লাহর অস্তিত্বের একটি শক্ত দলিলে পরিণত করে।

আল্লাহর শক্তি ও প্রজ্ঞার বিবরণে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসাবের অধীন।' [সুরা আর রাহমান, আয়াত ৫]

অর্থাৎ তারা একটি সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে। এতে কোনো বিঘ্নতা বা বিপত্তি ঘটে না।[৫৪৯]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষপথে ভেসে বেড়ায়।' [সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, 'তিনি ভোরের উন্মেষকারী। তিনি রাত্রিকে বানিয়েছেন আরামের সময় আর সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন এক বিশেষ হিসেবের অধীন। এটি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।' [সুরা আনআম, আয়াত ৯৬]

মানুষ যখন এই ভৌত অস্তিত্বকে সুবিন্যস্ত হিসেবে আশা করে, কেবল তখনই বৈজ্ঞানিক জীব হতে পারে। সুনির্ধারিত সূত্রাবলি উন্মোচনের চাহিদার মূলে রয়েছে এই বিন্যাসের অস্তিত্ব। মানবীয় অনুভূতিতে যদি এই অস্তিত্ব চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত বস্তু হয়, যা অন্ধভাবে চলে, তাহলে সূত্র উন্মোচনের প্রচেষ্টার কোনো অর্থ থাকবে না। কারণ বিশৃঙ্খলা সুবিন্যস্ত ভৌত কাঠামোতে অস্তিত্বকে বিন্যস্ত করে না বা এটি নিয়মিত পন্থা অনুসরণ করে না। এ কারণেই পদার্থবিদ জন হটন[৫৫০] বলেছেন, 'আমাদের বিজ্ঞান ও ঈশ্বরের বিজ্ঞান একই। মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক বর্ণনায় যে বিস্ময়কর ক্রম, ধারাবাহিকতা, নির্ভরযোগ্যতা

---

৫৪৯. ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, তাহকিক : আমি বিন মুহাম্মাদ সালামাহ, (দারুত তয়্যিবাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওজি ওয়াত তবয়াহ : ১৪২০ হিজরি, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) ৭/৪৮৯

৫৫০. John Houghton (১৯৩১-) : ব্রিটিশ পদার্থবিদ। বিজ্ঞান ও ধর্মের আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা।

ও আশ্চর্যজনক জটিলতা পাওয়া যায় তা হলো, ঈশ্বরের কাজের ক্রম, ধারাবাহিকতা, নির্ভরযোগ্যতা ও জটিলতার প্রতিফলন।'[৩৫১]

সূত্রের অস্তিত্ব এবং কারণ ও প্রভাবের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই শুধু যুক্তিসংগত বিজ্ঞানের অস্তিত্বের কল্পনা করা যায়। এই বিজ্ঞান প্রকৃতিকে বোঝার জন্য গবেষণা করে। সুতরাং এক প্রজ্ঞাপূর্ণ সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসই অস্তিত্বের সম্ভাবনা মহাবিশ্বের স্বরূপ অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অনুমোদন দেয়। কেননা তিনিই অস্তিত্বের প্রথম ভিত্তির বিবরণ প্রদান করেন, যদি আমরা যৌক্তিক ভিত্তিতে বিশ্বাস রাখি।

পদার্থবিজ্ঞানী এডগার অ্যান্ড্রুজ[৩৫২] এই সত্যটি প্রকাশ করেছেন যে, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু একটা প্রয়োজন। কারণ বাস্তবে সূত্রগুলো কোনো কিছু ব্যাখ্যা করে না, বরং তা হচ্ছে শুধুমাত্র জিনিসের বর্ণনা। তার বক্তব্য, যখন আমরা বলি 'বিজ্ঞান' কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করে, আমরা সাধারণত এর মাধ্যমে বোঝাই, প্রশ্নে থাকা ঘটনার একটি বৈজ্ঞানিক 'বর্ণনা' আছে। একই কথা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্ষেত্রেও, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি আমাদেরকে বাতাসে ঘুরপাক খাওয়া থেকে এবং হিলিয়াম বেলুনের মতো সিলিংয়ে আঘাত পাওয়া থেকে বিরত রাখে। এটি (মাধ্যাকর্ষণ) একটি সরল গাণিতিক সমীকরণে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই গাণিতিক সূত্রটি দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ বলকে তাদের ভর দ্বারা পরিমাপ করে, সর্বজনীন ধ্রুবক 'মহাকর্ষীয় ধ্রুবক' দ্বারা গুণ করে এবং তাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গ দ্বারা ভাগ করে। কিন্তু এই সমীকরণ বা গাণিতিক সূত্র কি এটা ব্যাখ্যা করে যে, কেন আপনার মাথা সিলিংয়ে আঘাত করছে না? বাস্তবে এটি তা করে না। এটি আমাদেরকে অবগত করে যে, একটি শক্তি আছে যা আমাদের পা মাটিতে রাখে। কিন্তু আপনি তা জানেন কর্মের দ্বারা। এটি সেই শক্তিকেও পরিমাপ করে, যা আমাদেরকে যেকোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার শক্তি গণনা করার সুযোগ দেয়। সর্বোপরি এই বিষয়টি অবশ্যই উপকারী। কিন্তু এটি আমাদেরকে এই তথ্য দেয় না, কেন এই ধরনের একটি বল বিদ্যমান, কেন বর্গের বিপরীত সূত্র অনুসরণ

---

৩৫১. John Houghton, The Search for God – Can Science Help? (Oxford Lion, 1995) p. 59

৩৫২. Edgar Andrews (১৯৩২-) : ইংরেজ প্রকৌশলী ও পদার্থবিদ। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

করে এবং কেন মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান আছে। সমীকরণটি মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা হওয়ার চেয়ে বর্ণনা হিসেবে অধিক উপযুক্ত।[৩২৩]

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আসলে গাণিতিক ও পরিমাণগত ধারণার সংখ্যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা আমরা আমাদের চারপাশের জগৎকে কতটা অনুধাবন করতে পারি তা সরলীকরণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। এটি তত্ত্বটিকে পরীক্ষা করার এবং এর যথার্থতা যাচাই করার ও এটি থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেয়।[৩২৪] অতএব বিজ্ঞানী যখন প্রাকৃতিক ঘটনার সঠিক বর্ণনা আবিষ্কার করেন, তখন তিনি এর কারণ জেনেই শেষ করেন না; বরং এর কাজের সত্যতা জানার মাধ্যমে সমাপ্ত করেন। অর্থাৎ এর বাহ্যিক যান্ত্রিক দিকটি, যা তাকে মহাবিশ্ব এভাবে সৃষ্টি করার ব্যাপারে মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা অনুধাবনে সহায়তা করে।

মহাবিশ্বের বাস্তব চিত্র অনুধাবনের জন্য বিজ্ঞানীরা যে স্বয়ংক্রিয় মডেলটি তৈরি করেছেন তা মহাবিশ্বের কার্যক্রমের জন্য উচ্চতর ব্যাখ্যা অনুসন্ধানের অমুখাপেক্ষী নয়। তাই যখন ইয়োহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) গ্রহের গতির গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তখন তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমার মতোই ভাবি!'[৩২৫] কেপলারের সমীকরণে ঐশ্বরিক উপস্থিতির প্রতিনিধিত্বকারী কোনো নিদর্শন নেই, কিন্তু এ কারণে তিনি এই সূত্রগুলোকে আল্লাহর প্রজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত করা থেকে বিরত থাকেননি।[৩২৬]

আমরা এমন অস্তিত্বের সম্মুখে রয়েছি, যার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে একটি উচ্চতর ব্যাখ্যার অভাব, যা সমগ্র অস্তিত্বকে যৌক্তিক করে তোলে। অ্যান্টনি ফ্লু[৩২৭] একজন নাস্তিক দার্শনিক ছিলেন। দশকের পর দশক নাস্তিক্য দর্শন নিয়ে লেখালেখি এবং

---

৩২৩. এডগার অ্যান্ড্রুজ, 'মান খালাকাল্লাহ?', আরবি অনুবাদ : হাদি বাহিদ ও সামি মরগান। (লেবানন, মারকাজু মরগান। ২০১৪) পৃষ্ঠা ৩৪

৩২৪. এডগার অ্যান্ড্রুজ, মান খালাকাল্লাহ? পৃষ্ঠা ৩৫

৩২৫. এই অভিব্যক্তি আমাদের নিকট গ্রহণীয় নয়। কিন্তু এটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যবস্থার সাথে আকলের সামঞ্জস্য প্রকাশ করে।

৩২৬. এডগার অ্যান্ড্রুজ, মান খালাকাল্লাহ? পৃষ্ঠা ৭২

৩২৭. Antony Flew (১৯২৩-২০১০) : বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক। তাঁর লেখা বিশে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নাস্তিক্য বিশ্বাসের আলোচনার বেশ কিছু তত্ত্ব সংজ্ঞায়িত করেছে। তার বই 'দেয়ার ইজ আ গড'-এ একজন স্রষ্টায় তার ঈমান আনার কারণ বর্ণনা করেছেন।

তর্ক-বিতর্ক করে তিনি নাস্তিকদের পথ প্রবর্তকের ভূমিকা পালন করছিলেন। এরপর যখন তিনি এই অস্তিত্বের মাঝে প্রজ্ঞা থেকে নির্গত সূত্র পর্যবেক্ষণ করেন তখন প্রবল ঘৃণাভরে নাস্তিকতা পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেন। এজন্য তিনি বলেন, 'বিষয়টি শুধু প্রকৃতিতে কার্যপ্রণালির অস্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই কার্যপ্রণালি গাণিতিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভুল, সর্বজনীনতার সাথে আন্তঃসম্পর্কিত। কীভাবে প্রকৃতি এমন যথাযথ হয়ে উঠল? নিউটন থেকে আইনস্টাইন, এমনকি হাইজেনবার্গ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এর উত্তরে বলেছেন, নিশ্চয় তা আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকে এমন হয়েছে।'[৩৫৮] অজ্ঞেয়বাদী পদার্থবিদ পল ডেভিস আশ্চর্যজনক গাণিতিক চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বলেছেন, একটি মৌলিক, গভীর ও চমকপ্রদ গাণিতিক একক রয়েছে, যা একটি বস্তুনিরপেক্ষ ধারণাগত পরিকল্পনায় সবকিছুকে একত্রে আবদ্ধ করে। বিজ্ঞানের ব্যবহার ছাড়া আমরা কখনোই এই ধরনের গভীর গাণিতিক এককে পৌঁছাতে পারতাম না এবং এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, আমরা এখানে পৌঁছাতে সক্ষম।'[৩৫৯]

অস্তিত্বের বুনন ও অভিনব বসন চিন্তাশীল হৃদয়ে একটি প্রবল অনুভূতি। এই দৃঢ় অনুভূতি আকাশ পর্যবেক্ষণকারীর ও ভূমি গবেষকের অন্তরকে আন্দোলিত করে। এজন্যই বিখ্যাত নাস্তিক গণিতবিদ, রজার পেনরোজ[৩৬০] বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'এটা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, এই রকম বিস্ময়কর অনন্য তত্ত্বগুলো শুধু ধারণাগুলোর এলোমেলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই উদ্ভূত হতে পারে, যা কেবল ভালো ধারণাগুলোকে টিকিয়ে রাখে। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের মাঝে সামঞ্জস্যের জন্য অবশ্যই এখানে আরও সুগভীর কিছু কারণ থাকা অপরিহার্য।'[৩৬১]

> বিজ্ঞান নির্ভরশীল>বিন্যাসের অস্তিত্ব, যার কারণ>মহাবিশ্বের পেছনে একজন জ্ঞানী, শক্তিশালী, প্রজ্ঞাবান সত্তা রয়েছেন।

---

৩৫৮. Antony Flew, There is a God (London: Harper One, 2007) p. 96

৩৫৯. Paul Davies, Are We Alone? Philosophical Implications of the Discovery of Extraterrestrial Life (New York, NY Basic Books, 1995), 124

৩৬০. Roger Penrose (১৯৩১-) : প্রখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ ও গণিতবিদ। তিনি 'Wolf Prize in Physics' অর্জন করেছিলেন।

৩৬১. Roger Penrose, The Emperor's New Mind (London: Vintage, 1991) p. 430

এমনকি এই (প্রাকৃতিক) আইনগুলোর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, এগুলো জটিল, মুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় গাণিতিক কাঠামোতে সুসজ্জিত, যা মহাবিশ্বের গঠন চুম্বকে অনুসন্ধানকারীকে তার রহস্যের পাঠোদ্ধার করতে এবং তার প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণে প্রলুব্ধ করে। বিশ্বকে অনুধাবন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্কে গাণিতিক মাধ্যাকর্ষণ ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। গণিতবিদ মরিস ক্লাইন[৩৬৩] বলেছেন, 'প্রাথমিক গণিতবিদরা সুনিশ্চিত ছিলেন যে প্রাকৃতিক ঘটনার নেপথ্যে গাণিতিক সূত্রের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তারা অনবরত এই সূত্রগুলোর অনুসন্ধান করতে থাকেন। কারণ তারা নিশ্চিত ছিলেন যে ঈশ্বর মহাবিশ্বের নির্মাণে এই সূত্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৩৬৪]

এজন্যই বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দুতে ঈশ্বরে বিশ্বাসকে স্থাপন করেনি এমন সভ্যতাগুলো মহাবিশ্বের অন্বেষণে তাদের প্রচেষ্টায় বেশ দুর্বল ছিল। বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে খ্রিস্ট ব্যতীত খুব কমই এর ব্যতিক্রম ছিল। এর অন্যতম প্রমাণ হলো জোসেফ নিডহ্যাম[৩৬৫] যা উল্লেখ করেছেন, তিনি চীনে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের বিলম্ব নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, এর কারণ হলো চীনাদের মধ্যে এমন কোনো বিশ্বাস ছিল না যে, প্রকৃতির নিয়মগুলো উন্মোচন করা এবং অধ্যয়ন করা সম্ভব। কারণ এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না যে, কোনো ঐশ্বরিক সত্তা আইনগুলোকে এমনভাবে প্রণয়ন করেছেন, যার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব।[৩৬৬]

মানবজাতির ইতিহাসে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল হিজরি প্রথম শতাব্দীতে। এমনকি এটাকে অনেকটা অলৌকিক বিষয়ের মতোই বিবেচনা করা হতো, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যায়। প্রাচীন সভ্যতার সাধারণ মানুষ আকাশকে বিশৃঙ্খলার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখত। জ্যোতির্বিদ্যা যখন প্রথম বৈজ্ঞানিক সূচনা করেছিল, তখন আকাশে নক্ষত্রগুলোর পর্যবেক্ষণ একটি নতুন

---

৩৬৩. Morris Kline (১৯০৮-১৯৯২) : মার্কিন গণিতবিদ ও গণিতের ইতিহাসবিদ।

৩৬৪. Morris Kline, Mathematics (New York: University Press, ১৯৮০) p. ৩৫

৩৬৫. Joseph Needham (১৯০০-১৯৯৫) : ব্রিটিশ জৈব রসায়নবিদ ও বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক। ব্রিটিশ রয়েল একাডেমির সদস্য।

৩৬৬. Joseph Needham, Grand Titration (Toronto: University Press, 1969), p.327

দর্শনের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, যা সবকিছুতে জ্ঞান দেখতে পায়। তা মানমন্দিরের জগৎ থেকে দেখে, অন্য জগৎগুলো বিশৃঙ্খলভাবে নয়, বরং সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কারণেই পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেঞ্জার (যিনি একবিংশ শতাব্দীর 'নব্য নাস্তিক্যবাদ' এর নেতাদের একজন) বলেছেন, ইউরোপ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন ইসলাম, গ্রীক ও রোমানরা অনেক বিজ্ঞান সংরক্ষণ করেছিল, পাশাপাশি নিজস্ব বিজ্ঞানের একটি বড় অংশ নিয়ে তার স্বর্ণযুগ অতিক্রম করছিল।[৩৬৬]

এই চিত্রটি স্পষ্ট হওয়ার জন্য বিষয়টি বস্তুবাদী নাস্তিক্য দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ফলে এর বিপরীত মাধ্যমে বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরা যাক, প্রথম বিগ ব্যাং তার উদ্দেশ্যহীন বিশৃঙ্খলা এবং বিনাশের সাথেই সঠিকভাবে বিস্ফোরণের গুণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল, তাহলে এই বিস্ফোরণ থেকে কি এমন আশা করা যায় যে, এটি এমন একটি বিশ্ব প্রদান করবে, যা সংগঠিত, আন্তঃসম্পর্কিত এবং সুন্দর আইন অনুসরণ করে? বিশৃঙ্খলা থেকে কি শৃঙ্খলা ও আইন তৈরি হতে পারে! বিস্ময়কর প্রকৌশলগত এবং গাণিতিক কাঠামো তো দূরের কথা, বিশৃঙ্খলা তো অর্থই প্রদান করতে অক্ষম। অথচ একজন ব্যক্তি সেই কাঠামোকে সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য বৈজ্ঞানিক আকৃতিতে তৈরি করতে পারে। আইনের অস্তিত্ব বেশ অদ্ভুত। অথবা পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী রিচার্ড ফাইনম্যান[৩৬৭] বর্ণনা করেছেন, 'এটি একটি অলৌকিক ঘটনা।'[৩৬৮]

আমরা এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছি, যা তাদের প্রকৃতির কারণে বা সম্ভাবনাগতভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে, তারা প্রজ্ঞা ছাড়া অন্য কিছুর ফলস্বরূপ সৃষ্ট। এই প্রজ্ঞা বস্তু এবং এর উদ্দেশ্যহীনতা থেকে অনেক উর্ধ্বে। যেমন শুধু পৃথিবীতে জীবনের প্রকৃতি এবং চার বিলিয়ন বছর যাবৎ ঘটনাগুলো ধরা যাক :

---

৩৬৬. John W. Loftus, ed. Christianity in the Light of Science: Critically Examinning the World's Largest Religion. Prometheus Books, Kindle Edition.

৩৬৭. Richard Feynman (১৯১৮-১৯৮৮) : প্রখ্যাত মার্কিন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৩৬৮. Richard Feynman, The Meaning of it All (London: Penguin Books, 2007) p.23

- জীবনের উৎপত্তি এবং প্রথম জিনোমে তথ্য প্রকাশিত হওয়া। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যহীনতা অসম্ভব। কেননা উদ্দেশ্যহীনতা থেকে তথ্যের উৎপত্তি হতে পারে না।

- 'প্রথম কোষের প্রথম কার্যকরী জটিলতা পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের সংকীর্ণ সময়ের সাথে মিলিত হয় না'—এই সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত কার্যকরী সত্তা তৈরি করতে পরীক্ষা এবং পুনরাবৃত্তির অনুমোদন না দেওয়া।

- পুরুষ এবং মহিলা প্রজাতির আবির্ভাব। যদিও বিভাগ দ্বারা প্রজনন কম কষ্টসাধ্য এবং যৌন প্রজনন খুবই জটিল।

- জীবন্ত প্রাণীর বৃহৎ প্রজাতির আকস্মিক আবির্ভাব বা বিস্ফোরক হিসেবে তাদেরকে গণ্য করা হয়।

- মানুষের মধ্যে চেতনার উত্থান। এটি একটি অ-বস্তুগত ঘটনা, এটি পরিমাণগত নয়।

এই ঘটনাগুলোকে অবশ্যই জ্ঞান এবং ক্ষমতা অভিমুখী করা উচিত, শুধুমাত্র অন্ধ উদ্দেশ্যহীনতা কিংবা অযৌক্তিকতার দিকে নয়। যে ভূমিকার ওপর বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে (বিন্যাস, ঐক্য, সম্প্রীতি, সৌন্দর্য), তা নাস্তিক্য মহাজাগতিক ধারণার চেয়ে ঐশ্বরিক মহাজাগতিক ধারণার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল।

এ সবকিছুর শুরুতেই রয়েছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। যে মস্তিষ্ক একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যবস্থা তৈরি করে তা সঠিক হওয়ার দাবি করতে সক্ষম, সেই মস্তিষ্কে বিশ্বাসের জন্যই আল্লাহর ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। দেকার্ত-নীতিতে পাশ্চাত্য জ্ঞানের ইতিহাসে তা সুস্পষ্ট। যেহেতু এই দার্শনিক অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত এক ঈশ্বরে বিশ্বাস হলো প্রথম যৌক্তিক নীতি, যা চিন্তার ওপর আস্থা নিশ্চিত করতে আবশ্যক। অধিবিদ্যা ছাড়া (যার মূল হলো বিশ্বাস) কোনোভাবেই পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠার কোনো আশা করা যাবে না, যা দৃঢ়ভাবে প্রমাণসিদ্ধ হবে, এই বিশ্বাস যুক্তি ও স্মৃতিকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয় এবং এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।[৩৬৯]

---

৩৬৯. জেমস কলিন্স, গড ইন মডার্ন ফিলোসফি, আরবি অনুবাদ : ফুআদ কামেল (কায়রো : দার কুবা, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ১৬-১৭ দ্রষ্টব্য

বিজ্ঞান কি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারের সক্ষমতা রাখে?

> 'আসল কথা হচ্ছে, তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে সেই বিষয়কে, যার জ্ঞান তারা আয়ত্ত করতে পারেনি।' [সুরা ইউনুস, আয়াত ৩৯]

> 'আমার জ্ঞান আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করেছে যে, বিজ্ঞানের মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব যতটুকু ব্যাখ্যা করা সম্ভব, মহাবিশ্ব তার চেয়েও অধিক জটিল। প্রকৃতিবাদের উর্ধ্বে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আমি এই অস্তিত্বের রহস্য বুঝতে পারি।'[৩৭০]
>
> —বিংশ শতাব্দীর মার্কিন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যালেন স্যান্ডেজ

ডকিন্সের বক্তব্য হচ্ছে, 'বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের ভিত্তি এমন যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা প্রকাশ্যে সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করা সম্ভব। অথচ ধর্মীয় বিশ্বাসে যুক্তির কোনো স্থান নেই, বরং যুক্তির অমুখাপেক্ষিতাই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।'[৩৭১] এটাই নাস্তিক বিজ্ঞানবাদীদের দাবি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিশ্বাস হচ্ছে যৌক্তিক, তার প্রমাণ সুদৃঢ়, আর ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্তির অমুখাপেক্ষী। সুতরাং ওই ধরনের বিশ্বাস অন্তরে সুস্থির হয় না, অথবা তৃপ্তি দেয় না, যা যুক্তি থেকে পরিপূর্ণ পৃথক হয়।

---

৩৭০. Cited in: Anthony Walsh, Answering the New Atheists: How Science Points to God (Wilmington, Delaware: Malaga, Spain: Vernon Press, 2019), p.64

৩৭১. Daily Telegraph Science Extra, Sept 11, 1989

ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতায় বিজ্ঞানবাদী বিরোধ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় এ কথার মাধ্যমে যে, যুক্তি শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে পৃথক বিষয় এতটুকুই নয়, বরং পরিশেষে যুক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকেই অবান্তর ঘোষণা করে। সুতরাং বিজ্ঞান ও এক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস মৌলিকভাবেই বিপরীতমুখী, সাংঘর্ষিক। ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভ্রমের বিপরীতে বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট দলিলের কারণে এই বৈপরীত্য শেষ পর্যন্ত ঈমানকেই বাতিল সাব্যস্ত করে। পিটার অ্যাটকিন্স বলেন, 'বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব। মানুষের উচিত নিজ সৃষ্টির শক্তিমত্তার কদর করা। এদের মাঝে সমঝোতা করার সকল প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত। আমার মতে ধর্ম ব্যর্থ হয়েছে এবং এর ব্যর্থতা এখন প্রকাশ্যে আসা উচিত।'[৩৭২]

এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত আগ্রহভরে আমরা যথাযথভাবে এই প্রশ্নগুলো করতে চাই :

- বর্তমানে 'বিজ্ঞান' শব্দটি যে পরিভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে তা অনুযায়ী আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান কি একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান? অর্থাৎ তা কি এমন পরীক্ষামূলক বিষয়ের অন্তর্গত, যে বিষয়ে বিজ্ঞানের কথা বলার অথবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে?
- রবের অস্তিত্বের বিষয়ের বৈজ্ঞানিক দিকটি স্বীকার করে নিলেও কোন প্রমাণটি এই অস্তিত্ব সত্য প্রমাণিত করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবাদীকে পরিতুষ্ট করতে পারে?
- বিজ্ঞানবাদীরা সবকিছু যে প্রকৃতি হিসেবে দেখে তা কি সবকিছুর চূড়ান্ত কারণ হতে পারে?
- প্রাকৃতিক মহাবিশ্বে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ কি প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকার দিকে ইঙ্গিত করে না-কি ভিন্ন কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে?
- 'প্রকৃতিবিজ্ঞানীগণ সাধারণত নাস্তিক হন' এই দাবির দ্বারা কি নাস্তিকতা সমর্থন লাভ করে?

---

৩৭২. Peter Atkins, The limitless power of science, in Nature's Imagination - The Frontiers of Scientific Vision, ed. John Cornwell (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 132

এটি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্নই নয়!

নাস্তিক বিজ্ঞানবাদীরা অত্যন্ত দৃপ্তকণ্ঠে বলে, একজন ব্যক্তি অন্ধ আবেগ ব্যতীত কোনোভাবেই বিশ্বাসের সঠিকতা প্রমাণ করতে পারবে না। যৌক্তিক কিংবা বিজ্ঞানবাদী বিশ্বাস প্রমাণ করা অসম্ভব। ঈমান তো কেবল অতি আবেগের নাম, যার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বরং যুক্তির অবস্থান বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা ঈমান হচ্ছে অন্ধ স্বীকৃতি প্রদান। আর যদি ঈমানের যুক্তি উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তা আর বিশ্বাস হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না, বরং তা ভিন্ন কিছুতে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানবাদীরা আরও দাবি করে, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী হওয়া মানবীয় চিন্তার শিশুসুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞানীদের থেকে প্রাপ্ত। তাদের বক্তব্য ছিল, একজন প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মানুষকে আবার সেই অজ্ঞতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে মহাবিশ্বের ঘটনাসমূহের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যার মাধ্যমে। মানুষ যখন সেই ঈমানি বিশ্বাসের অজ্ঞতার ধাপ অতিক্রম করে প্রকৃতির সূত্রসমূহ উদ্ঘাটন করল, তখন বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনেই স্থির হলো, যা প্রকৃতির কার্যক্রমের স্বয়ংক্রিয়তা উন্মোচনকারী। এমন প্রভুতে বিশ্বাস করতে চাইল না, যাকে ধারণা করা হয় যে তার দ্বারা অবগতি লাভের ছিদ্রগুলো ভরাট করা হয়।

উপরন্তু ধর্মকে পরাস্তকরণে বিজ্ঞানের প্রভাব বর্ণনায় আরও উপস্থাপন করা হয় যে, কয়েকজন প্রখ্যাত নাস্তিক আসমানি কিতাবসমূহের 'বৈজ্ঞানিক' ভুল ধরার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। যাতে করে পরিপূর্ণভাবে ওহিকে বাতিল সাব্যস্ত করা যায়। তা থেকেই স্যাম হ্যারিসের বিখ্যাত বই 'লেটার টু আ ক্রিস্টিয়ান ন্যাশন'-এ বলা হয়েছে, খ্রিষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়। কেননা তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে না। যেমন : বিদ্যুৎ, ক্রোমোজমাল ডিএনএ, ক্যান্সার ও তার প্রতিষেধক![৩৭৩]

প্রখ্যাত জীবাশ্মবিদ স্টিফেন জে গুল্ড যখন বিজ্ঞানবাদীদের এই ধর্ম ও বিজ্ঞানের সাংঘর্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেন, তখন দুটি দলের মাঝে সমন্বয় করেন—যারা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও সুস্পষ্ট ভ্রান্তিহীন ওহির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেন, আর যারা নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে বৈপরীত্যের দাবি

---

৩৭৩. Harris, Letter to a Christian Nation, p.62

ভাবেন। তিনি একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম 'Non-overlapping magisteria'।[৩৭৪] অর্থাৎ এই বক্তব্য, বিজ্ঞান মূলত ধর্মের গণ্ডি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত বিষয় নিয়ে গবেষণায় রত। বিজ্ঞান প্রকৃতির স্বরূপ অন্বেষণ করে, আর ধর্ম মূল্যবোধ প্রচারের মূল বক্তব্য।[৩৭৫]

গুল্ডের এই থিসিস বিজ্ঞানবাদীরা মেনে নেয়নি, তবে লিবারেল ধর্মতাত্ত্বিক ও সংশয়ী নেতাদের নিকট এ কথা প্রচলিত রয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টিকে একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন হিসেবে দেখে। তাদের এই অবস্থানের কারণে তারা নিয়মতান্ত্রিক প্রকৃতিবাদের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। সুতরাং তাদের নিকট পদার্থই সব। এজন্যই প্রভুর অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তাদের নিকট শুধু বৈধ নয়, বরং আবশ্যক। কেননা কেবল বিজ্ঞানেরই অধিকার রয়েছে পদার্থের মাঝে সীমাবদ্ধ পরিপূর্ণ অস্তিত্বের অনুসন্ধান করার। সুতরাং ঈমানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্ন। এটিকে বৈধতা প্রদান করেছে অন্টোলজিক্যাল মতবাদ, যা অবস্তুগত কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

উদাহরণস্বরূপ যেমনটা প্রকাশিত হয় কট্টর নাস্তিক পদার্থবিদ স্টেঞ্জারের লেখায়, তার সেই বিখ্যাত 'গড : দ্যা ফেইল্ড হাইপোথিসিস' বইতে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করা হয়, বিজ্ঞান কীভাবে প্রমাণ করল যে, আল্লাহ একটি ব্যর্থ অনুমান? আর আল্লাহর অস্তিত্ব মিথ্যা?

স্টেঞ্জার তার বই লেখা শুরু করেছে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। তার বক্তব্য, আমার বিশ্লেষণ এই দাবির ওপর ভিত্তি করে যে, বৈজ্ঞানিক পন্থাগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বও পরীক্ষার যোগ্য। এই সত্যের কারণে যে, মানবজীবন ও মহাবিশ্বের পরিচালনায় প্রধানতম ভূমিকা পালন করার জন্য আল্লাহ একটি অনুমান। নিশ্চয় বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক মডেলে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে মহাবিশ্বে আমাদের পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করার জন্য আল্লাহও একটি উপাদান হিসেবে যুক্ত। এজন্যই যদি আল্লাহর অস্তিত্ব থাকে তবে অবশ্যই এমন কোনো স্থানে তিনি প্রকাশ পাবেন, যা বৈজ্ঞানিক মডেলের শূন্যস্থান অথবা ভুলের অন্তর্গত।[৩৭৬]

---

৩৭৪. সংক্ষেপে NOMA।

৩৭৫. Gould, Nonoverlapping Magisteria' in Natural History 1997, 106 (March): 16-22

৩৭৬. Victor J. Stenger, God. The Failed Hypothesis, p.13

এই বইটির থিসিস হচ্ছে, ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত অনুমানটি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা পরীক্ষাযোগ্য, যাচাইযোগ্য ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উপযুক্ত।[৩৭৭]

উল্লিখিত মতবাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, তা সূচনাতেই ফলাফল লুক্কায়িত রেখেছে। এর দ্বারাই তা কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি প্রকাশ করেছে। যেহেতু তার ভিত্তি হচ্ছে নাস্তিকতাকে প্রমাণ করার আগেই তা অপরিহার্য করে নেওয়া। এটা স্বীকার করার মাধ্যমে যে সমগ্র অস্তিত্ব পদার্থ। এর অর্থ হচ্ছে শুরুতেই ইলাহের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। কেননা ইলাহ তো আবশ্যিকভাবে অবস্তুগত বিষয়। তা এই মহাবিশ্বের বিপরীত।

সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারের জন্য বিজ্ঞানবাদী যুক্তি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দলিল উপস্থাপনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত :

১. শুধু বিজ্ঞানই কোনো কিছুকে প্রমাণ করার বা অস্বীকার করার অধিকার রাখে।
২. বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বের বস্তুর বাইরে কোনো কিছু নিয়ে গবেষণা করে না।
৩. ইলাহ এই বস্তুগত মহাবিশ্বের অন্তর্গত নয়।
৪. আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই।

পূর্ববর্তী প্রমাণ উপস্থাপনে সমস্যা হচ্ছে তার প্রথম ভূমিকাটিই নাস্তিক ও আস্তিকদের মাঝে বিরোধের প্রধানতম ক্ষেত্র। আর এই ভূমিকাটির সঠিকতা প্রমাণে যুক্তি প্রস্তুত না করেই স্বাভাবিকতার স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে। বিতর্ক করার বিষয় সত্য হিসেবে ধরে নেওয়ার ফলে এটি একটি তর্কশাস্ত্রীয় প্রবঞ্চনা।

আস্তিকগণ যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, বিজ্ঞান সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। তার ক্ষেত্র হচ্ছে শুধু নির্দিষ্ট কিছু স্থানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কেননা পর্যবেক্ষণের যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা কাজের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে তোলে। আমরা যদি বিজ্ঞানের জাতীয় একাডেমিকদের সংজ্ঞা[৩৭৮] বিবেচনা করি অথবা দার্শনিক পদার্থবিদ স্ট্যানলি জ্যাকি[৩৭৯] এর সংজ্ঞা 'বিজ্ঞান হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

---

৩৭৭. Ibid, p.29

৩৭৮. যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৭৯. Stanley Jaki (১৯২৪-২০০৯) : পদার্থবিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী চিন্তাবিদ। বিজ্ঞানের দর্শন ও ভৌত বিজ্ঞানের সাথে ঈমানের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিদের মাঝে অন্যতম।

...ও প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের পদ্ধতিগত অধ্যয়ন'[২৮০] বিবেচনা করি, তাহলে এখন আমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বস্তুগত মহাবিশ্বের সীমানার মাঝেই সীমাবদ্ধ করা। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা সূত্রের মাঝে বিধিবদ্ধ বস্তুগত প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের ক্ষেত্র অতিক্রম করতে পারব না। কেননা বিজ্ঞান শুধু এমন বিষয়সমূহই অধ্যয়ন করে, যা পরিমাপগতভাবে সুনির্দিষ্ট।

নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের স্বরূপ হচ্ছে বস্তুগত পদ্ধতিসমূহের সমষ্টি, যা এই অস্তিত্বের কিছু অংশ বা ঘটনাসমূহ উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। পদার্থবিজ্ঞান এই মহাবিশ্বের পদার্থগত দিকটিই অধ্যয়ন করে। জীববিজ্ঞান অধ্যয়ন করে জৈবিক দিকটি। মহাকাশ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে আকাশের গ্রহ নক্ষত্ররাজি। এই বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের কোনোটি আমাদের এই মহাবিশ্বের বস্তুগত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করার জন্য নিজের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে না। সকল বস্তুগত বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় এই মহাবিশ্বকে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের ফল থেকে। এই রূপে তা মহাবিশ্বের কাজের বস্তুগত বর্ণনার পরিধি থেকে বাইরে যায় না।

বিজ্ঞানের বক্তব্যের বাস্তবতা–বিজ্ঞানবাদীরা যেটাকে নাস্তিক্যবাদের সহায়ক হিসেবে দেখে–তা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বাস্তবে এখানে এমন কোনো প্রমাণ নেই, যা পরমাণু বিশ্বের বিপরীত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। সমগ্র অস্তিত্বের বস্তুবাদিতা মেনে নেওয়া প্রমাণহীন প্রাথমিক বর্ণনা; যা দাবি করে, বিদ্যমান সকল কিছু বস্তু, শক্তি ও তাদের একত্রিত হওয়া থেকে বের হয় না।

বিজ্ঞানবাদী সূত্রের মাঝে সবচেয়ে বড় ভ্রান্তিটি হচ্ছে পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদের সঠিকতা ধরে নেওয়া–যা বৈজ্ঞানিক মহলে বলপ্রয়োগের দ্বারা গৃহীত হয়েছে, এরপর অত্যন্ত গোপনে সেখান থেকে অধিবিদ্যাগত প্রকৃতিবাদে চলে যাওয়া এবং উভয়টার মাঝে সংমিশ্রণ ঘটানো। এর ফলে বিজ্ঞানবাদীরা এই বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদী উত্তরের সীমাবদ্ধতা এবং অবস্তুগত প্রতিটি অনুমানকে দূরীভূত করা। যা অবশ্যই সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা হতে হবে। সুতরাং ল্যাবের ভেতরে এবং বাইরে অস্তিত্বের বস্তুবাদিতাই তার আসল রূপ। তাই বিজ্ঞানবাদীরা চিৎকার করে বলে, পশ্চিমা একাডেমিক সার্কেলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা মহাবিশ্ব অধ্যয়নকালে অবস্তুগত কোনো

২৮০. Stanley Jaki, The limits of the limitless science, p.5

কিছু স্বীকার করে না। বৈজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রে এই তথ্যটি সত্য। কিন্তু পরে বিজ্ঞানবাদীরা সরাসরি এ কথা বলা শুরু করে যে, এই পদ্ধতি অর্থাৎ পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ দাবি করে, এই প্রকৃতি বাস্তবে পরিপূর্ণভাবে অধিবিদ্যাগত প্রকৃতিবাদ।

'বাস্তবতার প্রতি আমাদের চিন্তাকে অনুসন্ধান করা উচিত, পদার্থবিজ্ঞান যে বিষয়ে আমাদেরকে তথ্য প্রদান করে, যদি আমরা বিজ্ঞানবাদী হতে চাই, বাস্তবে আমাদের আরও বেশি কিছু করা উচিত : আমাদের নিকট সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে যে আমরা পদার্থবিজ্ঞানকেই ঘটনার পূর্ণ বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা করব।'—আলেকজান্ডার রোজেনবার্গের এই বক্তব্য থেকে পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ থেকে আকস্মিকভাবে অধিবিদ্যাগত প্রকৃতিবাদে চলে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশিত হয়।[৩৮১]

আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি মূলত পরীক্ষামূলক বা নিরীক্ষণীয় গবেষণার কিছু নয়। নাস্তিক দার্শনিক পিগলিউশি বলেন, 'প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে ডকিন্স ও নব্য নাস্তিকদের অধিকাংশই (সকলে নয়) এমন কোনো সঠিকতা নির্ধারণ করতে পারেনি, সুদৃঢ় কিংবা যৌক্তিক কোনো পন্থা নির্ধারণ করতে পারেনি, যার মাধ্যমে আল্লাহকে অনুমানের চিন্তাধারাটি বিবেচনা করা সম্ভব। যেকোনো একটি অর্থের মাধ্যমে যা বাক্যের বৈজ্ঞানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।'[৩৮২]

বিষয়টির বাস্তবতা হচ্ছে, ঈমানের প্রশ্ন কোনোভাবেই বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন হতে পারে না। তাহলে 'বিজ্ঞান' অর্থের প্রচলিত পরিভাষা ধরতে হবে। কেননা বিজ্ঞান বস্তু, শক্তি ও তাদের সূত্রাবলি নিয়ে গবেষণা করে। যে সূত্র তাদের গতির বিধান জানিয়ে দেয়। মহাবিশ্বের শুরুর কারণগুলোর দিকে গুরুত্বারোপ করে না। বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ শুরু হয় বিগ ব্যাং থেকে (যদি আমরা বলি, এটি আমাদের বস্তুগত অস্তিত্বের প্রথম বৈশিষ্ট্য)। এর নেপথ্যে কী রয়েছে তা নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা করতে অক্ষম। এজন্যই গবেষণার প্রতি বিজ্ঞানের আকর্ষণ অস্তিত্ববাদী, নিজ ক্ষেত্রের বাইরে তা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। তা এমন গবেষণার দিকে চলে, যার পরিণাম নিন্দনীয়।

---

৩৮১. Alexander Rosenberg. The Atheist's Guide to Reality Enjoying Life without illusions, p.20

৩৮২. Massimo Pigliucci, 'New Atheism and the Scientistic Turn in the Atheism Movement, Midwest Studies in Philosophy, XXXVII (2013), p.148

দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ এই বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, 'বর্তমান সময়ের সকল জ্ঞানবান মস্তিষ্ক এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, কার্যকর সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে আমাদের বাস্তববাদী অধ্যয়ন ঘটনার বিশ্লেষণে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ চলমান সম্পর্কগুলোর ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্যের কারণে কোনো অবস্থাতেই তার প্রকৃত চরিত্রের সাথে কিংবা তার প্রথম অথবা শেষ কারণের সাথে সম্পর্কিত করা সম্ভব নয়।'[৩৮৩]

পূর্বোক্ত আলোচনা এটা অস্বীকার করে না যে, ঈমানের প্রশ্ন প্রাকৃতিক জগতের গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু তা এক্সপেরিমেন্টাল বা নিরীক্ষণীয় গবেষণারূপে নয়। বরং তা দার্শনিক প্রমাণ উপস্থাপনে ছোট প্রস্তাবনা (মুকাদ্দামায়ে সুগরা)। যেমন বলা হয় :

১. প্রতিটি সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আছেন। (মুকাদ্দামায়ে কুবরা)
২. মহাবিশ্ব একটি সৃষ্টি। (মুকাদ্দামায়ে সুগরা)
৩. সুতরাং মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা রয়েছেন। (ফলাফল)

অথবা এভাবে বলা যায় :

১. প্রতিটি এমন জটিলতা যা সরলীকরণ গ্রহণ করে না, তা বিশৃঙ্খল প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার সাথে সম্পৃক্ত করা অসম্ভব।

২. জীবজগতে এমন প্রচুর জটিল বিষয় রয়েছে, যা সরলীকরণ গ্রহণ করে না।

৩. সুতরাং জীবজগৎকে বিশৃঙ্খল প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার সাথে সম্পৃক্ত করা অসম্ভব।

নিশ্চয় আমরা জীবজগতে নকশার ঘটনাসমূহ অবলোকন করতে পারি। এ ক্ষেত্রে আমাদের দুটি ব্যাখ্যার যেকোনো একটি মেনে নিতে হবে। হয়তো বিশৃঙ্খল নয়তো সুশৃঙ্খল। সুশৃঙ্খল অর্থাৎ অবশ্যই ধারাবাহিকতা, প্রজ্ঞা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকবে। মাইক্রোবায়োলজির গবেষণা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমরা এই তথ্য পাই যে, কোষে (নড়াচড়া, সৃষ্টবস্তু, সঠিকতা, সংরক্ষণ, পারস্পরিক সহযোগিতা, শক্ত দুটি হাড় একে অপরের মাঝে প্রবিষ্ট হওয়া) বিস্ময়কর নকশার ঘটনা বিশৃঙ্খল হওয়া অসম্ভব। যা অনুভব করতে পারে না, নির্দেশনা দিতে পারে না এবং উদ্দেশ্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করে না।

---

৩৮৩. Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive (Paris: Bachelier, 1835) 2/435-436

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনাটি তাহলে প্রকৃতিবাদের চিন্তাধারা (যা বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন হতে পারে) থেকে ভিন্ন। (পারিভাষিক বিন্যাসের ভিত্তিতে নয়, বরং অতিক্রম করে যাওয়ার ভিত্তিতে।) এই অর্থে যে, তা এমন প্রশ্ন যা গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কোনোকিছুর সাথে মিল রাখে। তা হচ্ছে কারণের অস্তিত্বের নিদর্শন চাওয়া। কেননা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি সাধারণত কোনো কিছুর প্রভাব নিরীক্ষা করে তার কারণ অনুসন্ধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া ও তার বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা, এমনকি যদিও তা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে বা ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়নি। পদার্থবিজ্ঞান ও কসমোলজির গবেষণায় এর প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। তবুও উত্তম হচ্ছে দার্শনিক প্রশ্নাবলি ও বৈজ্ঞানিক প্রশ্নাবলি আলাদা করে রাখা। যাতে এ ক্ষেত্রে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র ও গবেষণার মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন।

> 'আমি মনে করি, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থেকে কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তিকে (যে বলে, আল্লাহ তাআলা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন) অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তার সাথে বিতর্ক করা যেতে পারে।'[৩৮৪]
>
> —নাস্তিক দার্শনিক মাইকেল রুজ

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ কী, যা বিজ্ঞানবাদী দৃষ্টিতে সম্ভব?

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার অস্তিত্ব নিয়ে নাস্তিকদের সাথে বিতর্ক করার পূর্বে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা অপরিহার্য। কোন প্রমাণটি একজন বিজ্ঞানবাদীকে পরিতুষ্ট করতে পারবে যে, এই মহাবিশ্বের একজন প্রভু রয়েছেন?

---

৩৮৪. "If the person of faith wants to say that God created the world, I don't think you can deny this on scientific grounds. But you can go after the theist on other grounds." Interview with Michael Ruse. Gary Gutting. Does Evolution Explain Religious Beliefs? The Stone, The New York Times, JULY 8, 2014
</https://opinionator.blogs.nytimes.com/2014/07/08/does-evolution-explain-religious-beliefs>

এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। কেননা এটি একজন বিজ্ঞানবাদীর জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণার সমস্যাকে দূরীভূত করে, যে এক লাফে সরাসরি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। আর তার শ্রোতা যদি এই ভুল ধারণা করে যে, সত্য যেটাই হোক, সেদিকেই সে চলছে, তাহলে নাস্তিক বিজ্ঞানবাদী শুরু থেকেই অস্তিত্বকে এমনভাবে ধরে নেয়, যা একজন ইলাহের প্রতি বিশ্বাস পরিপন্থি। যেহেতু পদার্থ আর গতি ব্যতীত অস্তিত্বে আর কিছুই নেই। এজন্যই তার দাবি অনুযায়ী বিজ্ঞান হচ্ছে কোনো অস্তিত্বশীল জিনিস অনুধাবনের একমাত্র পন্থা। অস্তিত্বটি যদি সাধারণভাবেই শুধু বস্তুগত হয়, তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া অসম্ভব, কেননা আল্লাহর অনুরূপ আর কিছুই নেই।

বিশ্বাসগত ধারণার ক্ষেত্রে আল্লাহর অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আবশ্যিকভাবেই অসম্ভব। বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তি এখানেই নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছে। এজন্যই তার সাথে বিতর্ক করার কোনো ক্ষেত্র অবশিষ্ট নেই। বিবেচনার ক্ষেত্রে আকলের কার্যক্রম শুরু, কিংবা অন্তর প্রশ্ন করার পূর্বেই অস্তিত্ব তার নিকট নাস্তিক্যের সমর্থনে কথা বলে। গবেষণার ফল উপস্থাপন ও মতাদর্শকে সমর্থন করার পূর্বেই নাস্তিক্য মতবাদ তার নিকট গৃহীত হয়।

য়েরম্যান টিটোভ রাশান মহাকাশচারীদের মাঝে অন্যতম। ১৯৬১ সালে তার সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা ছিল মানব-ইতিহাসের অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা। তার একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়, তিনি একটি টিভি প্রোগ্রামে বলেছেন, তিনি তার স্পেসশিপ থেকে সম্মুখে বিস্তীর্ণ আকাশ অবলোকন করেছেন; কিন্তু তিনি আল্লাহকে দেখতে পাননি। যেন ইলাহের অস্তিত্বের দাবিতে বিজ্ঞানবাদীদের সাথে আস্তিকদের বিতর্ক পৃথিবীর অনেক দূরে গ্রহনক্ষত্রের মাঝে অবস্থিত! আমরা বলি, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই বস্তুগত মহাবিশ্ব থেকে পরিপূর্ণ ভিন্ন। তাই পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণকারী কিংবা চাঁদে গমনকারী কোনো রকেটে আরোহণ করে আল্লাহকে অবলোকন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং বোঝা গেল, বিজ্ঞানবাদ নাস্তিক্যের দিকে পরিচালিত করে না; বরং তা নাস্তিক্যবাদের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিক সূত্রগত ভিত্তির পর্যায়েই তা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে অস্বীকার করে, যা মহাজাগতিক প্রথম রূপকে স্বীকার করে নেয়। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারে বিজ্ঞানের কোনো ভূমিকা নেই। 'কার্ল সেগান' এ বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'বিশ্বাসগতভাবে নাস্তিক এমন একজন ব্যক্তি, যে

সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর অস্তিত্বের বিপক্ষে যার নিকট অকাট্য প্রমাণাদি রয়েছে। অথচ এটি প্রমাণ করার কোনো অকাট্য প্রমাণ আমার জানা নেই।'[৩৮৫]

এই প্রভাব ও পদার্থ থেকে ভিন্ন ইলাহে ঈমান আনয়নের বিতর্কে আটকে পড়ার সংকীর্ণ স্থান থেকে পলায়নের জন্য একদল নাস্তিক বিজ্ঞানবাদী সরাসরি বস্তুবাদী অতিপ্রাকৃত বিষয় তালাশে প্রবৃত্ত হয়। তাদের আস্থার জায়গা হচ্ছে ইন্দ্রিয় চরিত্র, যা অধিকাংশ সময়ে তাদের চিন্তাচেতনায় থাকে। কিন্তু তাদের এই শর্তটি মেনে নেওয়া পদ্ধতিগতভাবে সংকটপূর্ণ। কেননা এটি সকল কিছুর বস্তুবাদিতায় তাদের মৌলিক বিশ্বাসের বিপরীত।

এরপর যখন তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের জন্য বস্তুবাদী অতিপ্রাকৃত বিষয়ের শর্তারোপ করে তখন তারা বিশ্বাসের কঠোর শর্ত পূরণে অক্ষম হয়ে পড়ে। একজন আস্তিক ও বিখ্যাত মার্কিন নাস্তিকের বিতর্কে আস্তিক ব্যক্তিটি নাস্তিককে প্রশ্ন করল, কোন প্রমাণটি আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে আপনাকে পরিতুষ্ট করতে পারে?

নাস্তিকটি উত্তর দিল, আমার শত্রু প্রতিবেশীর জন্য বদদুআ করব, যেন একটি উল্কাপিণ্ড এসে তাকে ধ্বংস করে দেয়। এবং তখনি সরাসরি একটি উল্কাপিণ্ড তার ওপর নিক্ষেপিত হবে।

আস্তিক তাকে উত্তর দিল, তবুও তো বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেল। এটি একটি কাকতালীয় বিষয়।

নাস্তিক বলল, হ্যাঁ, তোমার কথা সঠিক। বিষয়টি সম্ভব।

এটাই প্রতিক্রিয়াশীল বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদের মূলকথা। যেহেতু তারা অবস্তুগত সকল প্রমাণকে অস্বীকার করে। আর যখন বস্তুগত প্রমাণ উপস্থিত হয় তখন সন্দেহের সকল দরজা উন্মোচন করে দেয়। সুতরাং সকল প্রমাণ বাতিল করার জন্য কাকতালীয় ব্যাপার ও দুর্বল সম্ভাবনা সর্বদাই তাদের ঝুলিতে প্রস্তুত থাকে।

---

৩৮৫. Carl Sagan, Broca's Brain (New York: Ballantine Book, 1979), p.367

বাস্তবে বিজ্ঞানবাদী ব্যক্তি প্রতিটি অতিপ্রাকৃত বিষয়ের বস্তুগত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করে নিস্তার লাভ করে। তার কথা হচ্ছে, নিশ্চয় অতিপ্রাকৃত বিষয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপযুক্ত। অর্থাৎ নিশ্চয় তা বিজ্ঞানবাদীর নিকট প্রচলিত বস্তুগত ব্যাখ্যার আওতাধীন হবে। যাতে করে এর মাধ্যমে অতিপ্রাকৃতের চরিত্র থেকে সে বের হতে পারে। যা ডকিন্স নিজেই তার আলোচনায় স্বীকার করেছে, মরিয়ম আলাইহিস সালামের প্রতিমার হাত নাড়ানো নিয়ে সে বলেছে, যেন তিনি আমাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।[৩৮৬] সে তার নাস্তিক্যবাদী 'দ্যা ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার' বইতে লিখেছে, বিজ্ঞান স্বীকার করে অভিবাদনস্বরূপ প্রতিমার হাত নাড়ানো বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব নয়। যেহেতু নিরেট মর্মর পাথরের অণু বিশৃঙ্খলভাবে ক্রমাগত একে অপরের সাথে ঘাত প্রতিঘাতে লিপ্ত রয়েছে। নিছক কাকতালীয়ভাবেই এটি সম্ভব, যদি সকল পরমাণুগুলো একসাথে এক দিকে সরে যায় এবং পরের মুহূর্তেই তার বিপরীত দিকে সরে যায়। যদিও ডকিন্স স্বীকার করেছেন এই সম্ভাবনাটি খুবই দুর্বল। তা সমগ্র মহাবিশ্বের বয়স জুড়েও যদি শূন্য লেখা হয়, তবুও তার সম্ভাবনার হার লেখা যথেষ্ট হবে না। তবে তাই বলে তা সম্ভব হওয়া থেকে বের হয়ে যায় না।[৩৮৭]

আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের বিতর্কে নাস্তিকদের জন্য কোন ক্ষেত্রটি অবশিষ্ট থাকে, যদি বিষয়টি সূচনাগতভাবেই প্রত্যাখ্যান করা হয়? আর যখন তারা বিতর্ক গ্রহণ করে তখন তারা এমন অতিপ্রাকৃত বিষয় অন্বেষণ করে, যা বস্তুগতভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তারপর তারা অলৌকিক ঘটনার প্রকৃতির উর্ধ্ব প্রমাণকে পরিত্যাগ করে। কেননা মহাবিশ্বে এই পদার্থে সবই সম্ভব।

> বিজ্ঞানবাদ মৌলিকভাবেই একটি নাস্তিক্যবাদী অবস্থান। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের সম্ভাবনায় বিজ্ঞানবাদ কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা করে না।

---

৩৮৬. ডকিন্স এই উদাহরণ দিয়েছেন। কেননা ক্যাথলিকরা দাবি করে, মরিয়ম আ.-এর প্রতিমাতে অতিপ্রাকৃত বিষয় দেখা যায়।

৩৮৭. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (New York: W. W. Norton & Company, 1996), pp.159-160

প্রকৃতিই কি চূড়ান্ত কারণ?

একজন আস্তিক ও বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকের মাঝে পার্থক্য সেই অস্তিত্বে নয়, যা এই বিজ্ঞানবাদীদের নিকট অস্তিত্বের চূড়ান্ত কারণ নামে পরিচিত। বরং যেটা তারা চূড়ান্ত কারণ নামকরণ করেছে তার সংজ্ঞায় রয়েছে পার্থক্য। সুতরাং অবশ্যই এখানে একটি প্রাথমিক সূত্র থাকবে, সবকিছুর ব্যাখ্যা যেদিকে ফিরবে।

অতিবিদ্যার বাইরে বিজ্ঞানবাদীদের 'অবস্তুগত ব্যাখ্যার' অস্তিত্ব অস্বীকার তাদেরকে এই কথার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে যে, প্রকৃতি নিজেই তার কারণ। এজন্য তা প্রকৃতির বাইরে কোনো ব্যাখ্যার অস্তিত্ব অন্বেষণের অমুখাপেক্ষী। আর সেই ব্যাখ্যা হচ্ছে আস্তিকরা যার নাম দিয়েছে 'ইলাহ'। কখনো কখনো বিজ্ঞানবাদীরা এই ফাঁদে পড়ে যায়, কেননা তারা সমাধানের বিষয় থেকে বের হতে চায় অসম্ভব বিষয় ধরে নেওয়ার দিকে।

সত্যের সাথে সামঞ্জস্য ব্যতীতই বিজ্ঞানবাদী মতবাদ বিকাশ লাভ করেছে। কেননা বিজ্ঞান নিজেই সব অধিবিদ্যাগত বিষয়ের বৈজ্ঞানিকতা অস্বীকার করে। তারপর সে অধিবিদ্যাকে ল্যাবে নিয়ে যায়। এরপর সে প্রকৃতির জন্য প্রথম ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে। তারপর প্রকৃতিকেই তার কারণ বানিয়ে দেয়। অবশেষে প্রভাব নিজেই কারণ বনে যায়।

ডিএনএ-এর ব্যাপারে ড্যানিয়েল ডেনেটের বক্তব্যও প্রায় একই। 'আপনার পছন্দ হোক বা না হোক, এ ধরনের ঘটনা প্রকাশ করে ডারউইনীয় ধারণার শক্তির মূল উপাদানকে। আণবিক উপকরণসমূহের ছোট্ট একটি অণু, যা অজ্ঞাত, যান্ত্রিক ও নির্বোধ, তাকে বিবেচনা করা হয় সকল কর্তৃত্বের বিষয়ের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে। মহাবিশ্বে এর ফলেই অর্থ ও চেতনা সৃষ্টি হয়েছে।'[৩৮৮]

বিজ্ঞান ইচ্ছা ও সৃষ্টিকে ক্রোমোজমাল ডিএনএ-এর দিকে সম্পৃক্ত করা সমস্যার সমাধান প্রদান করে না। বরং তা শুধুমাত্র প্রকাশ করে যে, যদি অসম্ভব বিষয়টি উপস্থাপিত সমাধানগুলোর মাঝে একটি বস্তুগত অবস্থার অধীনে হয়, তাহলে সর্বদাই তা প্রণিধানযোগ্য থাকবে সে সকল সমস্যা সমাধানে, প্রাকৃতিক জগতের অধীনে যার কোনো উত্তর নেই।

---

৩৮৮. Dennett, Darwin's Dangerous Idea (London, Penguin, 1996) p.203

এবং ড্যানিয়েল ডেনেটের চেয়ে আরও অগ্রগামী। সে মহাবিশ্বের সামগ্রিক অস্তিত্বকে মূল উপাদানের দিকে সম্পৃক্ত না করে তার জন্য আবশ্যক নয় এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। তার বক্তব্য, 'মহাবিশ্বের পক্ষে অনস্তিত্ব থেকেই নিজে নিজে সৃষ্ট হওয়া সম্ভব। তা অনস্তিত্ব থেকেই নিজেকে সৃষ্টি করবে। কেননা মাধ্যাকর্ষণের সূত্রাবলি আবিষ্কৃত হয়েছে।'[৩১১] হকিং অস্তিত্বের অস্তিত্বকে এমন সূত্রের দিকে সম্পৃক্ত করেছে, যা মহাবিশ্বের কাজের বর্ণনা হতে পারে না। তাহলে এই বিবরণগুলোই কি তাকে সৃষ্টি করে? অথবা বিশেষ্যের অস্তিত্ব ছাড়াই কি এই বিশেষণগুলো পাওয়া যায়? অথবা পদার্থের মূল উপাদান ছাড়া অনাবশ্যক জিনিসগুলো নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

নিউটন মহাজাগতিক মহাকর্ষীয় সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এই মাধ্যাকর্ষণেই হকিং পেয়েছেন মহাবিশ্বের মৌলিক সূত্রাবলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উভয়েই ছিলেন নিজ সময়কার প্রধানতম পদার্থবিদ। তাহলে কেন নিউটন মহাকর্ষের সূত্রের সামনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি সেখানে দেখতে পেলেন স্রষ্টার মহত্ত্ব ও তার সৃষ্টির নৈপুণ্য। তা আবিষ্কারের পর তিনি 'Principia Mathematica' গ্রন্থটি লিখলেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যাকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পক্ষান্তরে হকিং ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে বসল। সূত্র এক, অথচ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে পর্যবেক্ষণ সাংঘর্ষিক।

এখন তাহলে মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত রূপের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। এ বিবেচনায় যে, তা একটি মহাজাগতিক ঘটনা যা অবাক করা ও বিস্ময়ের দাবি রাখে। অপরদিকে ভিন্ন একটি পর্যবেক্ষণ আছে, যা অন্ধ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুগত। যা গবেষণা করে, কীভাবে 'সৃষ্টির সমস্যা' থেকে সমাধানের জন্য 'বিশৃঙ্খলার আশায়' বের হওয়া যায়। এজন্য প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি স্বাভাবিকভাবেই আসে আর দ্বিতীয়টি স্বাভাবিকতার বিপরীতে চলে।

প্রথম পর্যবেক্ষণটি মূলত জানতে চায় মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্বের কারণ কী? তা কেন অনস্তিত্বে না গিয়ে অস্তিত্বে এল? কেন মাধ্যাকর্ষণ গাণিতিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে? কেন তার জটিলতা এত সূক্ষ্ম, যেন অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং জীবন অবশিষ্ট থাকে? অপরদিকে দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণটির ভিত্তি একটি সুপ্রাচীন বিষয়ের গবেষণার

---

৩১১. Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design, p.180

ওপর, যা আমাদের মহাবিশ্বের অধীনে সৃষ্টির কর্তৃত্ব লাভ করে। পক্ষান্তরে সময়ের চিরন্তনতা অবিনশ্বরতার প্রমাণ নয় অথবা সৃষ্টির সক্ষমতার প্রমাণ নয়।

বিজ্ঞানবাদী কপটতার উল্লেখযোগ্য আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, প্রকৃতি নিজেই হবে তার অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের কারণ। জীবনের উৎপত্তির একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, যদিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের স্বাভাবিকতা থেকে তা বিপরীত। এটি অবগত হওয়ার পরে যে, জীবন তার সবচেয়ে তুচ্ছ অবস্থাতেও অত্যন্ত দুর্বোধ্য। কিন্তু বস্তুবাদী আকল অস্থিমজ্জাসহ বস্তুবাদী ব্যাখ্যা লাভের আকাঙ্ক্ষী।

পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রিসার্চ পেপারে উঠে এসেছে, যা প্রকৃত সংকট উদ্ঘাটন করে, যেহেতু এই রিসার্চ পেপারগুলো নির্দিষ্ট করে দেয় সূচনালগ্ন থেকেই ডারউইনের চিন্তাধারা অনুযায়ী জীবের বিবর্তনের দাবি প্রত্যাখ্যান করা উচিত। বিশেষত প্রোটিনের সাথে ও ডিএনএ-এর সাথে জড়িত অত্যন্ত জটিল আণবিক কাঠামো আবিষ্কারের পরে। তার সাথিরা জীবনের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে দোষারোপ করে যে, তা খুবই সামান্য অথবা প্রামাণিক সমর্থন ছাড়াই জটিল অনুমান হয়ে গিয়েছে।[৩৯০]

বিবর্তনীয় রসায়ন অধ্যয়নরত বিজ্ঞানীরা এখনো এই আশা পরিত্যাগ করেনি যে, জীবনের একটি বিশৃঙ্খল উৎপত্তি আবিষ্কৃত হবে। যদিও এই আশার মৌলিক পূর্বধারণাগুলো প্রবল বাতাসে ঝরে পড়েছে। যা আবিষ্কার করেছে, প্রথম কোষটি সরল ছিল না, যেমনটা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীগণ ধারণা করতেন, বরং তা ছিল অত্যন্ত জটিল। এজন্য বিজ্ঞানবাদ বস্তুবাদী অস্তিত্বকে তার অভ্যন্তর থেকে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য।

বিজ্ঞানের বিপ্লব মানে ঈমানের বিজয়

১৯৯৮ সালের ২০ জুলাই, Newsweek ম্যাগাজিন 'Science Finds God' শিরোনাম তাদের প্রচ্ছদে প্রকাশ করে। এটি কোনো বৈজ্ঞানিক সমীকরণে আল্লাহর অস্তিত্ব আবিষ্কারের ঘোষণা ছিল না। অথবা টেলিস্কোপের মাধ্যমে দর্শনও ছিল না। বরং সেখানে এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে

৩৯০. E.J. Steele et al., 'Cause of Cambrian Explosion - Terrestrial or Cosmic?; in Progress in Biophysics and Molecular Biology 136 (2018).

বিশৃঙ্খলার ব্যাখ্যা অসম্ভব। এখানে বিশৃঙ্খলা ব্যর্থ হয় ও নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেয়। সুতরাং আকলের জন্য এটাকে প্রজ্ঞা ব্যতীত অন্যকিছু বলার সুযোগ থাকে না। আর প্রাণহীন বস্তুতে কোনো প্রজ্ঞা থাকে না।

এমন কিছু ঘটনা উল্লেখিত হয়েছিল যেখানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ বস্তুর ভেতর এক প্রজ্ঞাবানের দিকে ইশারা করে। এমনকি বিজ্ঞানবাদী নাস্তিকরা ডারউইনবাদকেই নিজেদের চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করে এখানেই নিজেকে গুটিয়ে রাখে। কেননা সমস্ত বস্তুজগতের স্বয়ংক্রিয় বিবর্তন (তাদের দাবি অনুযায়ী) আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী। অথচ এ ক্ষেত্রে নাস্তিকদের কোনো প্রমাণ নেই। কেননা বিশৃঙ্খল বিবর্তন জীবজগতে পরিকল্পনার প্রমাণকে বাতিল করে দেয় কিন্তু তা রবের অস্তিত্বের অন্যান্য অবশিষ্ট প্রমাণকে রদ করে না। ডারউইন নিজেও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করার জন্য তার মতবাদের কোনো প্রমাণ নেই। ১৮৭৯ সালে (তার মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে) নিজ বিশ্বাসগত মতাদর্শ আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি লিখেছেন, "আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে আমি অত্যন্ত দ্বিধায় নিপতিত, আমার দ্বিধাগুলোও খুব প্রান্তিক। 'আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী' এই অর্থে এখন আমি নাস্তিক হতে পারব না। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমি বিশ্বাস করি যে সাধারণভাবে– তবে সর্বদা না–আমি সংশয়বাদী।"[৩১]

বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিংশ শতাব্দী ও একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের অবদানের দিকে দৃষ্টি দিলে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রকৃতিবিজ্ঞান বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য বিগত কয়েক দশকে যতটা উদ্দীপনা পেয়েছে, অন্য কোনো সময়ে এমন উদ্দীপনা পায়নি। অনেক আবিষ্কার সুদৃঢ় নাস্তিক্যবাদী ভ্রান্তিগুলোকে গুড়িয়ে দিয়েছে এবং মহাবিশ্বের আরও গভীরে দৃষ্টি প্রদানে দার্শনিক পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তায় তাকিদ দিয়েছে। কেননা মহাবিশ্বের বুনন বারবার প্রমাণ করেছে, মহাবিশ্ব নিজের অস্তিত্ব ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি ব্যাখ্যায় অক্ষম। এমনকি বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ফ্রেডরিক বার্নহ্যাম[৩২] সাক্ষ্য

---

৩১. জন ফরবেইসের নিকট প্রেরিত ডারউইনের চিঠি। ৭ মে, ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ। <https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-12041.xml>

৩২. Frederic Burnham: Wayne State University -এর বিজ্ঞানের ইতিহাসের শিক্ষক।

দিয়েছেন, আল্লাহর অস্তিত্বের কথা এমন একটি মতবাদ, যা বিগত শত বছরের মাঝে বর্তমান সময়েই অধিক দালিলিক প্রমাণসিদ্ধ মতবাদ।[৩১৩]

বস্তুবাদী মহাবিশ্বের অস্তিত্ব, উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর মতবাদ অনুযায়ী পশ্চিমা বিজ্ঞান এ বিষয়ে একমত ছিল যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব অবিনশ্বর, যার কোনো সূচনা নেই। অতঃপর যখন মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টান ধর্মতাত্ত্বিকদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি টমাস একুইন্স আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষ সমর্থন করতে চাইলেন, তখন এ কথা বলতে বাধ্য হলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন মহাবিশ্ব সৃষ্ট এবং এটি একটি বিশ্বাসগত বিষয়, যার পক্ষে তার কোনো প্রমাণ নেই। কসমোলজির বিজ্ঞানে ব্যাপক বিপ্লবের আগপর্যন্ত এমন অবস্থায়ই চলমান ছিল। ১৯২২ সালে অ্যালেক্সান্ডার ফ্রেডম্যান তাত্ত্বিক গণনায় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের বিষয়টি আবিষ্কার করেন। যা সুদৃঢ়ভাবে অবহিত করে, সংকোচন কিংবা সম্প্রসারণ ছাড়া আমাদের এই মহাবিশ্ব স্থির থাকা অসম্ভব। পরে বিষয়টি আরও সুনিশ্চিত হয় ১৯১২ সালে ভেস্টো স্লাইফারের সুদূর গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোছায়ার রেখা লালিমার দিকে সরে যাওয়া আবিষ্কারের মাধ্যমে। এবং জ্যোতির্বিদ জর্জ লুমেত্রার গবেষণার মাধ্যমে।

বর্তমান সময়ে নাস্তিক পদার্থবিজ্ঞানী ও অন্যরাও একমত হয়েছেন, আমাদের এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে ও তার সুনির্দিষ্ট বয়স রয়েছে। এজন্যই সংশয়বাদী প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ অ্যালেক্সান্ডার ভিলেনকিন[৩১৪] বলেছেন, 'বলা হয় যুক্তিবাদী মানুষ শুধু যুক্তিই মেনে নেয় আর প্রমাণ অযুক্তিবাদী মানুষও মেনে নেয়। এখন প্রমাণ পাওয়া গেলে কসমোলজিস্টরা আর চিরন্তন মহাবিশ্বের সম্ভাবনা গোপন রাখতে পারবে না। এখানে পালানোর কোনো পথ নেই, তাদেরকে একটি মহাজাগতিক সূচনার মুখোমুখি হতে হবে।'[৩১৫]

নাস্তিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং বলেন, 'এটি সুস্পষ্ট যে সকল প্রমাণ এদিকে দিকনির্দেশ করে যে, এই মহাবিশ্ব অনন্তকাল থেকে অস্তিত্বে ছিল না। নিশ্চয়ই

---

৩১৩. Cited in Stephen C. Meyer, The Return of the God Hypothesis.

৩১৪. Alexander Vilenkin : রাশান বংশোদ্ভূত বিখ্যাত কসমোলজিস্ট। টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমোলজির প্রধান। মহাবিশ্বের মৌলিক বিষয়ে প্রচুর বৈজ্ঞানিক লেখা লিখেছেন।

৩১৫. Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universe, p.176

তার শুরু রয়েছে, আনুমানিক ১৫ বিলিয়ন বছর আগে। বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই আবিষ্কারটিই সবচেয়ে অধিক সুস্পষ্ট। বর্তমানে এই বিষয়ে কথা বলাই বাহুল্যমাত্র।'[৩৯৬]

তিনি আরও স্বীকার করেন, মহাবিশ্বের সূচনা নাস্তিক্যবাদের জন্য একটি অস্বস্তিকর প্রমাণ। তিনি বলেন, 'সময়ের সূচনার চিন্তাটি অনেক মানুষই অপছন্দ করে, কেননা তাতে ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।'[৩৯৭]

এমনিভাবে নাস্তিক দার্শনিক কুইন্টেন স্মিথ[৩৯৮] স্বীকার করেছেন, বিগ ব্যাং থিওরি বিশ্বাসীদের 'মহাবিশ্ব সৃষ্ট' কথাটির পক্ষে একটি বড় প্রমাণ। তখন নাস্তিক ও সংশয়বাদীদের উত্তর হবে কসমোলজি বিজ্ঞানে এই ক্রমবিকাশের বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে।[৩৯৯]

মহাবিশ্বের শৃঙ্খলার বিষয়ে প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীরা সূর্য ও চাঁদের ধারাবাহিক আবির্ভাবে বিস্মিত হতো। দিনে ও রাতে তাদের একের পর এক আগমনে এবং পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্রের সৌন্দর্য দেখে অবাক হতো। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আকাশ সৃষ্টির সূক্ষ্ম জ্ঞানে অবগতি না থাকায় দীর্ঘকাল তারা এই অবস্থাতেই ছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পদার্থবিদরা এমন কিছু আবিষ্কার করে, যা তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। তখন তারা নিশ্চিত হয় এই মহাবিশ্বে জীবনের স্থায়িত্ব খুবই সূক্ষ্ম ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাতে সামান্য পরিবর্তন হলেও মহাবিশ্বের কাঠামো ধ্বংস হবে। জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। শুধু মানবজীবন নয়, কোনো প্রকার জীবনেরই অস্তিত্ব থাকবে না।

---

৩৯৬. Stephen Hawking. The Beginning of the Universe: In Primordial Nucleosynthesis and Evolution of the Early Universe, eds. Katsuhiko Sato and Jean Audouze (Netherlands: Kluwer Academic Publishers), 129-39

৩৯৭. A Brief History of Time. From the Big Bang to Black Holes (London, Bantam Press, 1988), p.46

৩৯৮. Quentin Smith (১৯৫২-) : মার্কিন দার্শনিক। পদার্থবিজ্ঞান, ধর্ম ও সময়ের দর্শনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

৩৯৯. William Lane Craig; Quentin Smith, Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology (Oxford: Clarendon Press, 1995), p.195

সংশয়বাদী পদার্থবিদ পল ডেভিস এই বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "বিজ্ঞানীগণ ধীরে ধীরে অস্বস্তিকর সত্য আবিষ্কার করছেন, যে বিষয়টি সরাসরি প্রকৃতির সূত্রের সাথে সম্পর্কিত। ৪০ বছর যাবৎ পদার্থবিজ্ঞানীগণ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ অত্যন্ত শান্তভাবে মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলোর মাঝে অত্যন্ত উপযোগী 'কাকতালীয়' এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর উদাহরণ সংগ্রহ করে চলেছেন, যা জীবনের জন্য আবশ্যক মনে করা হয় এবং এজন্যই সচেতন প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে, এর যেকোনো একটিতে পরিবর্তন ঘটলেও এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। বিশিষ্ট কসমোলজিস্ট ফ্রেড হয়েল একসময় বলেছিলেন, এটি কেমন যেন একটি 'বিশেষ প্রজ্ঞা', যা পদার্থবিজ্ঞানকে বোকা বানিয়েছে।[৪০০]

জীবনের অস্তিত্বের কার্যকারণের সূক্ষ্মতার আরেকটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হচ্ছে যা নাস্তিক পদার্থবিদ হকিং তার নিম্নোক্ত বক্তব্যে স্বীকার করে নিয়েছে, মহাবিস্ফোরণের পর এক সেকেন্ডের সম্প্রসারণের হার যদি এক লক্ষ মিলিয়ন মিলিয়নের মধ্যে এক অংশেরও কম হতো, তাহলে মহাবিশ্ব তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছার আগেই পুনরায় বিলীন হয়ে যেত। আবার যদি এক সেকেন্ডের সম্প্রসারণের হার একই পরিমাণে বড় হতো, তাহলে মহাবিশ্ব এতটাই প্রসারিত হতো যে, এটি কার্যকরভাবে খালি হয়ে যেত।[৪০১]

পদার্থবিদ রজার পেনরোজ মহাবিশ্বের সূচনালগ্নে তার সম্প্রসারণ নিয়ে গবেষণা করে আবিষ্কার করেন, এই বিষয়টি এতটাই সূক্ষ্ম ও হতবুদ্ধিকর, যা কল্পনা করার কথাও ভাবা যায় না। অথচ বিষয়টি ছাড়া মহাবিশ্ব একদম সংকুচিত হয়ে যেত অথবা সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। শেষপর্যন্ত এই সম্প্রসারণের যথাযথতা পৌঁছেছে $১০^{১২৩}$ ভাগের ১ ভাগে। অর্থাৎ ১ এর পর $১০^{১২৩}$টি শূন্য। এটি এমন একটি সংখ্যা যা দুনিয়ার সকল পৃষ্ঠাতেও লেখা যাবে না।[৪০২] বরং এভাবে বলা যায়, যদি পৃথিবীর

---

৪০০. Paul Davies, 'Yes, the universe looks like a fix. But that doesn't mean that a god fixed it, The Guardian, 26-7-2007.

৪০১. Stephen Hawking. The theory of Everything: The origin and fate of the universe (Beverly Hills, CA: New Millennium Press, 2002), p.104

৪০২. তুলনামূলকভাবে বুঝতে হলে :
সারাবিশ্বে আনুমানিক মোট পরমাণুর সংখ্যা : $১০^{৭৮}$ থেকে $১০^{৮২}$ (অনেক কম!)
সারাবিশ্বের সম্ভাব্য কণার সংখ্যা : $১০^{৮৮}$ থেকে $১০^{১০}$
কিন্তু $১০^{১২৩}$ এত বিশাল যে এটি মহাবিশ্বের কণা সংখ্যার চেয়েও বহুগুণ বড়!

প্রতিটি অংশে শূন্য দেওয়া হয়, তবুও এই সংখ্যাটি লেখা যাবে না। তা শুধুমাত্র কল্পনাকারীর জন্য একটি কাল্পনিক সংখ্যা।[৪০৩]

এই বাস্তবতা কতিপয় একগুঁয়ে পদার্থবিদকে এই সকল আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় তাৎপর্যের জন্য অদ্ভুত দাবিকে গ্রহণ করতে ধাবিত করে। যা কোনোভাবেই বৈজ্ঞানিকতার সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেমন বিখ্যাত পদার্থবিদ আন্দ্রে লিন্ডে[৪০৪] (তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) ধরে নেন যে, আমাদের মহাবিশ্ব ভিনগ্রহের কোনো উন্নত সভ্যতার ডিজাইন অনুযায়ী হয়েছে।[৪০৫] জ্যোতিঃপদার্থবিদ জন গ্রিবিনের বক্তব্যও অনেকটা এমনই—'এই ধারণা সঠিক হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে যে আমাদের মহাবিশ্ব একটি কৃত্রিম নির্মাণ। এটি ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান সত্তা দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্মিত।'[৪০৬]

> 'এটি কতটা আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রকৃতির নিয়ম ও মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থাগুলো এমন প্রাণীদের অস্তিত্বের অনুমতি দেয়, যারা সেই অবস্থা মেনে নিতে সক্ষম। জীবন আমরা যেভাবে জানি এটি অসম্ভব হতো, যদি বিভিন্ন ভৌত রাশির যেকোনো একটির মান কিছুটা ভিন্ন হতো।'[৪০৭]
>
> —স্টিফেন ওয়েনবার্গ, নোবেল বিজয়ী নাস্তিক পদার্থবিদ

মহাবিশ্বের সূচনা এত নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ যে, এর সম্ভাবনা ছিল মাত্র ১ ভাগ ১০^{১২৩}! এটি বোঝানোর জন্য এত বিশাল সংখ্যা প্রয়োজন, যা পুরো মহাবিশ্বের কণার চেয়েও বেশি! অর্থাৎ মহাবিশ্বের এমন নিখুঁত গঠন হওয়া প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। এই বিশাল সংখ্যাটি দেখিয়ে রজার পেনরোজ মূলত বোঝাতে চেয়েছেন, মহাবিশ্বের সূচনা নিছক কাকতালীয় হতে পারে না, বরং এর পেছনে এক বিশাল পরিকল্পনা বা সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক।

৪০৩. See Roger Penrose. The Emperor's New Mind. p.344

৪০৪. Andrei Linde (১৯৪৮-) : রাশান বংশোদ্ভূত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক।

৪০৫. Adrei Linde, interviewed by Rudy Rucker, in Seek! Selected Non-Fiction (New York: Four Walls Eight Windows. 1999)

৪০৬. John Gribbin. In Search of the Multiverse (New York: Penguin Books, 2010), 173

৪০৭. Steven Weinberg. Life in the Quantum Universe.

শেষ দশকগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে যে, সামগ্রিক বিশৃঙ্খলার ব্যাখ্যায় জীবনের উৎপত্তি একটি ব্যতিক্রমী বিষয়। কোষ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এ বিষয়ে আগেকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো ছিল খুবই সরল। যেহেতু কোষকে জটিল কিছু নয়, বরং সরল মনে করা হতো। আণুবীক্ষণিক গবেষণা আরও উন্নত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে, কোষের জগৎ সুবিস্তৃত, যা অণুবীক্ষণের ক্ষেত্রে গুটিয়ে রাখা হয়েছে। তা মস্তিষ্ককে হতভম্ব করে দেয়। কোষের মাঝে রয়েছে হাইওয়ে, ট্রাফিক সাইন, বোঝা বহনকারী কর্মী, গুদাম, পুলিশ, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পাওয়ার ইঞ্জিন, দুর্গের প্রবেশপথ ও প্রস্থানপথ ইত্যাদি। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উত্থান হয়েছে এমন কথা বলা উপহাসের নামান্তর, বিশেষত যদি আমরা সূক্ষ্ম গণিতের ভাষায় কথা বলি। বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী ইউজেন কুনিন[৪০৮] আবিষ্কার করেছেন, পৃথিবীতে জীবের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তির সম্ভাবনা প্রায় $১০^{১.০১৮}$ এর ১ ভাগ,[৪০৯] যা আমাদের ভাষায় শূন্যের সমান। বিশেষত যদি আপনি জানেন যে সমগ্র মহাবিশ্বে প্রাথমিক কণার সংখ্যা শুধুমাত্র $১০^{৮০}$। এজন্যই চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলবিজয়ী এই জীববিজ্ঞানী ও ওয়ার্নার আরবার[৪১০] বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, কোষের মাধ্যমে জীবনের শুরু খুবই দুর্বোধ্য। সৃষ্টিকর্তা প্রভুর অস্তিত্বে ব্যাখ্যা করা ছাড়া এই বিষয়টি রহস্যময় থেকে যাবে।[৪১১]

স্বঘোষিত নাস্তিক ও প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েলকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতভম্ব করে দিয়েছিল, যখন তিনি পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তির ঘটনা অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এর প্রাথমিক অবস্থাটি অত্যন্ত জটিল ও প্রজ্ঞাময়, যা আকস্মিক বিশৃঙ্খলার বিপরীত। তিনি লেখেন, জৈব রসায়ন বিজ্ঞানীগণ প্রাণের জটিলতার বিষয়গুলো আরও অধিক আবিষ্কার করছেন। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়

---

৪০৮. Eugene Koonin (১৯৫৬-) : রাশান বংশোদ্ভূত জীববিজ্ঞানী। জিনতত্ত্বে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমির একজন সদস্য।

৪০৯. E.V. Koonin, The cosmological model of eternal inflation and the transition from chance to biological (evolution in the history of life: Biol Direct 2, 15 2007

৪১০. Werner Arber (১৯২৯-) : সুইজারল্যান্ডের জীববিজ্ঞানী।

৪১১. Henry Margenau and Ray Abraham Varghese, eds., Cosmos, Bios. Theos (La Salle, IL: Open Court Publishing Company, 1992). p.142

সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দুর্ঘটনাবশত প্রাণের উৎপত্তির সম্ভাবনা এতটাই দুর্বল যে, তা সম্পূর্ণ অবান্তর। কাকতালীয়ভাবে প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব।[৪১২]

কোষের অর্গানেলের গবেষণা তার বিস্ময়কর জটিলতা প্রকাশ করেছে, যাকে সরলীকরণ অসম্ভব। অর্থাৎ তা একবারে প্রদর্শন করা অসম্ভব। তা এমনই জটিলতা যা ছাড়া প্রাথমিকভাবে অর্গানেলগুলো কাজ করে না। তার অস্তিত্বের মধ্যবর্তী ধাপ কল্পনাও করা যায় না। কেননা এতে মধ্যবর্তী ধাপের কোনো কাজ থাকবে না। এই অর্গানেলের প্রসিদ্ধ উদাহরণ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ফ্ল্যাজেলাম। জীববিজ্ঞানী মাইকেল বিহি তার আশ্চর্যজনক জটিলতা বর্ণনা করেছেন। ডারউইনের এলোমেলো বস্তুবাদকে খণ্ডনকারী এই জটিলতা থেকে বের হয়ে আসার জন্য ডারউইনিজমের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মাইকেল বিহি কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত তার একটি বইতে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন—'বিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যাতে দেখানো যায় যে কীভাবে এলোমেলো প্রক্রিয়া ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে চমৎকার আণবিক মেশিন উৎপাদিত হতে পারে; কিন্তু ফলাফল শূন্য।'[৪১৩]

শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রমাণগুলো যদি আল্লাহর অস্তিত্বের ইঙ্গিত না দেয়, তাহলে কী হবে? এর দ্বারা ধরে নেওয়া হবে আল্লাহর অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে? এটিই চূড়ান্ত প্রশ্ন, যার পেছনে নাস্তিকরা ছুটে চলে, এরপর অস্বীকারের আবেগে পড়ে যায় ও বিতর্কের একগুঁয়েমিতে লিপ্ত হয়।

নাস্তিক দার্শনিক কাই নিলসেন[৪১৪] আমাদেরকে পূর্বোক্ত প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি যুক্তিকে বাতিল অথবা অপূর্ণাঙ্গ সাব্যস্ত করা মানে এই না যে, সিদ্ধান্তের জন্য যে যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে তা ভুল। আল্লাহর অস্তিত্বের সকল প্রমাণ ব্যর্থ হলেও এই সম্ভাবনা থাকবে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব

---

৪১২. Fred Hoyle. The Intelligent Universe (Holt, Rinehart, and Winston, 1984), p.12

৪১৩. Michael J. Behe, Darwin Devolves: The New Science About DNA That Challenges Evolution (New York, NY: HarperOne, 2019), p.287

৪১৪. Kai Nielsen (১৯২৬-) : মার্কিন দার্শনিক। ধর্মের দর্শন ও মূল্যবোধের দর্শনে তার বিশেষ পর্যবেক্ষণ রয়েছে।

বিদ্যমান।[৪১৫] অথবা যুক্তিবিদের ভাষায়, প্রমাণের অস্তিত্ব থাকা মানেই হচ্ছে যার প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে তার অস্তিত্ব রয়েছে। দলিলের অনস্তিত্বে যার দলিল দেওয়া হচ্ছে তার অনস্তিত্ব আবশ্যক নয়।

> একসময় এখানে কিছুই ছিল না, এরপর একা একাই অনস্তিত্বটি বিস্ফোরিত হলো। ফলে সেই অনস্তিত্ব থেকেই সবকিছু অস্তিত্বে এল। অন্ধ বিশৃঙ্খলা 'অন্ধত্ব' সত্ত্বেও এই চমৎকার মহাবিশ্ব পরিকল্পনা করল। অন্ধ অযৌক্তিক বিষয় দৃষ্টিসম্পন্ন আকল তৈরি করল। অন্তরবিহীন জ্ঞানী এমন অন্তর ধারণ করে, যা ভালোবাসা ও দয়া চেনে—এমন বিশ্বাসকেই নাস্তিক্যবাদ বলে।

তবে কেন বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিজ্ঞানী নাস্তিক হয়?

ব্রিটিশ গণিতবিজ্ঞানী জন লেনাক্স নাস্তিক কম্যুনিস্টদের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, যখন তিনি সাইবেরিয়া পৌঁছলেন তখন বিশিষ্ট গণিতবিদদের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করলেন। তারা তার জন্য বিশেষ সভার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তার আল্লাহর প্রতি ঈমানের কারণ তাদের সম্মুখে ব্যাখ্যা করেন। অথচ তার সাইবেরিয়া ভ্রমণ এজন্য ছিল না। এই আলোচনায় তিনি বক্তৃতা দেন সাম্প্রতিক সময়ের প্রধান বিজ্ঞানীগণ, কেপলার,[৪১৬] নিউটন,[৪১৭] ফারাডে[৪১৮] ও তাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বিষয় নিয়ে।

লেনাক্স লক্ষ করলেন, যখন তাদের সামনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বড় বিজ্ঞানীদের কথা বলা হচ্ছে তখন শ্রোতাদের চোখেমুখে অসন্তোষের ছাপ ফুটে উঠছে। একপর্যায়ে তিনি কথা বন্ধ করে তাদের চোখেমুখে সুস্পষ্ট অসন্তুষ্টির ছাপ পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সামনের সারিতে বসা একজন প্রফেসর বললেন, আমরা অসন্তুষ্ট। কেননা এটাই প্রথমবার যে আমরা শুনছি এই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীগণ

---

৪১৫. Kai Nielsen, Reason and Practice (New York: Harper and Row, 1971) pp. 143-44

৪১৬. Johannes Kepler (১৫৭১-১৬৩০) : জার্মান গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিদ।

৪১৭. Isaac Newton ১৬৪২-১৭২৭) : ইংরেজ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। তাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪১৮. Michael Faraday ১৭৯১-১৮৬৭) : প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ও গণিতবিদ।

(যাদের কাঁধে ভর দিয়ে আজকের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিপূর্বে কেন তা আমাদেরকে জানানো হয়নি?[৪১৯]

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বিজ্ঞানীগণ তাদের জন্য তৈরিকৃত বিশ্বদর্শনের নিকট বন্দি। যদিও তারা এটা বুঝতে পারে না। তবে বৈজ্ঞানিক পরিবেশ হবে পর্যবেক্ষণ, যুক্তিতর্ক, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত। আর যারা নাস্তিক্যবাদী পরিবেশে বাস করে কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণে অথবা প্রকৃতিবাদী দর্শনের নিয়ন্ত্রণে, তাদেরকে শেখানো হয়, বিজ্ঞান হচ্ছে নাস্তিক্যের সহযোগী। সেকুলারিজম ও বস্তুবাদী দর্শনকে আঁকড়ে ধরার কারণেই পশ্চিমারা বস্তুবাদে বিকাশ লাভ করেছে। তাদেরকে 'এনলাইটেনমেন্টের' তরবারি দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে অথবা সেকুলারিজমের নামে প্রতিহত করে রাখা হয়েছে।

ধর্মচর্চাকারীদের ওপর বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ পশ্চিমে খুব ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমনকি পিয়ার রিভিউড জার্নালগুলো, যেগুলোকে ধরা হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম, তা জীবজগতের জন্য বিশৃঙ্খলা ছাড়া আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের ব্যাখ্যাসমূহ প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এরচেয়েও অবাক করা বিষয় হচ্ছে, বিজ্ঞানবাদীরা বিশৃঙ্খলা ছাড়া বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমূহও প্রত্যাখ্যান করেছে। কেননা তা পিয়ার রিভিউড জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। তাই তারা তাদের বিরোধীদের গবেষণাও এই জার্নালে প্রকাশের অনুমতি দেয় না। আবার তা প্রকাশ করবে এমন কোনো প্ল্যাটফর্মও মেনে নেয় না।

বস্তুবাদী বিজ্ঞানবাদীদের কর্তৃত্ব ব্যাপক, তারা সংলাপ প্রত্যাখ্যানকারী। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক বিজ্ঞানীকে নির্যাতন করা হয়েছে। ফলে তারা বিশৃঙ্খলার প্রতি তাদের অস্বীকৃতি গোপন করা শুরু করেছে। এ বিষয়ে জৈব প্রকৌশল বিজ্ঞানী ও হেলেন্সকি ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রি এবং মিনারোলজি ইউনিটের ডিন ম্যাটি লাইজোলা 'Heretic' নামে একটি বই লিখেছেন।[৪২০] এখানে তিনি বর্ণনা করেছেন বিরোধীরা কীভাবে একাডেমিক ব্যক্তিদের নিপীড়ন করে এবং

---

৪১৯. John C. Lennox, Can Science Explain Everything? (Rationality and science: can science explain everything?). p.19

৪২০. Matti Leisola, Heretic: One scientist's journey from Darwin to design (Seattle: Discovery Institute Press. 2018)

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে প্রতিটি এমন প্রচেষ্টায়, যা শান্ত বৈজ্ঞানিক মতবিনিময়ের দরজা উন্মুক্ত করে। তাদের অনেকের কষ্ট বিশৃঙ্খলা মতবাদে অবিশ্বাসীদের যুক্তি শ্রবণের কারণে যে, তাদের কোনো প্রমাণ নেই যা তাদের কথা সমর্থন করে। আর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বই, বিভিন্ন ঘটনা, তথ্য, যা সৃষ্টিই হয়েছে ভ্রান্ত বস্তুবাদী পর্যবেক্ষণ থেকে, তা এসব দিয়েই পরিপূর্ণ।

নোবেল পুরস্কার, যাকে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পুরস্কার হিসেবে গণ্য করা হয়, তা বস্তুবাদীদের জোটবদ্ধতা থেকেও মুক্ত নয়। যেমন বলা হয়, জেরোম লেজুন[৪২১] The genetic basis of Down's syndrome আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি। করণ তিনি ধার্মিক ক্যাথলিক ছিলেন। তিনি নাস্তিক্য সমর্থিত গর্ভপাতের বিরোধী ছিলেন।[৪২২]

দীর্ঘ মানব-ইতিহাসে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। নাস্তিক বিজ্ঞানীদের সার্কেল ব্যাপকতা লাভ করেছে গত দশকগুলোতে। কেননা শিক্ষা পদ্ধতির ওপর নাস্তিক্যবাদ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এজন্য নয় যে বিজ্ঞান নাস্তিক্যবাদের দিকে পথ দেখায়। নোবেল বিজয়ী আস্তিক বিজ্ঞানীদের শতকরা ভাগ গত একশ বছরে দেখলে দেখা যায়, একজন স্রষ্টা বা প্রভুতে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের লিস্ট এই পুরস্কার অর্জনকারীদের ওপরের দিকে। 'নোবেল পুরস্কারের ১০০ বছর' বইয়ের লেখক বিংশ শতাব্দীতে নোবেল বিজয়ীদের বিভিন্ন তালিকার একটি হিসাব দেখিয়েছেন। এতে দেখা যায় নোবেল বিজয়ীদের মাঝে নাস্তিক ও সংশয়বাদী ছিলেন সর্বমোট শতকরা সাত জন।[৪২৩]

> প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের নাস্তিকতা মূলত বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাব, এই দর্শনের সৃষ্টিকারী নয়।

নাস্তিক ও আস্তিক বিজ্ঞানীদের অনুপাতের এই বিষয়টি বিস্তারিত জরিপ করা প্রয়োজন, যাতে করে কিছু দেশে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক মহলে নাস্তিকতার কর্তৃত্বের বাস্তবতা জানা যায়। এজন্য প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের

---

৪২১. Jerome Lejeune (১৯২৬-১৯৯৪) : ফরাসি জিনতত্ত্বের বিজ্ঞানী।

৪২২. Stanley L. Jaki, Questions on science and religion. Kindle Edition

৪২৩. Baruch A. Shalev, 100 years of Nobel prizes (Los Angeles, CA: Americas Group, 2005

শীর্ষতম ৩০০০ জন বিজ্ঞানীর ওপর একটি জরিপ চালানো হয়েছিল 'Ipsos MORI' প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বধানে। এই জরিপে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশ এবং ফ্রান্স ও জার্মানির এক চতুর্থাংশ বিজ্ঞানী দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের গুরুত্বের বিষয়ে একমত। এই তিন দেশের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অন্য দেশের তুলনায় ধার্মিক। এই অনুসন্ধানে জানা যায়, ব্রিটেনের এক চতুর্থাংশ এবং ফ্রান্স ও জার্মানির মাত্র এক পঞ্চমাংশ এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নিশ্চয় ধর্ম ও বিজ্ঞান সাংঘর্ষিক।

এরিক প্রিস্ট (বিশিষ্ট গণিতবিদ ও রয়্যাল এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট) বলেন, এই জরিপটি প্রকাশ করে, অধিকাংশ বিজ্ঞানী নব্য নাস্তিকদের সেই পুরোনো দাবিটিকে প্রত্যাখ্যান করে, যা আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখায়।[৪২৪]

এজন্য যখন আপনি হকিং-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি পড়বেন : 'জান্নাত বা পরকালের কোনো অস্তিত্ব নেই। এগুলো শুধু কাল্পনিক গল্প, যা অন্ধকারে ভীত লোকদেরকে বলা হয়',[৪২৫] তখন তা গুরুত্বের সাথে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তা দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বক্তব্য। জান্নাত, পরকাল কেবল কাল্পনিক বিষয়, দৃঢ়ভাবে এ কথা বলা তো দূরের কথা, বরং জান্নাত কিংবা পরকালের আলোচনা করার কর্তৃত্বও বিজ্ঞানের নেই। বিজ্ঞান শুধু এই পৃথিবী ও পৃথিবীর আকাশে গবেষণা করে। এগুলো অতিক্রম করে অন্য কিছুর অনুসন্ধান করে না।

অনেক শীর্ষ প্রকৃতিবিজ্ঞানী দার্শনিক বিষয়াবলি বুঝতে অক্ষম। এজন্য আইনস্টাইন বলেছেন, 'বিজ্ঞানী হচ্ছে অপ্রকৃষ্ট দার্শনিক।'[৪২৬] নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান বলেছেন, 'বিজ্ঞানী নিজ ক্ষেত্রবহির্ভূত বিষয়ে সাধারণ লোকের মতোই অজ্ঞ।'[৪২৭] নাস্তিক পদার্থবিদ মার্টিন রিজ এ কথায় কোনো সমস্যা দেখেন

---

৪২৪. Paul Wilkinson, Atheist scientists are in minority, survey suggests 21 September 2017.

৪২৫. ১৫/৫/২০১১ সালে গার্ডিয়ান ম্যাগাজিনে প্রদত্ত তার এক সাক্ষাৎকার : https://www.theguardian.com/science/2011/may/15/stephen-hawking-interview-there-is-no-heaven

৪২৬. Albert Einstein, "Physics And Reality", tr. Jean Piccard, in Journal of the Franklin Institute, vol. 221, p.349

৪২৭. John Lennox, Can Science Explain Everything?, p.26

না যে, "হকিং-এর বক্তব্যে 'সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আল্লাহকে উপস্থিত করার কোনো প্রয়োজন নেই' মন্তব্য করতে গিয়ে 'আমি হকিং-কে খুব ভালো করেই চিনি, তাই এ কথা বলতে পারি, তিনি দর্শনশাস্ত্র খুব অল্পই অধ্যয়ন করেছেন, ধর্মতত্ত্বে তার জানাশোনা আরও কম। তাই এ বিষয়ে তার মতামতে আমাদের এত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।"[৪২৮]

৪২৮. http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/martin-rees-we-shouldnt-attach-any-weight-to-what-hawking-says-about-god-2090421.html

সারকথা

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

'তারা অন্যায় ও অহংকার করে তা (আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে) প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর এগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করেছিল।' [সূরা নামল, আয়াত ১৪]

'প্রকৃতিবিজ্ঞান হলো জ্ঞান লাভ করার একমাত্র পন্থা। এ ছাড়া বাকি সবই বিভ্রম অথবা ভ্রান্তি। আমাদের চারপাশের ঘটনা ও আমাদের কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ উপলব্ধি করার পদ্ধতিতে বিজ্ঞানকে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রদান করা কল্যাণের সোপান।' —এ দাবিটি নিম্নোক্ত ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে :

১. এক্সপেরিমেন্টের প্রতি অতি উৎসাহী কিছু ব্যক্তির উত্থাপিত বিজ্ঞানে বিশ্বাস করার স্লোগানের বাস্তবতা হচ্ছে, তা শুধু বিজ্ঞানে বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃতিত্বের গর্ব নয়।

২. বিজ্ঞানবাদী পন্থায় বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মতাদর্শগত সম্পর্ক। বিজ্ঞানের প্রশংসা বা তা দ্বারা গর্বিত হওয়ার কোনো মতবাদ নয়।

৩. সাধারণত নাস্তিকরা, বিশেষভাবে বললে নব্য নাস্তিক্যবাদী আন্দোলন তাদের নাস্তিক্যবাদকে শক্তি জুগিয়ে ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং যা মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে, তা ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যটি সাধারণ মানুষকে না জানিয়ে যে, বিজ্ঞান হচ্ছে মহাবিশ্বের বস্তুগত নিয়মনীতি অনুধাবনের একটি পদ্ধতি। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্বের একটি মতবাদ, যার কিছু ব্যাপক অস্তিত্বগত আবশ্যক বিষয় রয়েছে।

৪. বিজ্ঞানবাদ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের মতে, বিজ্ঞান জ্ঞানের ওপর সামগ্রিকভাবে একচ্ছত্র আধিপত্য রাখে। অপর ভাগ মনে করে, বিজ্ঞান জ্ঞানের অন্যতম শীর্ষ উৎস। বিজ্ঞানবাদের প্রথম প্রকারটিই জনপ্রিয় নাস্তিক্য বক্তব্যে অগ্রগণ্য।

৫. যে বিজ্ঞানের স্লোগান উত্থাপন করে যে, তা অর্জিত জ্ঞানের একমাত্র উৎস, তা যৌক্তিক দৃষ্টবাদ দর্শনের ধারা। বর্তমানে এই স্লোগান উত্থাপন করছে কতিপয় নব্য নাস্তিক্যবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য।

৬. ইসলাম ও বিজ্ঞানবাদের মাঝে দ্বৈরথের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিশ্বদর্শন, জ্ঞানতত্ত্ব, পর্যবেক্ষণের যন্ত্র ও ফলাফল নিয়ে।

৭. বিশ্বদর্শনে, মূল্যবোধে ও বৈশিষ্ট্যে বিজ্ঞানবাদের আলোচনায় তা অন্যান্য ধর্মের মতো একটি ধর্মের রূপ লাভ করেছে।

৮. বিজ্ঞানবাদের এটি প্রমাণ করার ক্ষমতা নেই যে, এটিই জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উৎস। বরং এটি এমন একটি পূর্বানুমান, যা বিজ্ঞানবাদীরা ধরে নিয়েছে।

৯. বিজ্ঞানবাদের বাস্তব রূপ মেনে নিলে শেষপর্যন্ত বিবেকবোধকে অস্বীকার করতে হয়। অথচ এটিই বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের মূলক্ষেত্র।

১০. জ্ঞানের অন্যান্য উৎসকে পরিত্যাগ করে বিজ্ঞান নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

১১. বিজ্ঞানবাদ নিজের মাপকাঠিতেই একটি বাতিল মূলনীতি। যা পরীক্ষামূলক প্রমাণ ব্যতীত দার্শনিক দাবিসমূহ মেনে নেয় না।

১২. বিজ্ঞানবাদীরা দাবি করে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভিন্ন উদ্দেশ্য, পক্ষপাতিত্ব, বাহ্যিক প্রভাবক থেকে মুক্ত। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায়, এই দাবিটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।

১৩. বিজ্ঞানবাদীদের দাবি হচ্ছে, বিজ্ঞান সকল অবস্থার ওপর সিদ্ধান্ত প্রদানে এবং সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সক্ষম। এটি সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা জানি যে উপকরণে ও পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে।

১৪. বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে প্রাকৃতিক কার্যক্রমের নিয়মনীতির তথ্য দেওয়া। মানুষের নৈতিক দায়িত্বের খবর দেওয়া তার কাজ নয়।

১৫. বিজ্ঞানবাদকে মেনে নিলে মহাবিশ্বকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরানোর দ্বারা তা বিজ্ঞানে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ঘটায়।

১৬. মতাদর্শগতভাবে বিজ্ঞানবাদ মেনে নিলে তা আবশ্যিকভাবে মানুষের তাৎপর্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়। কেননা বিজ্ঞান মানুষের শুধু এতটুকুই স্বীকার করে নেয় যতটুকু অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ স্বীকার করে।

১৭. আল্লাহর অস্তিত্বকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য বিজ্ঞানবাদীরা যে যুক্তি দাবি করে, আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার দ্বারাই সে যুক্তির সূচনা হয়। ফলে তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় না।

১৮. আল্লাহর অস্তিত্বের গবেষণা একটি দার্শনিক বিষয়, বৈজ্ঞানিক বিষয় নয়। যেহেতু বিজ্ঞান শুধু প্রকৃতি নিয়েই গবেষণা করে, এর উর্ধ্বে কিছু নিয়ে নয়।

১৯. 'হয়তো বিজ্ঞানে বিশ্বাস নয়তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' মানুষ এ দুটি বিষয়ের মাঝে যেকোনো একটি বেছে নিতে বাধ্য নয়। সঠিক দার্শনিক বিবেচনায় বিজ্ঞানে বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসেরই একটি প্রমাণ।

২০. গত দুই শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পূর্ববর্তী যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক দৃঢ়ভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করে।

বইয়ে ব্যবহৃত কিছু শব্দের পরিচয়

বিজ্ঞান (Science) : বিজ্ঞান হলো প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের একটি কাঠামোগত পদ্ধতি।

বিজ্ঞানবাদ (Scientism) : বিজ্ঞানবাদ হলো এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস, যেখানে মনে করা হয় যে বিজ্ঞানই জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। এটি মূলত এমন ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে, পরীক্ষালব্ধ ও প্রমাণযোগ্য জ্ঞানই সত্য এবং অন্য কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে (যেমন দর্শন, ধর্ম বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা) প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় বা তা নির্ভরযোগ্য নয়।

প্রকৃতিবাদ (Naturalism) : প্রকৃতিবাদ হলো একটি দার্শনিক ও সাহিত্যিক মতবাদ, যা প্রকৃতির নিয়মকেই সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে বিবেচনা করে। এটি সাধারণত অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, সবকিছুই প্রকৃতির নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

হ্রাসবাদ (Reducionism) : হ্রাসবাদ হলো এমন একটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা, যেখানে বলা হয়, জটিল সিস্টেম বা ঘটনাগুলোকে তাদের ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অর্থাৎ কোনো কিছু বোঝার জন্য সেটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়।

নিয়তিবাদ (Determinism) : নিয়তিবাদ হলো এমন একটি দার্শনিক মতবাদ, যেখানে বলা হয়, জগতের সমস্ত ঘটনা পূর্বনির্ধারিত এবং অনিবার্য। অর্থাৎ প্রতিটি

ঘটনা পূর্ববর্তী কারণের একটি অনিবার্য ফল। মানুষের ইচ্ছাশক্তি বা স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো প্রকৃত অর্থ নেই।

ডারউইনবাদ (Darwinism) : ডারউইনবাদ মূলত চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) ওপর ভিত্তি করে গঠিত একটি তত্ত্ব। যেখানে বলা হয়, প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)-এর মাধ্যমে জীবের বিবর্তন ঘটে।

মানববাদী সেকুলারিজম : মানববাদী সেকুলারিজম হলো একটি দার্শনিক ও সামাজিক মতবাদ। যেখানে মানবকল্যাণ, যুক্তি, নৈতিকতা ও বিজ্ঞানকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়, এবং ধর্ম বা কোনো অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসকে নৈতিকতার জন্য অপরিহার্য মনে করা হয় না।

জীববিজ্ঞান (Biology) : জীববিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা জীবের গঠন, বৃদ্ধি, বিবর্তন, আচরণ ও তাদের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে। এটি জীবনের বিভিন্ন স্তর, যেমন পরমাণু, কোষ, অঙ্গ, সংগঠন ও প্রজাতির স্তরে গবেষণা করে। জীববিজ্ঞান মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বোঝাপড়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পদার্থবিজ্ঞান (Physics) : পদার্থবিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা, যেখানে প্রাকৃতিক জগতের মৌলিক নিয়ম, শক্তি, পদার্থ, গতি, সময়, স্থান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করা হয়। এটি প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

প্রকৃতিবিজ্ঞান (Natural science) : প্রকৃতিবিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের একটি শাখা। যেখানে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও প্রমাণভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগতের ঘটনা ও নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করা হয়। এটি পদার্থ, প্রাণী, উদ্ভিদ, রাসায়নিক উপাদান, মহাকাশ ও পরিবেশসহ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গবেষণা করে।

রসায়ন (Chemistry) : রসায়ন হলো বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে পদার্থের গঠন, ধর্ম, পরিবর্তন ও পারস্পরিক বিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করা হয়। এটি মূলত

পরমাণু ও অণুর স্তরে পদার্থের আচরণ বিশ্লেষণ করে এবং কীভাবে বিভিন্ন উপাদান একে অপরের সঙ্গে মিশে নতুন পদার্থ তৈরি করে তা ব্যাখ্যা করে।

অধিবিদ্যা (Metaphysics) : অধিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখা, যা বাস্তবতার মৌলিক প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। এটি অস্তিত্ব, সত্তা, সময়, স্থান, কারণ-সম্পর্ক, সম্ভাবনা এবং বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন তোলে।

অধিবিদ্যার প্রধান শাখাগুলো হলো :

১. অন্টোলজি (Ontology) : যা অস্তিত্বের প্রকৃতি ও বিভিন্ন সত্তার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

২. মহাজাগতিকতত্ত্ব (Cosmology) : যা মহাবিশ্বের উৎপত্তি, গঠন ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

৩. তত্ত্বজ্ঞান (Epistemology)-এর সাথে সম্পর্ক : যা বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা কীভাবে জ্ঞান লাভ করি তা ব্যাখ্যা করে।

৪. কারণ ও সম্ভাবনা (Causality and Possibility) : ঘটনাগুলোর কারণ কী এবং সেগুলো কীভাবে ঘটতে পারে তা বিশ্লেষণ করে।

কারণতত্ত্ব (Causality) : কারণতত্ত্ব হলো দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এক বিশ্লেষণাত্মক শাখা, যা কারণে ও ফলাফলের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এটি ব্যাখ্যা করে যে, কীভাবে একটি ঘটনা বা কর্ম অন্য আরেকটি ঘটনার কারণ হতে পারে।

হাইপোথিসিস (Hypothesis) : হাইপোথিসিস হলো একটি অনুমান বা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, যা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যায়। এটি বিজ্ঞানের মূল উপাদান এবং গবেষণার প্রথম ধাপ।

আর্কিওলজিস্ট (Archaeologist) : আর্কিওলজিস্ট হলেন একজন প্রত্নতাত্ত্বিক, যিনি অতীত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বস্তু অধ্যয়ন করেন।

স্নায়ুবিজ্ঞান (Neuroscience) : স্নায়ুবিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা স্নায়ুতন্ত্রের গঠন, কার্যপ্রণালী ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা করে। এটি মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের অন্যান্য অংশের কাজ বোঝার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে।

ল্যাবরেটরি (Laboratory) : ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার হলো এমন একটি স্থান, যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়। এটি বিভিন্ন শাখার গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন রসায়ন, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, প্রকৌশল ইত্যাদি।

বিগ ব্যাং থিওরি (Big Bang) : বিগ ব্যাং হলো 'বিজ্ঞানবাদীদের মতে' মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে, মহাবিশ্ব প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে একটি অতিসংকুচিত, অতি উত্তপ্ত ও ঘন বিন্দু থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল।

মিথস্ক্রিয়া (Interaction) : মিথস্ক্রিয়া বলতে দুটি বা ততোধিক বস্তুর, শক্তির বা সত্তার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার বা সম্পর্ক স্থাপনকে বোঝায়। এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থ বহন করে, তবে মূল ধারণা হলো পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া।

ডাইমেনশন (Dimension) : ডাইমেনশন বা মাত্রা বলতে কোনো কিছুর মাপ বা পরিমাপের একটি নির্দিষ্ট দিক বোঝায়। পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে ডাইমেনশন হলো স্থান ও সময়ের মৌলিক পরিমাপ।

ফেনোমনোলজি (Phenomenology) : ফেনোমেনোলজি হলো একটি দার্শনিক পদ্ধতি এবং চিন্তার দিক, যা মানুষের অভিজ্ঞতা ও সচেতনতার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হলো আমাদের অভিজ্ঞতা কীভাবে গঠন হয় এবং কীভাবে আমরা সেই অভিজ্ঞতাকে বোঝার চেষ্টা করি।

নিহিলিজম (Nihilism) : নিহিলিজম হলো একটি দার্শনিক মতবাদ, যা মূলত জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে অস্বীকার করে। এই ধারণাটি মানব অস্তিত্বের ওপর গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং বিভিন্ন দার্শনিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর আলোচনা করা হয়।

অন্টোলজিক্যাল মতবাদ (Ontological Theory) : অন্টোলজিক্যাল মতবাদ হলো দার্শনিক একটি মতবাদ, যা অস্তিত্ব, বাস্তবতা ও প্রাথমিক সত্তার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

উপযোগবাদ (Utilitarianism) : উপযোগবাদ একটি নৈতিক দর্শন, যা মূলত একটি কাজের সঠিকতা বা অসঠিকতা নির্ধারণ করে তার ফলাফল বা উপকারিতার

ওপর নির্ভর করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করা হয় তার দ্বারা উৎপন্ন সুখ বা উপকারের পরিমাণের ওপর।

ওজোনস্তর (Ozone Layer) : ওজোনস্তর হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা মূলত ওজোন গ্যাস (O_3) দ্বারা গঠিত। এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ থেকে ৩০ মাইল (১৬ থেকে ৫০ কিমি) উচ্চতায় অবস্থিত এবং সূর্যের অতিবেগুনী (UV) রশ্মিকে শোষণ করে, যা মানব ও অন্যান্য জীবের জন্য ক্ষতিকর।

মর্গ (Morgue) : মর্গ একটি বিশেষ স্থান যেখানে মৃতদেহ রাখা হয় এবং সেখানে ময়নাতদন্ত (autopsy) বা অন্যান্য তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মর্গ সাধারণত হাসপাতাল, সৎকার কেন্দ্র বা অন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত হয়।

আরোহ : আরোহ হলো একটি প্রস্তাবনা বা সুপারিশ, যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পায় বা একটি ক্রমধারায় উপস্থাপিত হয়। এটি সাধারণত কোনো পরিকল্পনা, গবেষণা বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেখানে প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু ধাপে ধাপে উন্নতি বা বিকাশ লাভ করে।

ক্রোমোজোমাল ডিএনএ (Chromosomal DNA) : ক্রোমোজোমাল ডিএনএ হলো সেই ডিএনএ, যা কোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে সংগঠিত থাকে। এটি জীবের বংশগত তথ্য সংরক্ষণ করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই তথ্য স্থানান্তর করে।

এনকোড ENCODE (The Encyclopedia of DNA Elements) : এনকোড হলো একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক প্রকল্প, যা মানুষের জিনোমের কার্যকরী উপাদানগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করার জন্য পরিচালিত হচ্ছে। এটি ২০০৩ সালে মানব জিনোম প্রকল্প (Human Genome Project) শেষ হওয়ার পর শুরু হয়।

কসমোলজি (Cosmology) : কসমোলজি হলো বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, গঠন, বিবর্তন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা করা হয়। এটি মূলত পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি শাখা।

অতিপ্রাকৃত (Supernatural) : অতিপ্রাকৃত বলতে বোঝায়, যে সমস্ত ঘটনা, শক্তি বা সত্তা প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিজ্ঞানের সাধারণ ব্যাখ্যার বাইরে থাকে। এগুলো সাধারণত ধর্ম, পৌরাণিক কাহিনি, লোকবিশ্বাস বা কল্পনাবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ডিএনএ (DNA - Deoxyribonucleic Acid) : ডিএনএ হলো একধরনের আণবিক উপাদান, যা জীবের বংশগত তথ্য সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করে। এটি কোষের নিউক্লিয়াসে (Eukaryotic cells) বা সাইটোপ্লাজমে (Prokaryotic cells) থাকে এবং জীবের গঠন, বৃদ্ধি ও কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

দৃষ্টবাদ (Positivism) : এটি একটি দার্শনিক মতবাদ, যেখানে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে সত্য ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেকুলারিজম হলো, যেখানে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধর্মের প্রভাব থেকে স্বাধীন থাকবে এবং সকল ধর্মের প্রতি সমান আচরণ করা হবে।

নৃবিজ্ঞান (Anthropology) : আক্ষরিক অর্থে মানুষ বিষয়ক বিজ্ঞান। এর লক্ষ্য হলো অতীত ও বর্তমানের মানব-সমাজ ও মানব-আচরণকে অধ্যয়ন করা। কিন্তু মানুষ বিষয়ক অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির চেয়ে এটির পরিধি ব্যাপকতর। বিশ্বের সকল অঞ্চলের, সংস্কৃতির মানুষকে নিয়ে এই বিজ্ঞানে গবেষণা করা হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান : সামাজিক বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের এমন একটি শাখা, যা সমাজ ও মানবিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।

মনোবিজ্ঞান : মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ববিদ্যা হলো, মানসিক প্রক্রিয়া ও আচরণ সম্পর্কিত বিদ্যা ও অধ্যয়ন। এটি বিজ্ঞানের একটি তাত্ত্বিক ও ফলিত শাখা, যাতে মানসিক কর্মপ্রক্রিয়া ও আচরণসমূহ নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা হয়।

জীবাশ্মবিজ্ঞান : জীবাশ্মবিজ্ঞান, জীবাশ্মবিদ্যা বা প্যালিওন্টোলজি হলো, হলোসিন যুগের সূচনার (প্রায় ১১,৭০০ বছর আগে) পূর্বে বিদ্যমান জীবনের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। এর আরেক নাম ফসিলবিদ্যা।

ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science) : ভৌতবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে জড় পদার্থ, শক্তি, মহাবিশ্বের গঠন ও প্রাকৃতিক নিয়ম নিয়ে গবেষণা করা হয়। যেমন পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পৃথিবীবিজ্ঞান।

মানবিক বিজ্ঞান : এটি মূলত মানব সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা ও অভিব্যক্তির অধ্যয়নের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই ক্ষেত্রটি বিভিন্ন শাখাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মানুষের অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস বিশ্লেষণকে ব্যাখ্যা করে।

বস্তুবাদ (Materialism) : বস্তুবাদ হলো দর্শনের সবচেয়ে প্রাথমিক মতবাদগুলোর একটি। এটি দার্শনিক অদ্বৈতবাদের একটি রূপ, যা বস্তুকে এবং মানসিক অবস্থা ও চেতনা সহ সমস্ত জিনিস, যা বস্তুগত মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল, তাকে প্রকৃতির মৌলিক পদার্থ হিসেবে ধরে রাখে।

প্রমাণবাদ (Evidentialism) : প্রমাণবাদ হলো জ্ঞানতত্ত্বের একটি মতবাদ, যা বলে যে, একজন ব্যক্তির কাছে যদি কোনো বিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ থাকে, তবে সেই বিশ্বাস গ্রহণ করা যুক্তিসংগত। এর মানে, বিশ্বাসের বৈধতা বা ন্যায্যতা প্রমাণ বা সাক্ষ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ভাবাদর্শ (Ideology) : ভাবাদর্শ, মতাদর্শ বা অধিবিদ্যা হচ্ছে বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের সমষ্টি, যা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশুদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক যুক্তির বাইরে গিয়ে ধারণ করে। এটি বাস্তবতা সম্পর্কিত মৌলিক পূর্বানুমানের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, যার কোনো বাস্তবিক ভিত্তি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।

অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) : অভিজ্ঞতাবাদ হচ্ছে একটি জ্ঞানতত্ত্ব, যা দাবি করে যে, মানুষের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা বা সরাসরি বাস্তব অভিজ্ঞতা। এটি বিশ্বাস করে যে, আমাদের উপলব্ধি, অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা পৃথিবী ও বাস্তবতার সম্পর্কে জানি। যদিও অভিজ্ঞতা শব্দটি দর্শনে বহুবিধ তত্ত্বে ব্যবহৃত হয়, তবে ভাববাদ ও বস্তুবাদ উভয় তত্ত্বে এর ব্যবহার দেখা যায়।

ধর্মতত্ত্ব (Theology) : ধর্মতত্ত্ব হলো ঐশ্বরিক প্রকৃতি বা ধর্মীয় বিশ্বাসের পদ্ধতিগত অধ্যয়ন।

জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) : জ্যোতির্বিজ্ঞান হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা মহাজাগতিক বস্তু যেমন গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, ছায়াপথ, ধূমকেতু এবং মহাবিশ্বের অন্যান্য ঘটনা, যেমন অতিনবতারা বিস্ফোরণ, গামা রশ্মি বিচ্ছুরণ, মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ, পটভূমি বিকিরণ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে। এটি গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূগোলের মাধ্যমে এই মহাজাগতিক বস্তুগুলোর আচরণ ও বিবর্তন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। সাধারণভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা জ্যোতির্বিজ্ঞানের আওতায় আসে। 'ভৌত বিশ্বতত্ত্ব' নামে আরেকটি পৃথক শাখাও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গেই সম্পর্কিত। এই শাখায় সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করা হয়।

ভূতত্ত্ব (Geology) : এটি ভূবিজ্ঞানের একটি শাখা, যা পৃথিবী, তার গঠন, গঠনকারী উপাদানসমূহ, পৃথিবীর অতীত ইতিহাস ও এর পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করে।

লজিক্যাল পজিটিভিজম (Logical Positivism) : এটি একটি একটি দার্শনিক চিন্তাধারা, যা ভিয়েনা সার্কেল (Vienna Circle) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এটি মূলত যুক্তি ও বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গঠিত, যেখানে দাবি করা হয় যে, কোনো বক্তব্য বা তত্ত্ব তখনই যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যদি তা পরীক্ষাযোগ্য এবং বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাইযোগ্য হয়। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষকেরা এই দর্শনের প্রচারক ছিলেন। এই মতবাদে ধর্মীয় বা অতিপ্রাকৃত দাবিগুলো অস্বীকার করা হয়, কারণ সেগুলো পরীক্ষণযোগ্য বা যৌক্তিকভাবে যাচাইযোগ্য নয়।

জনপ্রিয় বিজ্ঞান (Popular Science) : এটি সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজ ও বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, তত্ত্ব ও আবিষ্কারের ব্যাখ্যা প্রদান করে। জনপ্রিয় বিজ্ঞান বই, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন তথ্যচিত্র, ম্যাগাজিন, নিবন্ধ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উপস্থাপিত হতে পারে এবং এটি বিজ্ঞান সাংবাদিক বা বিজ্ঞানীদের দ্বারা লেখা হতে পারে।

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান (Quantum Physics) : এটি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা, যা পরমাণু ও অতিপারমাণবিক কণার আচরণ ব্যাখ্যা করে। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান দ্বারা কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা, অনিশ্চয়তার নীতি এবং

উপপরমাণবিক স্কেলে পদার্থের ধর্ম বোঝা যায়। এটি মহাবিশ্বের বিশাল কাঠামো, যেমন তারা, ছায়াপথ ও মহা বিস্ফোরণ (Big Bang) সম্পর্কিত ঘটনাবলি বিশ্লেষণেও ব্যবহৃত হয়।

কসমিক ফিজিক্স (Cosmic Physics) : এটি পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা, যা মহাবিশ্বের মৌলিক নীতিগুলো অনুসন্ধান করে। এই শাস্ত্রে মহাজাগতিক রশ্মি, ডার্ক ম্যাটার এবং মহাবিশ্বের গঠন ও উৎপত্তির রহস্য উদঘাটন করা হয়। কসমিক ফিজিক্স মূলত পদার্থবিজ্ঞান ও মহাবিশ্বতত্ত্বের সংযোগ স্থাপন করে, যেখানে বিশাল মহাজাগতিক কাঠামোর বিবর্তন ও বিন্যাস কীভাবে ভৌত নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়, তা ব্যাখ্যা করা হয়। এটি আমাদের মহাবিশ্বের প্রকৃতি ও তার গভীরতম রহস্য বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাল্টিভার্স (Multiverse) : এটি একটি তাত্ত্বিক ধারণা, যেখানে বলা হয় যে, আমাদের মহাবিশ্ব একমাত্র নয়, বরং অসংখ্য সমান্তরাল মহাবিশ্ব (parallel universes) থাকতে পারে। এই মহাবিশ্বগুলো ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবৈশিষ্ট্য, ভিন্ন আইন ও সম্ভাব্য বাস্তবতাসহ অস্তিত্বশীল হতে পারে।

স্ট্রিং থিওরি (String Theory) : এটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি ধারণা, যা বলে যে মহাবিশ্বের মৌলিক কণা বিন্দুর মতো নয়, বরং একমাত্রিক সুতো বা 'স্ট্রিং' দিয়ে গঠিত। এই স্ট্রিংগুলো বিভিন্নভাবে কম্পিত হয়ে কণার ভর, চার্জ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। স্ট্রিং থিওরি কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বকে একত্রিত করার সম্ভাব্য একটি পথ এবং এটি মহাবিশ্বের অতিরিক্ত মাত্রার (extra dimensions) ধারণাও উপস্থাপন করে।

ডাইমেনশন (Dimension) : এটি একটি ভৌত পরিমাপক ব্যবস্থা, যা স্থান, সময় বা অন্য কোনো গাণিতিক কাঠামোর প্রসারতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে আমরা তিনটি স্থানিক ডাইমেনশন (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) এবং একটিকে সময়ের ডাইমেনশন ধরে নিই, যা একসঙ্গে চার-মাত্রিক মহাকাশ-সময় (Spacetime) গঠন করে। স্ট্রিং থিওরি ও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে অতিরিক্ত ডাইমেনশন থাকার ধারণাও আলোচিত হয়, যেখানে ১০ বা ১১ মাত্রার অস্তিত্বের সম্ভাবনা উত্থাপন করা হয়।

জেনেটিক্স : জেনেটিক্স বা বংশাণুবিজ্ঞান হলো বংশাণু, বংশগতিক বৈশিষ্ট্য এবং এক জীব থেকে আরেক জীবের জন্মগত চারিত্রিক সাযুজ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। বংশাণুবিজ্ঞানের ইংরেজি পরিভাষা হলো জেনেটিকস, যা বিজ্ঞানী উইলিয়াম বেটসন ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তন করেন।

ফলসিফিকেশনিজম (Falsificationism) : এটি একটি দার্শনিক তত্ত্ব, যা মূলত বিজ্ঞানী কার্ল পপার (Karl Popper) দ্বারা প্রস্তাবিত। ফলসিফিকেশনিজমের মূল ধারণা হলো, একটি তত্ত্ব বা বিজ্ঞানী ধারণা তখনই বৈজ্ঞানিক হতে পারে, যদি সেটি পরীক্ষিত এবং প্রয়োগযোগ্য হয়, এবং সঠিক না হলে তা খণ্ডনযোগ্য (ফলসিফাই) হতে পারে।

আত্মজ্ঞানবাদ : এটি একটি দার্শনিক ধারণা যা কেবলমাত্র নিজের মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। জ্ঞানতাত্ত্বিক অবস্থান হিসাবে আত্মজ্ঞানবাদ বা সলিপসিজমের ধারণা হলো, নিজের মনের বাইরে যেকোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান অনিশ্চিত। বাহ্যিক বিশ্ব এবং অন্যান্য মনের বিষয়ে জানা সম্ভব না এবং নিজের মনের বাইরে এসবের অস্তিত্ব হয়তো নেই।

সেমিওটিক্স (Semiotics) : সংকেতবিজ্ঞান হলো সংকেত-সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্র। সংকেতবিজ্ঞানে সংকেতের বাহ্যিক রূপ ও অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করা হয়, বিশেষ করে ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

ব্ল্যাক হোল : এটি মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি বহুল প্রচলিত ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল মহাবিশ্বের এমন একটি বস্তু, যা এত ঘন সন্নিবিষ্ট বা অতি ক্ষুদ্র আয়তনে এর ভর এত বেশি যে, এর মহাকর্ষীয় শক্তি কোনো কিছুকেই তার ভেতর থেকে বের হতে দেয় না। এমনকি তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকেও (যেমন : আলো) নয়। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে সাধারণ মহাকর্ষীয় বলের মান এত বেশি হয়ে যায় যে, এটি মহাবিশ্বের অন্য সকল বলকে অতিক্রম করে। ফলে এ থেকে কোনো কিছুই পালাতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম তৎকালীন মহাকর্ষের ধারণার ভিত্তিতে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের বিষয়টি উত্থাপিত হয়।

মার্কসবাদ : উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও সাংবাদিক কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক

অনুশীলন ও সামাজিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বে সামাজিক পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও শ্রেণি-সম্পর্ককে ভিত্তি করে সমাজ বিশ্লেষণের বিশ্বদর্শন ও প্রক্রিয়া বয়ান করা হয়েছে।

লেনিনবাদ (Leninism) : এটি কার্ল মার্কসের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে ভ্লাদিমির লেনিন প্রবর্তিত রাজনৈতিক তত্ত্ব, যা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবী দল ও রাষ্ট্র গঠনের কৌশল ব্যাখ্যা করে।

কসমোলজি (Cosmology) : এটি হলো মহাবিশ্বের উৎপত্তি, গঠন, বিবর্তন এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণার বিজ্ঞান। কসমোলজি মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা, যা মহাবিশ্বের বড় আকারের গঠন, মহাবিস্ফোরণ (Big Bang), ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে। এটি মূলত প্রশ্ন করে—মহাবিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হলো, কীভাবে এটি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এর শেষ পরিণতি কী হতে পারে।

আর্কিওলজি (Archaeology) : এটি হলো প্রত্নতত্ত্ব, যা অতীত মানব সভ্যতার জীবনধারা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস গবেষণার জন্য প্রাচীন স্থাপনা, নিদর্শন, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য বস্তুগত অবশেষ বিশ্লেষণ করে।

কোষ (Cell) : এটি সকল জীবের গঠনের মৌলিক একক এবং জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্যকর একক। প্রতিটি জীব কোষ দিয়ে গঠিত, যা জীবনের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদন করে। কোষের প্রধান অংশ হলো কোষঝিল্লি, নিউক্লিয়াস (বা নিউক্লিওয়েড) ও সাইটোপ্লাজম।

অজীব কণা : অজীব কণা হলো এমন কণা বা বস্তু, যেগুলো জীবিত নয় এবং নিজ থেকে কোনো প্রাণসম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে না। এগুলো জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যেমন : ভাইরাস, প্রিয়ন; এবং বিভিন্ন অজৈব পদার্থ, যেমন : জল, খনিজ, বালি, লবণ ইত্যাদি। অজীব কণাগুলো জীবদেহের গঠন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এনজাইম (Enzyme) : এনজাইম হলো একধরনের জৈবিক অনুঘটক (Biological Catalyst), যা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি দ্রুততর করে, কিন্তু

নিজে অপরিবর্তিত থাকে। এটি মূলত প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং জীবদেহে বিপাকীয় (Metabolic) প্রক্রিয়াগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরমাণু (Atom) : এটি কোনো পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক, যা রাসায়নিকভাবে অবিভাজ্য এবং মৌলিক গঠনগত একক হিসেবে বিবেচিত হয়।

মিথস্ক্রিয়া : Interaction শব্দের বাংলা অর্থ মিথস্ক্রিয়া। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে মিথস্ক্রিয়া শব্দের অর্থ : পারস্পরিক ক্রিয়া, আন্তঃক্রিয়া। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর মাঝে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া কিংবা বিনিময়ই হলো মিথস্ক্রিয়া।

ফেনোমনোলজি : এটি একটি দার্শনিক চিন্তা, যা মূলত ২০ শতকের প্রথমার্ধে তৈরি হয়েছিল। এটি মানুষের সচেতন অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে, তবে বাইরের পৃথিবী বা বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো পূর্বধারণা বা অনুমান ছাড়াই।

হোমো সেপিয়েন্স (Homo sapiens) : এর ল্যাটিন অর্থ 'বুদ্ধিমান মানুষ', আধুনিক মানব প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম। এটি পৃথিবীর একমাত্র প্রজাতি, যা বর্তমানে বেঁচে আছে এবং সমস্ত মানবজাতি এই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ (Methodological Naturalism) : এটি একটি দার্শনিক নীতি যা বলে যে, বিজ্ঞান বা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকৃতির সব ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্রাকৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক উপকরণ বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করা উচিত। এবং এই প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক শক্তি ও আইনকেই প্রাধান্য দেয়। এর মানে হলো, কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা ধর্মীয়, অতিপ্রাকৃতিক বা অতিমানবিক ধারণাকে উপেক্ষা করে, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক উপাদান এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারি।

অধিবিদ্যাগত প্রকৃতিবাদ (Ontological Naturalism) : এটি একটি দার্শনিক ধারণা যা বলে, প্রকৃতির সবকিছু—বিশ্ব, জীবজন্তু, মানুষ, ও তাদের আচরণ—প্রাকৃতিক উপাদান বা শক্তি দ্বারা সৃষ্ট এবং পরিচালিত। এর মানে হলো, পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সকল ঘটনাই প্রাকৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক নিয়মে পরিচালিত, কোনো অতিপ্রাকৃতিক বা ধর্মীয় শক্তির মাধ্যমে নয়।

অর্গানেল (Organelle) : এটি সেল বা কোষের একটি বিশেষ গঠন বা অংশ, যা নির্দিষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। অর্গানেলগুলো সাধারণত কোষের সাইটোপ্লাজমে থাকে এবং প্রতিটি অর্গানেলের নিজস্ব কাজ থাকে, যা কোষের সঠিক কার্যক্রম বজায় রাখতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ 'নিউক্লিয়াস' ডিএনএ ধারণ করে এবং 'রাইবোজোম' প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য দায়ী।

এনলাইটেনমেন্ট (Enlightenment) : এটি ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর একটি দার্শনিক আন্দোলন, যা পুণর্জাগরণ (Renaissance) এবং বিজ্ঞানের যুগের পরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করে। এ আন্দোলনে ব্যক্তি স্বাধীনতা, যুক্তি, বিজ্ঞান ও সামাজিক উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এনলাইটেনমেন্টের দর্শনে বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষা ও যুক্তি ব্যবহার করে অন্ধকার যুগের কুসংস্কার, ধর্মীয় অভিজ্ঞান ও অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। এর ফলে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি গঠিত হয়, যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বিজ্ঞান ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত এনলাইটেনমেন্ট যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, ইসলামের ইতিহাসে সেটিই আলোকিত যুগ ছিল।